ঈশ্বর পারাবারে

দ্বিশতবর্ষে বিদ্যাসাগর

বেথুন কলেজের শ্রদ্ধার্ঘ্য

বেথুন কলেজ

ঈশ্বর পারাবারে

ঈশ্বর পারাবারে

দ্বিশতবর্ষে বিদ্যাসাগর

বেথুন কলেজের শ্রদ্ধার্ঘ্য

প্রধান সম্পাদক ঃ

ড. কৃষ্ণা রায়

কার্যনির্বাহী সম্পাদক ঃ

সুমন্ত মুখোপাধ্যায়

বেথুন কলেজ

ISBN No. : 978-81-948279-1-7

© বেথুন কলেজ

ঈশ্বর পারাবারে
প্রথম সংস্করণ ঃ ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২০

প্রধান সম্পাদক ঃ
প্রফেসর ড. কৃষ্ণা রায়

কার্যনির্বাহী সম্পাদক ঃ
সুমন্ত মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক ঃ
IQAC বেথুন কলেজ ও
জয়জিৎ মুখার্জী, সোপান

সম্পাদকমণ্ডলী ঃ
শ্রীমতী ক্যামেলিয়া ঘোষ হালদার, ড. অনিন্দিতা দত্ত, শ্রী ছন্দম চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ ও বর্ণবিন্যাস ঃ
লেসার ওয়ার্ল্ড

মুদ্রক ঃ
লেসার ওয়ার্ল্ড
পি-৪, সি.আই.টি.রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৪
মোবাইল-৯৮৩১১৬১৯৬১

প্রকাশ কথা

পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর জন্মের দুশো বছর পরেও বাঙালি জীবনে তথা ভারতীয় জনমানসে এবং পৃথিবীর অজস্র দেশে একটি বহু আলোচিত নাম। কত মানুষের সারা জীবন কেটে গেছে তাঁকে নিয়ে গবেষণায়, নিত্য অনুধ্যানে। তাঁকে আমরা হয়তো খুব সামান্যই চিনেছি। সেই রবীন্দ্রনাথের ভাষা ধার করেই বলতে হয়, 'জানি তারে আমি, তবু তারে নাহি জানি'। উনিশ শতকের কুসংস্কার আচ্ছন্ন, প্রগতি-বিমুখ বাঙালি সমাজে শুধু নারী-শিক্ষাকে কেন্দ্র করে নয়, সমকালীন অজস্র সামাজিক সমস্যাকে মেধা, যুক্তি, ও পান্ডিত্যের আলোয় বারে বারে অতিক্রম করে গেছেন তিনি। আপামর ভারতের মানুষ সবিস্ময়ে দেখেছে সমকালকে ছাড়িয়ে ওঠা এই মানুষটির কল্যাণ আকাঙ্ক্ষী অপার মানবিক মুখ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে, এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে, বেথুন কলেজ, বিদ্যাসাগর বিষয়ক এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করে। সেই আলোচনা-চক্রের আমন্ত্রিত বক্তাদের ভাষণ ও আরো কিছু বিদগ্ধজনের আমন্ত্রিত লেখা নিয়ে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে এই আকর গ্রন্থটি নির্মিত হয়েছে। সম্ভবত এই প্রথম বেথুন কলেজ পরিবার এমন অবিনশ্বর মানুষকে কেন্দ্র করে একটি সংকলন প্রকাশে প্রয়াসী হয়েছে। তাঁর দুশো বছরের জন্মলগ্নের পূর্তি উপলক্ষ্যে এইটুকু শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে পেরে বেথুন কলেজ কৃতার্থ ও কৃতজ্ঞ।

কৃষ্ণা রায়
অধ্যক্ষা, বেথুন কলেজ
সেপ্টেম্বর, ২০২০

সূচনা কথা

ঐতিহাসিক অশীন দাশগুপ্ত গান্ধীজীকে নিয়ে লিখতে গিয়ে দুটি ছোট বাক্যখণ্ডে ভারতবাসীর গান্ধী চর্চার নির্মম পরিচয় দিয়েছিলেন ঃ 'গান্ধীকে আমরা নিইনি। মূর্তি বানিয়েছি।' কথাটা বিদ্যাসাগর বিষয়েও খাটে। অধিকন্তু তাঁর মূর্তিটিও কম ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে গেল না। আজ থেকে ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে, আচম্বিতে, রাজনৈতিক মতবাদের এক ঝাপট এসে পড়েছিল ঈশ্বরচন্দ্রের মর্মর মূর্তির ওপর। স্বাধীনতার দু-যুগ পেরিয়ে সেই মুহূর্ত ছিল সমাজ রাজনীতির এক সার্বিক ভাঙাগড়ার কাল। সার্ধ শতবর্ষের সেই সময়টায় প্রশ্নে-উত্তরে-বিতর্কে-বিতণ্ডায় তাঁর জ্বলজ্যান্ত চেহারাটা ইতিহাস দেখতে পেল। আর এই দ্বিশতবর্ষের প্রাক্কালে সম্পূর্ণ অস্পষ্ট কারণে অচেনা হাতের ধাক্কায় আমরা কিছুদিন আগেই দেখেছি তাঁর আহত মূর্তিটি টুকরো হয়ে আছে। এখানে ভাববার বিষয় হলো আঘাতটা বার বার তাঁর ওপরেই পড়ছে কেন ? সত্যি কথা বলতে আঘাত সহ্য করার মর্মান্তিক ক্ষমতায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। সমকালে সমসমাজেরই কাছে এত রকমের মানসিক মার তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল যে এক তিক্ত বিষাদ ট্রাজিক নায়কের মত তাঁর জীবনে লিপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু, তবুও থামেননি তিনি কোনওদিন। এমন কী আজও, নানা সমাজপ্রশ্নে, তর্কে সংক্ষোভে গভীর যে উৎকণ্ঠিত মুখটি আমাদের মনে উঁকি দিয়ে যায়, সবাই আন্দাজ করতে পারেন, সেই মুখ বিদ্যাসাগরের।

বাংলার নতুন জাগরণ নিয়ে যত প্রশ্নই থাক, তার আংশিকতা আর ভগ্নাংশ নিয়ে যে-বিতর্কই জেগে উঠুক, একক মাত্রায় বিদ্যাসাগরকে সম্পূর্ণত সে সবের মধ্যে দিয়ে বোঝা অসম্ভব। কারণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমাদের ভারতীয় আধুনিকতার দুরূহ-তম প্রহেলিকা। তাঁকে নিয়ে কোনো মীমাংসাই শেষ পর্যন্ত অকাট্য সিদ্ধান্ত হয়ে উঠতে পারে না। সাধারণ-অসাধারণ, ঐতিহ্যবাদী-আধুনিক এইরকম কোনো তাত্ত্বিক কাঠামো তাঁর জন্য যথেষ্ঠ নয়। সব আলোচনাতেই তাই অনেকখানি উদ্বৃত্ত অংশ থেকে যায়, অমীমাংসিত থেকে যায় তাঁর বিচার। একটি কারণ, বিদ্যাসাগর চর্চায় সবচেয়ে বড় সংকট তাঁর নৈশঃব্দকে পড়তে না পারা। সব বিষয়েই মন্তব্যচর্চা

ঈশ্বরচন্দ্রের স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। তাই তাঁর প্রতিটি অক্ষর-ব্যবহার গবেষকের মনোযোগ দাবী করে। তাঁর সাধারণ কাহিনী নির্বাচনেও গভীর অভিপ্রায় নিহিত থেকে যায়। যেমন আপাত অকারণ সমাপতনে বাঁধা দুই অনুবাদ, *সীতার বনবাস* ও *শকুন্তলা*-র কেন্দ্রীয় দুই চরিত্রই অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় স্বামী পরিত্যক্তা। বোঝা যায় তাঁর বাছাই-এর অন্তঃস্থ যুক্তি তাঁর সমসমাজেই ছড়ানো ছিল। একটি কাজের সঙ্গে দূরবর্তী অপর খণ্ডটি জুড়তে জুড়তে যে বাধা বহুমূর্তি ধরে আমাদের সামনে হাজির হয়, তার সমাধান তাই সহজ নয়। এই সূত্রে স্মরণ করি তাঁর বিখ্যাত লাইব্রেরিটির আপাত নিরীহ ক্যাটালগ-গুলি। এখনও পর্যন্ত যার সম্পূর্ণ হদিশ সাধারণ পাঠকের কাছে নেই। থাকলে জানা যেত বিদ্যাসাগরও কোনো স্থির নির্দিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন না, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এক বদল সম্ভাবনায় তাঁর নিজেরই অবিকল মূর্তি তিনি নিজে ভেঙে দিয়ে গেছেন।

এই সংকলন তাই নানা বিদ্যার উৎস হিসেবে দ্বিশতবর্ষে নৈমিত্তিক স্মরণ-গ্রন্থনা নয়। এই স্মরণ উদ্যোগের আরেকটু পরিচয় দেওয়া দরকার। অধ্যাপক বিমল কৃষ্ণ মতিলাল তাঁর ছোট্ট এক সন্দর্ভে আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন অতীত থেকে অনেকখানি দূরে সরে এসেও প্রাচীন মনীষার সন্ধানে আমাদের বার বার প্রশ্নাতুর হয়ে উঠতে হয়। কেন ? বিগত দিনের আচার্যদের চিন্তা, শিক্ষাদান, নানা সংকটে তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি এই সব প্রশ্নের মধ্য দিয়েই গড়িয়ে আসে আমাদের প্রতিদৈনিক বর্তমানে। আমাদের সমস্যা জর্জর প্রাত্যহিকে দিশা দেখায়। খানিকটা আত্মসচেতন করে তোলে। সমাজ দেহে ফুটে ওঠা অসেতুসম্ভব বিপুল ফাটল গুলি জুড়ে দেয়। আর সেই কারণেই জন্ম-মৃত্যুর অথবা নির্দিষ্ট কোনো ঘটনার স্মরণে বারবার শতবর্ষ, সার্ধশতবর্ষ অথবা দ্বিশতবর্ষের উদ্‌যাপন জরুরী হয়ে পড়ে। প্রজ্ঞার যে সঞ্চয় আমাদের সমাজে দিনে দিনে জমেছে, যে সব ক্ষতচিহ্ন আমরা সম্পূর্ণ ভুলে বসে আছি, অতুলনীয় সেই ভাণ্ডারের দরজা আবার খুলে যায়। আমাদের আত্মপ্রসার ঘটে। নানা সংকট দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মুহূর্তে দিশেহারা আমরা, খুঁজে নিতে পারি মহাজনের চলার পথ। পাকা সড়কের পাশাপাশি, দুরূহ কিন্তু উত্তরগামী সেই পথেই অতীত ভবিষ্যতের সেতু বাঁধা সম্ভব। নতুন সময়ের নতুন প্রশ্ন গুলোকে চিরকালের প্রবাহে জুড়ে দেওয়ার এই হল উপায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশততম জন্মোৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে সংকলিত এই স্মারক গ্রন্থটিরও মূল উদ্দেশ্য তাই-ই।

বেথুন কলেজ ও স্কুলের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক সবারই জানা। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান গুলিতে ঠিক কোন ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যাসাগরকে কেন্দ্র করে গড়ে

উঠেছে সেইটে আমাদের খুব চেনা শোনা নয়। আজকের দিনে বিদ্যায়তনিক বিদ্যাসাগর ঠিক কোন সমীক্ষায় ধরা দিতে পারেন? এই রকম সব প্রশ্ন থেকেই বিগত বছরটিতে বেথুন কলেজ কর্তৃপক্ষ কতগুলি প্রকল্প গ্রহণ করেন। তারই একটি ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দফতরের সহায়তায় ছাত্রীদের জন্য আয়োজিত একটি আলোচনা সভা। এই সংকলনে সেই সভা পর্বেরই সম্প্রসারিত চেহারা ধরা রইলো। আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয় এই বছরের ১১ই ফেব্রুয়ারি। অতিমারীর মেঘ তখন দূর আকাশে দেখা দিতে শুরু করেছে। সারাদিনব্যাপী সেই আলোচনার দুটি ভাগ-এ চারজন বক্তা চারটি বিশেষ ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করেন। সেই চারটি বক্তৃতার লিখিত রূপ এবং আমন্ত্রিত আরো ন'টি প্রবন্ধ নিয়ে তৈরী হয়েছে 'ঈশ্বর পারাবারে' বেথুন কলেজের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

বাংলা ভাষায় বিদ্যাসাগর চর্চার ইতিহাসে এইরকম এক গ্রন্থের যোজনায় সামান্য একটু পরিচয় এখানে বলে রাখা প্রয়োজন। গ্রন্থটিতে মোট ১৩টি নিবন্ধ দুটি ভাগে, সংকলিত। প্রথমটি 'সভা' ও দ্বিতীয়টি, 'আমন্ত্রিত আলোচনা'। অধ্যাপক স্বপন চক্রবর্তী-র কাছে বেথুন কলেজের পক্ষ থেকে কতগুলি প্রশ্ন করা হয়, তিনি সুচিন্তিত ভাবে মুদ্রণ ও বিদ্যাসাগর বিষয়ক সেই সব জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছেন। তৈরী করেছেন নতুন ভাবনার ক্ষেত্র। অধ্যাপিকা মৌ দাশগুপ্ত আলোচনা করেছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে নতুন করে শিক্ষিত বাঙালীর পরিচয়ে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা। ব্যাকরণ ও সাহিত্য এই দুটি ক্ষেত্রেই তিনি বিদ্যাসাগরের অবদান বিচার করেন। তরুণ ঐতিহাসিক সৌমেন মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর ও তাঁর পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের সম্পর্কসূত্র পারিবারিক সীমায় না দেখে, বৃহত্তর সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিসরে বুঝতে চেয়েছেন। নতুন মানুষের চাষ করবার কথা বিদ্যাসাগর বলতেন। কিন্তু তার বীজ সন্ধানে, সৌমেন ইতিহাসের রামজয়-কে বুঝতে চাইছেন। শিক্ষাবিদ গোপা দত্তভৌমিক নতুন প্রশ্নের আলোয় বিদ্যাসাগরের শিক্ষাভাবনা ও তাঁর উদ্যোগ গুলি, আলোচনায় বুঝিয়ে বলেন। তাঁর লেখায় ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্রের নানামুখী লড়াই স্পষ্ঠ হয়ে উঠেছে। নারীশিক্ষা চিন্তায় বিশেষ ঝোঁক দেখা গেছে এই নিবন্ধে। আলোচনা সভার এই পর্ব শেষ হয়েছে এখানেই, কিন্তু আমন্ত্রিত লেখক প্রখ্যাত সাহিত্যিক অনিতা অগ্নিহোত্রী তাঁর নিবন্ধে আশ্চর্য যোগসূত্রে লিখেছেন কীভাবে এক নারীর কাছে দেখা দিচ্ছেন বিদ্যাসাগর, এতদিন পরেও। প্রশাসনিক এক উদ্যোগ পর্বে শুরু হয়ে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসারিত হয়েছে সবার অনুভবে। চারপাশের সংকট ঘনিয়ে এসে বিদ্যাসাগরের কাছে উত্তর খুঁজেছে।

শিক্ষা প্রশাসক অধ্যাপিকা মমতা চৌধুরী রায়ের প্রবন্ধে উঠে এসেছে অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের সংকট, সংশয় ও সমস্যা। ঔপনিবেশিক প্রশাসন আর বিদ্যাসাগরের প্রশাসনের ধারণা সংঘাত একেবারে নতুন চেহারায় ধরার চেষ্টা করেছেন লেখিকা। অধ্যাপিকা মীনাক্ষী সিংহের নিবন্ধ বস্তুত সিংহাবলোকনে বিদ্যাসাগরের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বটিই দেখতে চাওয়া। তাঁর ইস্পাত কঠিন চারিত্র্যের সন্ধানে নিবদ্ধ লেখাটি নানা তথ্য ও সূত্রের নতুন পাঠ। বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা কৃষ্ণা রায় খুঁজে দেখতে চেয়েছেন চিকিৎসক বিদ্যাসাগরের নির্ভীক চেহারাটি। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ভারতীয় উপমহাদেশে হোমিওপ্যাথি চর্চার যে আশ্চর্য ইতিহাস — সেখানে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা অধ্যাপিকা রায় সুনিপুন ভাবে তুলে ধরেছেন। সাহিত্যিক ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের লেখায় ফুটে উঠেছে বিদ্যাসাগরের হাস্য পরিহাস মুখর চেহারা। গোটা সংকলনের গম্ভীর পরিবেশ এই উপান্তে এসে একটু হালকা হয়। সুলেখিকা তৃষ্ণা বসাক খুঁজে দেখতে চেয়েছেন বিদ্যাসাগর বিষয়ে কঠিনতম প্রশ্নের উত্তর — তাঁর ধর্মবোধ! অধ্যাপিকা কুমকুম চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাবলীল বিচরণক্ষেত্র রবীন্দ্রনাথ ও সামাজিক উন্নয়ণের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে চেয়েছেন বিদ্যাসাগরকে। অধ্যাপক ছন্দম চক্রবর্তীর চিন্তা ক্ষেত্র বিদ্যাসাগরের গদ্যচিন্তার সংকট আর স্ববিরোধ। এই সংকলণের শেষ নিবন্ধটি বস্তুত একটি দীর্ঘ গবেষণার মুখপাত। সভ্যতার আধুনিক চেহারায় ঈশ্বরচন্দ্রের প্রবেশ ও প্রস্থান। বিশেষত তাঁর কার্মাটাঁড় বাস নিয়ে গড়ে ওঠা চিন্তাচর্চার পরিচয় নিয়ে লেখা অন্তিম আলোচনাটি।

একটি কথা এখানেই বলে রাখা ভালো, এই গ্রন্থে তথ্যসূত্র ও পাদটীকায় লেখকরা নানারকম পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন। আমরা লেখকের ব্যবহৃত তথ্যসূত্র বিন্যাসই গ্রহণ করলাম।

বিদ্যাসাগর হাঁটতে ভালোবাসতেন। অসুস্থ মানুষটিকে শেষদিকে ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছিলেন — আপনি হাঁটবেন। — কতক্ষণ? — যতক্ষণ না ক্লান্ত লাগে। বিদ্যাসাগরের আশ্চর্য উত্তর ছিল, তাহলে তো মুস্কিল হলো, হাঁটতে আমার কখনোই ক্লান্ত লাগে না! এই সংকলন শেষ পর্যন্ত আমাদের সবার পথ হাঁটার উদ্যোগ। মানুষটা দুশো বছর এগিয়ে আছেন। ধরতে পারা মুস্কিল।

সুমন্ত মুখোপাধ্যায়
বেথুন কলেজ
সেপ্টেম্বর, ২০২০

সূচি

বাংলা মুদ্রণ ও বিদ্যাসাগর ঃ কয়েকটি প্রশ্ন ১
স্বপন চক্রবর্তী

সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালির পরিচয় ঃ বিদ্যাসাগরের ভূমিকা ১৮
মৌ দাশগুপ্ত

'Renaissance man'-এর সন্ধানে ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-রামজয় তর্কভূষণ সংবাদ ২৮
সৌমেন মুখার্জি

শিক্ষাভাবনায় বিদ্যাসাগর ৩৩
গোপা দত্তভৌমিক

বঙ্গরমণীর বিদ্যাসাগর ৪৯
অনিতা অগ্নিহোত্রী

অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৫৭
মমতা চৌধুরী রায়

ইস্পাতের স্বাক্ষর ৭৩
মীনাক্ষী সিংহ

বিদ্যাসাগর ঃ এক স্বশিক্ষিত নিঃশঙ্ক চিকিৎসক ৮২
কৃষ্ণা রায়

রসেবশে বিদ্যাসাগর ৯৪
ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

ঈশ্বরের ধর্ম ১০৪
তৃষ্ণা বসাক

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সামাজিক উন্নয়নের প্রেক্ষিতে ১১২
কুমকুম চট্টোপাধ্যায়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বাংলা ভাষা ১১৮
ছন্দম চক্রবর্তী

নির্জন ঈশ্বর ঃ সভ্য ভব্য নব্য সমাজ ও বিদ্যাসাগর ১৩১
সুমন্ত মুখোপাধ্যায়

১

বাংলা মুদ্রণ ও বিদ্যাসাগর

স্বপন চক্রবর্তী

(বেথুন কলেজের পক্ষ থেকে সম্পাদকমণ্ডলী একটি প্রশ্নমালা পাঠিয়েছিলেন লেখককে। তিনি প্রশ্নগুলির সবিস্তার উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্ন ও উত্তর যথাক্রম বিন্যস্ত রইলো।)

প্রশ্ন-১ ঃ *বাংলা বই-য়ের ব্যবসায়িক উদ্যোগের প্রাথমিক চেহারাটি কেমন? পরিপ্রেক্ষিতটিতে বিদ্যাসাগরকে কী ভাবে দেখা যায়?*

উত্তর ঃ বই ব্যবসার জন্য প্রয়োজন অনুকূল বাজার, পুস্তক-নির্মাণের পরিকাঠামো এবং বিপণন-বিতরণের আয়োজন।

এর সঙ্গে যোগ করতে হবে ঈশ্বরচন্দ্রের সহযোগী উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যের প্রসঙ্গ। সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র যখন কর্মরত তখন সহকর্মী মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে যৌথভাবে সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটরি খোলেন। (তৃতীয় একজন প্রারম্ভিক অংশীদারের নামও আমরা পাই — তিনি কলেজের আরও এক সহকর্মী গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, যিনি পরে সংস্কৃত প্রেস ছেড়ে ১৮৫৫ সালে কলিকাতা প্রেস খোলেন গড়পারে। পরে এন্টালিতে অন্য এক ছাপাখানা কেনেন এবং হরফ ঢালাইয়ের ব্যবসাও করেন।) ১৮৪৭ সালে শিক্ষাদানের প্রণালী ও কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে রসময় দত্তের সঙ্গে মতভেদ হলে সহ-সচিব পদ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র ইস্তফা দেন এবং ওই বছরের জুলাই মাসে সেই পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয়। এর পরে তাঁর কাছে সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটরি হয়ে ওঠে বিকল্প আয়ের এক প্রধান পথ, যদিও কেবল পুস্তক-প্রণেতা হিসেবে তাঁর উপার্জনের সুযোগ ছিল যথেষ্ট। নিজেদের প্রেস ও বিপণি থাকলে পুস্তক-প্রণেতা ও পুস্তক-ক্রেতার মাঝখানে অন্য পুস্তক-নির্মাতা ও পুস্তক-বিক্রেতার প্রয়োজন পড়ে না, লভ্যাংশের বেশিরভাগটাই লেখকদের ও তাঁদের প্রতিষ্ঠানের তহবিলে সঞ্চিত হয়। এ ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্রের বিপুল সাফল্য সুবিদিত।

ব্যবসার স্বপ্নকে রূপ দিতে প্রয়োজন হয় আরও একটি জিনিস — তা হল মূলধন। এ ক্ষেত্রে পুঁজির জোগান দেন বন্ধু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়। তাঁর থেকে নেওয়া ধারের

টাকায় শুরু হয় ব্যবসা, কেনা হয় ৬০০ টাকার কাঠের প্রেস। অচিরেই শোধ হয় সেই ধার। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি থেকে আনানো ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের প্রামাণ্য পুঁথি থেকে নির্ভুলভাবে ছাপা বইটির কপি-পিছু ৬ টাকা মূল্যে ১০০ কপি কিনে নেন ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বতন নিয়োগকর্তা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। এ ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্র সাহায্য পান কলেজের সচিব মেজর জি.টি. মার্শালের। গড়ের কলেজের কাজ ছেড়েই ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে এসেছিলেন, তারপর সচিব রসময় দত্তের সঙ্গে বিবাদে স্বাভিমানী ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৪৭-এ কাজ ছাড়েন। ১৮৪৯ সালে গড়ের কলেজে হেড ক্লার্ক হিসেবে আবার যোগ দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু ১৮৫০-তে আরও একবার সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক হয়ে ফিরে আসেন, ১৮৫১ সালে হন কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রধান করণিক পদে যোগ দেওয়ার সময়ে তাঁকে জামানত রাখতে হয় ৫০০০ টাকা — সেকালের হিসেবে অঙ্কটি বিপুল। ততদিনে ঈশ্বরচন্দ্র সহজেই এতটা টাকা গচ্ছিত রাখতে পেরেছিলেন। এতেই বইয়ের ব্যবসায়ে তাঁর দ্রুত শ্রীবৃদ্ধির সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে।

সে যা-ই হোক, 'অন্নদামঙ্গল' বইটি গড়ের সাহেব শিক্ষার্থী অসামরিক প্রশাসকদের পাঠ্য ছিল, কিন্তু বাজারে পাওয়া যেত ভুলে ভরা কুশ্রীভাবে ছাপা বই। বাঁধা খরিদ্দার ও পৃষ্ঠপোষক থাকাতে ঋণ শোধ করা ঈশ্বরচন্দ্রের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল, সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্র কাজে লাগান তাঁর শ্রেণি ও পেশাগত পরিচয় থেকে উদ্ভূত এক সামাজিক বলয়কে, যে পরিমণ্ডলের আনুষঙ্গিক সুবিধাগুলি আমরা তাঁর 'স্যোশাল ক্যাপিটাল' বা 'সামাজিক পুঁজি' বলতে পারি। এ সুযোগ থাকে অনেকের, সদুদ্দেশে এবং সামূহিক কল্যাণে তাকে বাণিজ্যিক সম্পদে পরিণত করার প্রতিভা থাকে কেবল অঙ্গুলিমেয় মানুষের।

এরপর 'বর্ণপরিচয়' ও মদনমোহনের 'শিশুশিক্ষা'র কাটতি তো আজকের 'বেস্টসেলার'-কেও লজ্জা দেবে। অনেক সূত্র থেকেই এ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। একটি নমুনা উদ্ধার করছি বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ থেকে, যা কিনা আদতে ছিল সাহেবদের শাসনকালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ত্রৈমাসিক গেজেটে ছাপা প্রকাশনা সংক্রান্ত সংযোজনী। প্যারীচরণ সরকারের 'ফার্স্ট বুক অফ রিডিং ফর নেটিভ চিল্ড্রেন' ইংরেজি শেখার প্রথম সোপান হিসেবে তখন সবচেয়ে জনপ্রিয়। ১৮৬৭ সালে স্কুল বুক প্রেস প্রকাশিত বইটির ষোড়শ সংস্করণের মুদ্রণ সংখ্যা ছিল ২৪,০০০ কপি। পরের বছর সংখ্যাটি কমে দাঁড়ায় ১২,৫০০। এদিকে ১৮৬৮

সালে ত্রিংশতিতম সংস্করণে 'বর্ণপরিচয়' ছাপা হয় ১,০০,০০০ কপি। ফের পরের বছর প্রকাশিত হয় আরও এক সংস্করণ। এবারেও ১,০০,০০০ কপি। এক কপির দাম দু-ক্ষেত্রেই এক আনা। এই দু-বছরের হিসেব ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর ২৩ বছর আগেকার এবং সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটরি প্রতিষ্ঠার প্রায় ২০ বছরের পরেকার। এই তথ্য থেকে পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতা এবং পুস্তক-ব্যবসায়ী ঈশ্বরচন্দ্রের মেধা ও দূরদৃষ্টির আন্দাজ সহজেই করা যাবে। ১৮৬৯ সালের জুলাই মাস থেকে ১৮৭০ সালের জুন, এই সময়টুকুতে ঈশ্বরচন্দ্র ও মদনমোহন তাঁদের বইয়ের ২৭টি সংস্করণ ছাপেন —এগুলির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র প্রণীত বইই বেশি।

২। *তিনি প্রেসের কাজ নাকি ভালো বুঝতেন? তিনি প্রুফ দেখতেন নিখুঁতভাবে, এ বিষয়ে কতটা জানা যায়?*

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাক্ষ্য এ ক্ষেত্রে মান্য। হরপ্রসাদ লিখেছেন, 'তিনি সব বইয়ের প্রুফ নিজে দেখিতেন এবং সর্ব্বদাই উহার বাংলা পরিবর্ত্তন করিতেন। দেখিতাম প্রত্যেক পরিবর্ত্তনেই মানে খুলিয়াছে। তিনি প্রেসের কাজ বেশ জানিতেন-বুঝিতেন...।'

৩। *মুদ্রণ শিল্পে তাঁর সামগ্রিক অবদানের বিচার কী ভাবে করা যাবে? 'বিদ্যাসাগর সার্ট' কী?*

মুদ্রণ শিল্পে আর পুস্তক ব্যবসায়ে ঈশ্বরচন্দ্রের অবদান ঠিক এক জিনিস নয়। মুদ্রণ শিল্পে ঈশ্বরচন্দ্রের থেকে শ্রীরামপুরের খ্রিস্টীয় ধর্মপ্রচারকদের অথবা পরে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর অবদান কোন অংশে ন্যূন ছিল না। শ্রীরামপুর মিশনারিদের কাগজের কল না বসলে ছাপা বইয়ের ভূরি-উৎপাদন মোটেও সম্ভব হত না উনিশ শতকের বঙ্গদেশে।

বাঙালির মুদ্রণ সম্পর্কিত উৎসাহের কথা আমি (৬) সংখ্যক প্রশ্নের উত্তরে বলেছি। এখানে ঈশ্বরচন্দ্রের কিছু উদ্ভাবনার প্রসঙ্গ পাড়ছি যেগুলি একান্তভাবেই ছাপা সংক্রান্ত।

ধাতুতে ঢালাই হাতে বসানো হরফের যুগে এক-একটি অক্ষর 'প্রিন্টিং কেস' বা হরফের খোপ-কাটা বাক্স থেকে তুলে 'কম্পোজিটার'-এর হাতে ধরা কাঠের 'স্টিক'-এ বসাতে হতো, এবং সেখান থেকে বসতো লম্বা ছাঁচের 'গ্যালি'-তে। এক-একটি ধাতুর হরফকে বলা হত 'সর্ট', হয়তো ছাপার কাজের শেষে ফের খোপে-খোপে বর্গবিচার করে বা 'সর্ট' করে হরফগুলিকে ফিরিয়ে

দেওয়ার প্রক্রিয়া থেকে এসেছিল ইংরেজি শব্দটি। বাংলায় মুখে মুখে উচ্চারণ বদলে একে ‘সাট’ বলা হত। আবার একটি ভাষার মুদ্রণের জন্য প্রয়োজনীয় নানা সংকেত-সমেত হরফের সম্পূর্ণ গুচ্ছ বা ‘ক্যারেকটার সেট’-এর ‘সেট’ শব্দটির ভ্রষ্টরূপের মতো শুনতে লাগে ‘সাট’ শব্দটি, যদিও এই উৎসটির পক্ষে প্রমাণ জোরালো নয়।

গ্যালি প্রুফ সংশোধন হলে পৃষ্ঠা বিন্যাস করতে হতো ফর্মার ভাঁজের অঙ্ক মেপে, তা-ও আবার আরশিতে ফেলা প্রতিবিম্বের মতো করে, যাতে কাগজে ছাপ পড়লে সেটি সঠিক চেহারা ও অনুক্রম মেনে দৃশ্যমান হয়। উল্টো পিঠের ছাপা যাতে আলোয় ধরলে ঠিক অন্য পিঠের পঙ্‌ক্তির ওপর পড়ে, তার জন্যে ‘রেজিস্ট্রেশন’-এর কাজে নিখুঁত না হলে চলত না, পাঠ্যপুস্তকে তো নয়ই। এর ওপর ছিল নানা প্রযুক্তিতে প্রস্তুত (যেমন কাঠখোদাই) ছবি, মানচিত্র, অঙ্ক, সারণি; এ সমস্ত জিনিস ‘প্রিন্ট এরিয়া’-র (অর্থাৎ, পৃষ্ঠার বাইরের দিকে মার্জিন ও ভেতরদিককার খাড়াখাড়ি প্রান্ত বা ‘গাটার’-এর মাঝখানে যে জায়গাটুকুতে মুদ্রিতব্য পাঠ ছাপা হয় সেই চতুষ্কোণ জায়গাটুকুর) মধ্যে আঁটানোর জটিল প্রক্রিয়া। আবার ছাপা হয়ে গেলে ধাতুর হরফ নিজ নিজ খোপে ফেরত দিতে হতো, নয়তো হরফ কম পড়ে ছাপার কাজ যেত আটকে। এ কাজ খুবই কঠিন, এবং তা সারতে হতো দ্রুত। হরফ দেখে কাজ করার সময় থাকত না, কেসের খোপগুলির চেহারা মাথায় এমনভাবে রাখতে হত যাতে প্রায় যন্ত্রের মতো গতিতে ‘ডিস্ট্রিবিউশন’-এর কাজে হাত চলে। মূল ছাপ নেওয়ার কাজ, একাধিক পৃষ্ঠার ছাপ সংবলিত কাগজের পাতা অন্য পিঠে ছাপার জন্যে সঠিক ক্রমে উল্টোনো, এসব কাজের ফিরিস্তি আর দিলাম না।

বাংলা মুদ্রণের এক বড়ো সমস্যা ছিল অক্ষরসংখ্যা এবং যুক্তব্যঞ্জন। বঙ্কিম-যুগেও এ কারণে বাংলা সংবাদপত্র ঠিক সময়ে এবং বহুল পরিমাণে ছাপা সম্ভব ছিল না। ব্যাপ্তার্থে ঈশ্বরচন্দ্র-কৃত বর্ণমালার সংস্কার আসলে মুদ্রণ-প্রণালীর দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার। ঈশ্বরচন্দ্র ‘বর্ণপরিচয়’ কেবল অক্ষরপরিচয়ের ‘প্রাইমার’ নয়, তা মুদ্রণ-সংস্কারের একরকম ইস্তেহার। প্রথম ভাগের ভূমিকায় ঈশ্বরচন্দ্র লিখছেন যে, কেন ‘য়’, ‘ঢ়’ এবং ‘ড়’ ব্যঞ্জনগুলি প্রয়োজন, কেন অনুস্বর, বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দুর আলাদা করে বর্ণমালায় ঠাঁই করা দরকার, কেন দীর্ঘ ‘ৠ’ এবং ‘ঌ’ অপ্রয়োজনীয়, কেন ‘ক্ষ’ হরফটি যুক্তব্যঞ্জনে প্রয়োজন। এ ছাড়া নানা যুক্তব্যঞ্জনের এবং ‘ ্ ’-কারের

একটি চেহারা বেঁধে দিয়ে ছাপার কাজে সমতা আনার কাজটি বেশ অনেক বছরের জন্য অনেকটাই করে গেলেন ঈশ্বরচন্দ্র। বর্ণমালার বদল করে ঈশ্বরচন্দ্র আঁটসাঁট করে বদলে দিলেন ছাপাখানায় ব্যবহার্য হরফের পাঁতি এবং ডালার মধ্যে হরফের বিন্যাস যাতে বর্ণসংযোজন ও মুদ্রণোত্তর হরফ-বণ্টন সহজ হয়ে যায়, দ্রুত হয়ে ওঠে বাংলার ভাষায় ছাপার কাজ। এই 'সর্ট' বা হরফ এবং তার বিন্যাস 'বিদ্যাসাগরী সাট' নামে চলে এসেছে অনেকদিন পর্যন্ত।

বাংলায় ছাপা বইতে যতিচিহ্নের প্রয়োগ নিয়েও পরীক্ষা চালান ঈশ্বরচন্দ্র। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি বাক্যের শেষে দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদের সংকেত ছাড়া বাংলা মুদ্রণে লাতিন বিরামচিহ্নের প্রয়োগে পথিকৃৎ ছিলেন। কথাটা ঈষৎ বাড়িয়ে বলা। পুঁথিতে লিপিকরেরা শব্দের যেসব সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করতেন সেগুলি সর্বত্র বর্জন করতে পারেননি ঈশ্বরচন্দ্র। যুক্তব্যঞ্জনের অসমরূপী চেহারা ও প্রয়োগ যে ভিনভাষীদের বাংলা শেখার ব্যাপারে নিরুৎসাহ করে এবং সে কারণেই তা পরিহার করা প্রয়োজন — খ্রিস্টিয়ান ভার্নাকুলার সোসাইটির এজেন্ট জন মারডক ১৮৬৫ সালে একটি খোলা মুদ্রিত চিঠিতে ঈশ্বরচন্দ্রকে এমন আরজি জানান। তৎসম শব্দের পদসৃজনের ক্ষমতায় বিশ্বাসী ঈশ্বরচন্দ্র যে এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রস্তাব খারিজ করবেন তা একরকম জানাই ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র চেয়েছিলেন বাংলা গদ্যে ছেদচিহ্নের প্রয়োগ ব্যাকরণ অনুসারী হোক, ঝোঁক বা আবেগ মেপে নয়। কিন্তু 'রেটরিকাল পাংচুয়েশান'-এর বদলে যা তিনি আমদানি করেন তা ছেদচিহ্নের বহুল ব্যবহার, এবং তা প্রায়শই গদ্যের গতি ও অর্থকে ব্যহত করে। ১৮৪৯ সালের কিশোরপাঠ্য 'আখ্যানমঞ্জরী' বইতে এই বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত নমুনা দেখতে পাওয়া যাবে। এরকম যত্রতত্র যতির প্রয়োগ ঈশ্বরচন্দ্রের লেখায় ক্রমশ কমে আসবে। তবুও ১৮৬৫ সালে 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্‌ বিষয়ক বিচার' গ্রন্থে কমা ও সেমিকোলন রয়েছে ব্যাকরণ ও অন্বয়ের উপরোধে, আবার পাঠকের চোখ ও নিহিত স্বরের এককের ইঙ্গিত মেনে। লাতিন ছেদচিহ্নের ব্যবহারও সর্বদা আধুনিক রীতিতে করেননি তিনি। যেমন, আশ্চর্যবোধক চিহ্ন ঈশ্বরচন্দ্র বসাতেন সম্বোধনের সংকেত হিসেবে। অর্থাৎ, ব্যাকরণ, শব্দার্থ, আবেগ, পাঠকের স্বরের ও চোখের বিরাম ও ব্যাপ্তি — এসবের মধ্যে কোনও মীমাংসায় তিনি আসতে পারেননি শেষ পর্যন্ত। যতিচিহ্নের ব্যবহারের যুক্তি, পরিমিতি ও বৈচিত্র্যে অনেক ক্ষেত্রে ঢের অগ্রসর ছিলেন আগেকার পাঠ্যপুস্তক রচয়িতারা, বিশেষ করে

ব্যাপটিস্ট ধর্মপ্রচারকেরা। বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। ১৮১৫ সালে প্রকাশিত ফেলিক্স কেরির 'বিদ্যাহারাবলী' বইয়ের প্রথম খণ্ডের বিষয় 'ব্যবচ্ছেদবিদ্যা'। অ্যানাটমি ও ফিজিওলজির এই গ্রন্থে প্রয়োজন ছিল নানা আকারের বন্ধনী, ধারা ও উপধারার স্পষ্ট নির্দেশ, ছবি ও লেবেল, টানটান দ্বিধাহীন সংজ্ঞার্থ। ফলে এটিতে বিরামচিহ্নের প্রয়োগ ছিল আধুনিক ধাঁচের — পাশ্চাত্যের বলে 'আধুনিক' নয়, নব্য শিক্ষার্থীর স্বার্থে প্রাঞ্জল সংকেত-ব্যবস্থা বলে 'আধুনিক'। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির ১৮২৬ সালের 'ওলাউঠার বিবরণ' বইতে খানিকটা একই জিনিস দেখি। কেবল ঈশ্বরচন্দ্র ও বাঙালি গদ্যলেখকদের দিকে মন দিলে এসব কৃতিত্ব নজর এড়িয়ে যেতে পারে।

তবে পৃষ্ঠার ডানদিকে ছাপা পঙ্ক্তি এক কাল্পনিক খাড়াখাড়ি সরলরেখায় আনতে ঈশ্বরচন্দ্র হাইফেন ব্যবহার করতেন নিয়মিত। তার আগে বাংলা প্রেসে লাইন 'জাস্টিফাই' করা হত শব্দগুলির মধ্যেকার ফাঁক কমিয়ে-বাড়িয়ে, এতে পৃষ্ঠা দেখতে হত অতি কুশ্রী।

৪। *তাঁর এই বিষয়ে আগ্রহ সমকালীন আর কাকে প্রেরণা দিয়েছে বা মুদ্রণ ব্যবসায় আকৃষ্ট করেছে?*

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের কথা উল্লেখ আগেই করেছি। সংস্কৃত প্রেসের পুরোনো কাঠের যন্ত্র অন্য কোনও এক সময়ে কিনে নেন হরিপদ চট্টোপাধ্যায় যিনি পালাগান লিখতেন, এবং নিজস্ব প্রক্রিয়াতে তালপাতা পাকা করে তার ওপর ধর্মগ্রন্থ ছাপতেন পুঁথির বহরে। এরকম বেশ কিছু ছাপা 'পুঁথি' আমি ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে দেখি লন্ডনে। সেখানকার গ্রন্থপালেরা অবশ্য সেগুলির হদিশ জানতেন না, অন্তত সেইদিন পর্যন্ত। শোনা যায়, এক সংস্করণ শ্রীচণ্ডী ছাপতে হরিপদ পালাকার অবিভক্ত মেদিনীপুরের অগুনতি তালগাছ ইজারা নেন। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রেরণা কাজ করেছিল পাঠ্যপুস্তকের ছাপা, প্রকাশের ও বিক্রির ক্ষেত্রগুলিতে, বিশেষ করে পটলডাঙা, কলুটোলা, গোলদিঘি, মির্জাপুর, আরপুলি, ঝামাপুকুর, ঠনঠনে ও বউবাজার অঞ্চলে।

৫। *মুদ্রণ, প্রকাশনা আর বইয়ের ব্যবসা কি একত্রবদ্ধ হয়ে দেখা দিল?*

মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বইয়ের দোকান চালানো এক জিনিস নয়। আমরা বইয়ের ব্যবসার দিকটাই ভাবি বরঞ্চ। অনেকেই উৎসাহী হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে

রামতনু লাহিড়ীর পৌত্র এস কে লাহিড়ী যেমন ছিলেন, তেমন ছিলেন আশুতোষ দেব, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। ১৮৬৭ সালে জন্মেছিলেন আশুতোষ দেব। তিনি যেমন অজস্র গান, অভিধান ও মানে বই রচনা করেছেন, তেমনই একাধিক প্রকাশনা সংস্থা ও টাইপ ফাউন্ড্রির ব্যবসা চালিয়েছেন। আজকের অনেক বিখ্যাত বই-বিপণি ১৮৮০-৯০ থেকে কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে ব্যবসা করছে, যেমন দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি (১৮৮৬)। তবে বেশিরভাগ মালিকানারই হাতবদল ঘটেছে, উঠে গেছে কিছু সংস্থা। পরে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পরামর্শে চাকরির সন্ধান ছেড়ে তাঁর তিন কৃতী ছাত্র — রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী, মুকুন্দলাল চক্রবর্তী ও অহীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় — ওই পাড়ায় বইয়ের ব্যবসা শুরু করেন ১৯১০ সালে। সেটিই অ্যালবার্ট হলের বিখ্যাত চক্রবর্তী, চ্যাটার্জি অ্যান্ড কোম্পানি। এখানেও ঈশ্বরচন্দ্রের দৃষ্টান্ত প্রেরণার উৎস ছিল বলে আমার বিশ্বাস। আরও অনেক বিদ্বজ্জন ওই পথ ধরে এসেছেন এই ব্যবসায়ে তার পরে। সবাই হয়তো বড়ো মাপের ছাপা ও প্রকাশনা সংস্থা খোলেননি, কিন্তু নিজস্ব তাগিদে ও উৎপাদন-বিপণনের খরচ কমাতে ঈশ্বরচন্দ্রের অনুসরণ করেছিলেন। যেমন নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র বাণী প্রেস স্থাপন করেন। সেখান থেকে তাঁর দাদা হরেন্দ্রনাথের ষান্মাসিক 'ইন্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার' নৃপেন্দ্রনাথ ছাপেন ও প্রকাশ করেন ১৯১৯ থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত। কয়েকটি নমুনা দিলাম। আশিস খাস্তগীর ও মুনতাসীর মামুন যথাক্রমে পশ্চিম ও পূর্ব বাংলা থেকে আরও অনেক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

৬। *বাঙালি শিক্ষিত শ্রেনীর ছাপাখানায় প্রাথমিক উদ্যোগগুলির চেহারার কথা মনে রাখলে বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনা এবং প্রয়োগ কী ভাবে আলাদা?*

রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — বহু বাঙালি ভাবুক নিজস্ব ছাপাকলকে তাঁদের মনীষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের নানা শাখা তাদের নিজেদের ছাপাকল থেকে বই-সাময়িকপত্র প্রকাশ করত, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় খুলেছিলেন চন্দ্রিকা যন্ত্র, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁর গ্রিস ও রোমের ইতিহাস ছেপেছিলেন ১৮৫৬ সালে তাঁর বাবার দেওয়া টাকায় কেনা নিজের প্রেসে, কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র-সঞ্জীবচন্দ্রের প্রেস ছিল, কলকাতার গড়পারে উপেন্দ্রকিশোরের ইউ রায়ের প্রেস ছিল উদ্ভাবনা ও প্রযুক্তির দিক থেকে অগ্রসর, সুরি লেনে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের নিজস্ব প্রেসে ছাপা হয় তাঁর

মহাভারতের অনুবাদ, নগেন্দ্রনাথ বসু নিজের প্রেসে 'বিশ্বকোষে'র কাজ শেষ করেন, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত সস্তার হাতে-চালানো প্রেস কিনে তাঁর বিখ্যাত 'জঙ্গীপুর সংবাদ' ছাপতেন। মৌলবি আবদুল করিম সিলেটি নাগরি বর্ণমালার সংস্কার করে ওই হরফে বাংলা বই ছাপেন শ্রীহট্ট থেকে। তার জন্য তিনি তাঁর নিজের প্রেস ইসলামিয়া প্রেস স্থাপন করেন শ্রীহট্টে, ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে ইওরোপ ঘুরে ফেরার পর। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওমাহা থেকে উপহার পাওয়া ছাপাকল রবীন্দ্রনাথ এনে বসান শান্তিনিকেতনে এবং সুকুমার রায়কে দিয়ে শ্রীনিকেতনের ছাত্রদের কাজ শিখিয়ে নেন, বাঁধাই ইত্যাদি কাজও শেখান সুরুলের সাঁওতাল কয়েকজনকে। এর সঙ্গে আরও অজস্র নাম যোগ করা যায়, আমি বিভিন্ন কালখণ্ড থেকে নমুনা হিসেবে কয়েকটি নামের উল্লেখ করলাম।

কয়েকটি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান বাদ দিলে এঁদের মধ্যে খুব কম উদ্যোগী বাণিজ্যের প্রসারে নিষ্ঠাবান ছিলেন, যদিও ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুদ্রণ ও প্রকাশন সংস্থার মতো ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টাও ছিল, পরে দেখা গিয়েছিল উপেন্দ্রকিশোরের মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রতিভা, বাণিজ্যিক মেধা ও চমকপ্রদ শিল্প ও সাহিত্যকর্মের বিরল সংশ্লেষ। এঁরা কেউই কিন্তু কলকাতার লাল্লু লালের মতো বড়ো মাপের বই ব্যবসার পরিকল্পনা করেননি, যদিও লাল্লু লালের সংস্কৃত প্রেসে উঁচু জাতের সংস্কৃত ও বাংলা বই ছাপা হত। বাবু রামের সংস্কৃত প্রেস মুখ্যত ছিল ফোর্টের শিক্ষার্থীদের জন্য নাগরি হরফে সংস্কৃত বই ছাপার প্রেস। ১৮০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত খিদিরপুরে এই ছাপাখানা গড়ের মুনশি লাল্লু লাল কিনে নেন ১৮১৪ নাগাদ। (যতদূর জানি, প্রেসটি এনে বসানো হয় পটলডাঙায়)। লাল্লু লাল ছিলেন পণ্ডিত অধ্যাপক, ফারসি ভাষা থেকে দিল্লি-আগ্রার হিন্দুস্থানিতে একাধিক গ্রন্থের অনুবাদক, উপরন্তু হিন্দুস্থানি ভাষায় সাহিত্য রচয়িতা। তবে গুজরাটি মুনশি লাল্লু লাল নিজের ব্যবসার সঙ্গে ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা ও সমাজের সংস্কারের কোনও কর্মকাণ্ডের যোগ কল্পনা করেছিলেন বলে জানি না।

এখানেই ঈশ্বরচন্দ্র আলাদা। তাঁর ছিল ব্যবসায়িক বুদ্ধি, বিদগ্ধ লেখকের বিদ্যা এবং সামাজিক ন্যায়ের সংগ্রামে মুদ্রণযন্ত্রকে শামিল করার মতো বিবেক। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা ও বাণিজ্যকে যেভাবে মেলাতে চেয়েছিলেন সেটা তৎকালে

ব্যতিক্রমী। সংস্কৃত যন্ত্র ঠিক কবে প্রতিষ্ঠিত হয় সে বিষয়ে খানিক মতভেদ আছে, কিন্তু সেখানে ১৮৪৬ সালের জুন থেকে ১৮৪৭ সালের জুলাই মাসের মধ্যে কাজ শুরু হয় বলে মনে করেন অভিজিৎ নন্দীর মতো সাম্প্রতিক গবেষকেরা। মনে রাখতে হবে যে, ১৮১৮ সালে ডেভিড হেয়ারের আরপুলি পাঠশালা — পরে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল, এবং অধুনা হেয়ার স্কুল — খোলা হয় কলুটোলায় (১৮৭২ সালে সেটি উঠে আসে আজকের হেয়ার স্কুলের বাড়িটিতে), ১৮২৪ সালে সংস্কৃত কলেজের ক্লাস শুরু হয় বউবাজারে ভাড়া বাড়িতে এবং তারপর কলেজ স্ট্রিটে নতুন বাড়িতে ১৮২৬ সালের মে মাসে কলেজের স্থানান্তর হয়, সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু কলেজের ক্লাসও সংস্কৃত কলেজের নতুন ভবনে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়, ১৮৩৫ সালে কলেজ স্ট্রিটে মেডিকেল কলেজের পত্তন হয়, বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের স্বার্থে ঈশ্বরচন্দ্রের সক্রিয় সমর্থনে ১৮৪৯ সালে খোলে বেথুন স্কুল, সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যক্রমের পুনর্বিন্যাস হয় অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে ১৮৫১ সালের পর, ১৮৫৫ সাল নাগাদ ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যালয়ের বিশেষ পরিদর্শকের কাজে নিযুক্ত হওয়ার পর গ্রামে গ্রামে কুড়িটি আদর্শ বিদ্যালয় খোলার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয় এবং ঈশ্বরচন্দ্রের উদ্যোগে ১৮৫৫ সালে নর্মাল স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়, ১৮৬৪ সালে ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুলের দায়িত্বভার নিয়ে সেটিকে হিন্দু মেট্রোপলিটান ইন্সটিট্যুশনে রূপান্তরিত করেন ঈশ্বরচন্দ্র (যে প্রতিষ্ঠান থেকে ১৮৭২ সালে সৃষ্টি হয় এক কলেজের, যেটি কিনা আজকের বিদ্যাসাগর কলেজ), ১৮৫৫ সালের জুন মাসে হিন্দু কলেজ সরকার অধিগ্রহণ করে এবং তার পাঠশালা বিভাগের (যেটি এখনকার হিন্দু স্কুল) আলাদা হয়ে যায়, ১৮৫৭ সালে প্রতিষ্ঠা হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (যে প্রকল্পে ঈশ্বরচন্দ্রের উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল), ১৮৭৪ সালের মার্চ মাসে সংলগ্ন অঞ্চলেই প্রেসিডেন্সি কলেজের নতুন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন হয় এবং সংস্কৃত কলেজ ছেড়ে প্রেসিডেন্সি উঠে আসে নতুন বাড়িতে (সংস্কৃত কলেজ ছাড়াও প্রেসিডেন্সি তথা হিন্দু কলেজের ঠিকানা ছিল নানা জায়গায় — গরানহাটায়, অ্যালবার্ট হলেও একসময় কিছু ক্লাস হয়েছে) — বাংলার শিক্ষাজগতে এরকম পরের পর নানা ঘটনা পুস্তক ব্যবসায়ের চেহারা বদলে দিতে সুবিধে করে দিয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্রকে, যদিও সংস্কৃত প্রেস যখন খোলে তখন কলেজ স্ট্রিটকে ঘিরে এই বাজার পূর্ণাঙ্গ রূপে গড়ে ওঠেনি। তবুও আরপুলি, আমহার্স্ট স্ট্রিট, মির্জাপুর, টেমার লেন ও বউবাজারে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয়ে উঠছিল মুদ্রণ ও প্রকাশন বাণিজ্যের প্রাথমিক

আয়োজন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধিতে স্বাভাবিকভাবেই মুদ্রণ ও প্রকাশনার কেন্দ্র সরে আসে বটতলা থেকে গোলদিঘি, কলুটোলা, মির্জাপুর ও সেকালের মাধববাবুর বাজারের পাড়ায়। অঞ্চলটিতে কাটতি বেশি হতে থাকে পাঠ্যপুস্তকের, কাব্য-কাহিনি-পদ্য-পাঁচালি-পুরাণ-ইতিহাসের নয়। এই পর্বের গোড়াকার দিকেই পাঠ্যপুস্তকের নতুন চাহিদার সুযোগ নিতে পেরেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র ও তাঁর সহযোগীরা। সংস্কৃত প্রেসের ছাপাখানা সম্ভবত ছিল মেডিকেল কলেজের কাছে আরপুলি লেনে, এবং ডিপোজিটরি — মানে, যেখান থেকে ক্রেতা বই পেতে পারতেন — ছিল আমহার্স্ট স্ট্রিটে, মতান্তরে, কলেজ স্ট্রিট ও মেছুয়াবাজারের মাঝামাঝি ৩০ নম্বর বেচু চাটুজ্জে স্ট্রিটে। স্বত্বাধিকারীদের লেখা বই ছাড়াও অন্যান্য পাঠ্যপুস্তক প্রণেতার বইও মিলত ডিপোজিটরিতে।

এই বিচারে ঈশ্বরচন্দ্রের উদ্যোগ — প্রকাশনা ও বিপণন উভয় দিক থেকেই — মৌলিক অর্থে ভিন্ন। মনে রাখতে হবে যে, ইয়ং বেঙ্গলের প্রজন্মের অনেকেই উদ্যোগপতি হয়েছিলেন — যেমন রামগোপাল ঘোষ, যিনি ইহুদি ব্যবসায়ীর দপ্তরে কর্মজীবন আরম্ভ করে ভারত থেকে মায়ানমারে খাদ্যশস্যের বিপুল কারবার ফেঁদে বসেছিলেন। তিনিই আবার ঈশ্বরচন্দ্রের বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত কার্যাবলিতে অকুতোভয় সহযোদ্ধা ছিলেন। বিশিষ্ট বাঙালি উদ্যোগপতি, বণিক, পাইকার, মহাজন, মুৎসুদ্দি এবং বিদেশি পণ্যের স্থানীয় কারবারি যাঁরা ছিলেন — যেমন রামদুলাল দেব, বটকৃষ্ণ পাল, শ্রীশচন্দ্র গুহ — আমি জমিদারবর্গদের হিসেবের বাইরে রাখছি — এঁরা কেউই বিনিয়োগের মাধ্যমে বিদ্যা ও বাণিজ্যের সেতুবন্ধনে উৎসাহী ছিলেন না, বড়জোর জনহিতকর কাজে তাঁদের সম্পদের কিয়দংশ দান করেছিলেন। এমনকী স্বদেশি বাণিজ্যের প্রবক্তারা — যেমন দর্জিপাড়া এলাকার পি এম বাগচি মুদ্রণ ও প্রকাশনা সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা কিশোরীমোহন বাগচি, যিনি স্বদেশি কালি ও সিলমোহর থেকে পঞ্জিকা তৈরি করে ব্যবসায়ে সফল হন — আমদানি করা পণ্যের বিকল্প উৎপাদনে যতটা সক্রিয় ছিলেন, সমাজ সংস্কার ও শিক্ষার স্বার্থে বাণিজ্যের প্রয়োগে ততটা ছিলেন না। ব্যতিক্রম ছিলেন কয়েকজন, সবসময়েই থাকেন। এ ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্রের যথার্থ উত্তরসাধক ছিলেন বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তিনি হয়তো বই ছাপাননি বা বেচেননি (যদিও বেঙ্গল কেমিকেলস-এর প্রেস ছিল), কিন্তু বিদ্যার তপস্যা করে দেশবাসীর মঙ্গলের জন্যে কল্যাণী লক্ষ্মীর বরলাভে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। সেরকমই আরও একজনের নাম বাঙালি ভুলে

গেছে। তিনি বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের প্রতিষ্ঠাতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড ও ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট সুরেন্দ্রমোহন বসু।

বাঙালি বিশেষজ্ঞদের অনেকে এসব নিয়ে খামোখা তর্ক জুড়ে দেন। বিনয় ঘোষ বলেছেন বিদ্যাজীবী বিদ্যাসাগরের কথা, পরমেশ আচার্য জোর দিয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্রের মুরুব্বির তাকতের ওপর। ঈশ্বরচন্দ্র নিজে ছিলেন অধ্যাপক-অধ্যক্ষ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা ও পরিদর্শক — অর্থাৎ, একজন অগ্রগণ্য শিক্ষা সংগঠক ও প্রশাসক। স্বাভাবিকভাবেই কোন পাঠ্যবইয়ের কেমন বাজার হতে পারে তা তিনি বুঝতেন ভালো, নিজের বাজার তিনি নিজেই খানিক তৈরি করে নিতে পারতেন। তাঁর পাঠ্যপুস্তকের এক বড়ো খরিদ্দার ছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও সরকার, ফলে কর্জ করার বা লগ্নি জোগাড় করা হয়তো তাঁর পক্ষে কিঞ্চিৎ সহজ হয়েছিল। কিন্তু তাতে তাঁর বিপুল কর্ম, অফুরন্ত উদ্যম ও বিচিত্র প্রতিভা লেশমাত্র খর্ব হয় না। বিদ্যালয় ও কলেজে সংস্কৃত শিক্ষার জন্যে তিনি রচনা করেন 'উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী', এ ছাড়া অসংখ্য ছাত্রপাঠ্য বই — 'বোধোদয়', 'বর্ণপরিচয়', 'কথামালা', 'ঋজুপাঠ', 'চরিতাবলী'। আমি তাঁর অনুবাদ, সম্পাদনা, সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে রচিত বিবাদাত্মক রচনা, এবং সংস্কৃত সাহিত্য থেকে সরল বাংলায় নানা আখ্যান গ্রন্থের কথা ধরছিই না। কেবল ব্যবসার কথা ভাবলে ঈশ্বরচন্দ্র নিজের হাতে তৈরি করা ফাঁকা মাঠে উৎকৃষ্ট মানে বই লিখেই থলি-ভরা টাকা নিয়ে মাঠ ছাড়তেন। উপরন্তু, তাঁর বাণিজ্যিক সাফল্যে ক্ষুণ্ণ হয় না তাঁর অকৃপণ বদান্যতা ও সমাজের মোড়ল-পেয়াদাদের বিরুদ্ধে তাঁর দৃঢ় ও সাহসিক বিগ্রহ। বিদ্যা ও বাণিজ্যলক্ষ্মীর বিরুদ্ধভাব নয়, ঈশ্বরচন্দ্র নিজের 'সোশাল ক্যাপিটাল' কী উপায়ে ও কী উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছিলেন সেটি মুখ্য বিচার্য। মুরুব্বির জোর এবং পেশাজনিত সুযোগ এ হেন 'সোশাল ক্যাপিটাল'-এর আওতায় পড়ে, সে তত্ত্বে হোক অথবা সামূহিক আচরণে। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি নয়, বিদ্যাসঞ্জাত অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যিক বিনিয়োগ এবং সামাজিক পুঁজির নিরিখে বিচার করতে হবে ঈশ্বরচন্দ্রের অবদান।

৭। *প্রায় ৩০০০ টাকা মাসিক আয় থেকে আয় বৃদ্ধির পথে না গিয়ে, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত যন্ত্রর অধিকাংশ অংশ বিক্রি করলেন কেন? এখানে কি কোনও আদর্শের সংঘাত আছে?*

এই বিষয়ে আমার জ্ঞান সীমিত। আদর্শের সংঘাত ছিল কি না বলতে পারব না। তবে মতান্তর হয়েছিল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার নাকি তাঁর লভ্যাংশের ভাগ বুঝে

নিয়ে 'শিশুশিক্ষা' প্রথম ভাগ ইত্যাদির বইয়ের স্বত্ব ঈশ্বরচন্দ্রকে লিখে দেন। কিন্তু মদনমোহনের জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ঈশ্বরচন্দ্রের বিরুদ্ধে পরস্বহরণের অভিযোগ আনেন। তিনি যে মদনমোহনকে ঠকাননি তা প্রমাণ করতে এর প্রায় সতেরো বছর পরে ১৮৮৮ সালে ঈশ্বরচন্দ্র লেখেন 'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস'। তবে অভিজিৎ নন্দীর মতে এই জবানবন্দিতে বেশ কিছু গরমিল রয়েছে। সেই যুক্তি-প্রতিযুক্তি আপনারা পড়ে দেখতে পারেন।

ডিপোজিটরির দায়িত্ব ঈশ্বরচন্দ্র কৃষ্ণনগরের ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়ের হাতে বিনামূল্যে ছেড়ে দেন কর্মীদের ওপর বিরক্ত হয়ে। এ নিয়ে দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন আপত্তি জানিয়েছিলেন। তখন ঈশ্বরচন্দ্রের ৫০,০০০ টাকার মতো ধার, কারণ বিধবাবিবাহের প্রকল্পে অনেকেই চাঁদা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শেষ পর্যন্ত দেননি, ঈশ্বরচন্দ্রকে গুনতে হচ্ছে সুদ। ১৮৫৯ সালে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৪০০০ টাকায় এক-তৃতীয়াংশ ও কালীচরণ ঘোষকে এক-তৃতীয়াংশ ৪০০০ টাকায় বিক্রি করেন। শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে তাঁর পাওনা টাকা শোধ করেছিলেন বিক্রির টাকা থেকে। শেষ তৃতীয়াংশ ১৮৮৪ সালে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেচে দেন। বিহারীলাল সরকার বলছেন বিক্রির কারণ ছাপাখানার কাজে সেই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রের 'প্রবৃত্তিহীনতা'; 'অধিকন্তু ইহাতে তাঁহার অনেক টাকা ঋণশোধ হইয়াছিল'। এর বেশি আমার পক্ষে বলা অনধিকারচর্চা হবে।

৮। *এই উদ্যোগে পুঁজির চেহারা কেমন? তার কী কোনও বদল ঘটে? এই ক্ষেত্রে বিলিতি বিনিয়োগ কি আদৌ ছিল?*

এখানে মোট তিনটি প্রশ্ন করা হয়েছে। অল্প কথায় সারি।

ঈশ্বরচন্দ্রের পুঁজির সূত্র ছিল দেশি ও তাঁর উত্তমর্ণ ছিলেন তাঁর সুপরিচিত মানুষ, কলকাতা উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ঘরের ব্রাহ্মণ। এখানে পুঁজির জোগানদাতা কোনও বাণিজ্যিক আর্থিক সংস্থা নয়। এর ভিত্তি বিশ্বাস, যা আবার নির্ভর করে স্বজাতির সামাজিক সম্পর্ক, বর্ণকৌলীন্য, শ্রেণি, পেশা ও শিক্ষার ওপর। এমন অসংগঠিত ব্যবস্থা ইসলামি দেশের হাওয়ালার মতো নয়। সামাজিক উদ্দেশ্যের মিল না থাকলে ঋণদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে এমন সমঝোতা সম্ভব নয়। ঈশ্বরচন্দ্রের সুবিদিত বৈষয়িক বুদ্ধি কিন্তু তাঁকে অশ্রুতপূর্ব অঙ্কের দান, চাঁদ ও ঋণ দেওয়া থেকে বিরত করেনি। হয়তো এই কারণেই করেনি যে, এই ব্যবস্থার সুবাদেই তাঁর বিপুল

অর্থাগম হয়েছিল। তাঁর ক্ষেত্রে অন্তত এই পুঁজির কোনও মৌলিক বদল ঘটেনি, ব্যবসা বাড়ায় উদ্বৃত্ত লাভ ফের কারবারে লগ্নি করা সম্ভব হয়েছিল। উপরন্তু ছিল ফোর্টের ও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা, যা ছিল তাঁর সামাজিক পুঁজি ও ঋণের পরোক্ষ জামানত।

বিলিতি তথা বিদেশি পুঁজির কথায় আসি। ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠান ও পাঠ্যক্রম চালু হওয়ায় বিদেশি প্রকাশকদের অখণ্ড ভারতের বাজারে উৎসাহ বৃদ্ধি প্রত্যাশিত ছিল। আঠারো শতকের আটের দশকে ক্যাসেল অ্যান্ড কোম্পানি, টমাস নেলসন অ্যান্ড সন্স, পার্সিভাল অ্যান্ড কোম্পানি প্রভৃতি লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিসে বার বার পত্রাঘাত করে ভারতের ইশকুল-কলেজের সিলেবাস সম্পর্কে খোঁজ করত। কিন্তু অচিরে তারা বুঝে যায় যে, 'মাল্টিন্যাশানাল মডেল' এক্ষেত্রে খাটবে না। এত সংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, এতরকমের অক্ষর ও সংখ্যা, এত বিচিত্র ধরনের মাপজোকের একক, এ সমস্তের প্রতি সুবিচার করতে হলে রফতানির কথা ভাবলে চলবে না, স্থানীয় লোকেদের দিয়ে বই লেখাতে হবে। এদিকে ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা, ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি, ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি আগে থাকতেই এ কাজ শুরু করে দিয়েছে। উপরন্তু উইলিয়াম লি-ওয়ার্নারের মতো ভারতের সাহেব প্রশাসকরা নিজেদের পদমর্যাদার সুযোগে পাঠ্যক্রমের সঙ্গে মানিয়ে পাঠ্যপুস্তক ও মানে-বইয়ের কারবার ফেঁদে বসে আছেন। ফলে পুঁজির যা চেহারা দাঁড়ায় তা এক হিসেবে 'মাল্টিডোমেস্টিক', 'মাল্টিন্যাশানাল' নয়। অঙ্ক, বিজ্ঞান চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং আইন — এসব বিষয়ে বইয়ের আমদানি নিঃসন্দেহে বেড়েছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ইশকুল-কলেজে পাঠ্য ইংরেজি সাহিত্যের ও ইতিহাসের বেশিরভাগ বই ছিল কপিরাইট মুক্ত। অন্যথা অর্থপুস্তকের অছিলায় আস্ত বইই দেশি প্রকাশনায় ঢুকিয়ে নেওয়া চলত। এ জিনিস শুধু বঙ্গদেশে নয়, ভারতের অন্যত্রও হয়েছে। উলরিক্ স্টার্ক, রিমি বর্ণালী চট্টোপাধ্যায় ও ফ্রাঞ্চেস্কা অরসিনির গবেষণা থেকে তেমন ইঙ্গিতই পাই। বিদেশি পুঁজি লাভজনক হয়েছিল ভারতে নিজেদের বই লিখিয়ে নিয়ে, ছাপিয়ে, দরকারে শাখা খুলে। এ ব্যাপারে ম্যাকমিলান বা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস বিশ শতকের গোড়ায় খুবই সফল হয়।

শেষে একটি সংলগ্ন প্রসঙ্গের কথা বলি। ১৮১৩ সালের চার্টার অ্যাক্ট-এর কল্যাণে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া কারবারের অধিকার খর্ব হয়।

তার আগে বিদেশি বিনিয়োগ নয়, ছিল নির্লজ্জ ঔপনিবেশিক লুঠপাট, সম্পদের উৎপাদনের বদলে সম্পদের চালান হয়েছে অসংযত মাত্রায়। এরপর ১৮৫৮ সালে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে, আরম্ভ হয় নিঃশর্ত সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব। পুঁজির প্রসঙ্গ পাড়লে এই তিন পর্বের কথা আলাদা আলাদা করে ভাবতে হয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে, ১৮৩৪ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর যে কার, টেগোর অ্যান্ড কোম্পানি খুলেছিলেন উইলিয়াম কারকে অংশীদার করে, তাতে তিনি ছিলেন পুঁজির জোগানদার এবং সংস্থাটি তাঁর অন্যান্য উদ্যোগের ম্যানেজিং এজেন্সি হিসেবে কাজ করে। এই উদ্যোগগুলির মধ্যে ছিল তাঁর নীল, আফিম ও কয়লাখনির ব্যবসা। কেবল রেল চালানোর ব্যাপারে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জেদের কাছে হেরে যান। ব্রিটিশ শাসনের পর্ববিভাগ খেয়াল রাখলে ঔপনিবেশিক শোষণের যুগেই স্বদেশি ও বিদেশি পুঁজির যৌথ বিনিয়োগ আশ্চর্যের ঠেকে না।

অর্থনীতির ইতিহাসের চর্চা যাঁরা করেন তাঁরা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, তাঁরা প্রশ্নগুলির আলোচনার অধিকারী। আমার কাণ্ডজ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় বিস্তৃত ও সূক্ষতর ব্যাখ্যায় অক্ষম।

৯। *বই, এই পণ্য দ্রব্যটির উনিশ শতকীয় চেহারা কি বদলাচ্ছিল? বিদ্যাসাগরের কাছে এই বই নামক পণ্যের গুরুত্ব কতটা?*

এটি আসলে একটি নয়, দুটি প্রশ্ন।

যে উৎপন্ন জিনিস বাজারে পয়সার বিনিময়ে বিক্রি ও কেনা হয় তা অবশ্যই পণ্য। পণ্য হিসেবে বই তাঁর কাছে গুরুত্ব না পেলে ঈশ্বরচন্দ্র এই ব্যবসায় আসতেন না, পুস্তক-পাঠ্যক্রম সংস্কারে এত আগ্রহী হতেন না। তবে পণ্য যেখানে নিছক পণ্য সেখানেও তার একটি 'প্রোডাক্ট সাইক্‌ল' থাকে, তাকে ক্রমাগত নতুন করে উদ্ভাবিত হতে হয়। অর্থব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক না হলেও এই নিয়ম খাটে। ঈশ্বরচন্দ্রের উদ্ভাবনার তাগিদ স্রেফ মুনাফা ছিল না, তাঁর কাছে বই নিছক পণ্য ছিল না — এ কথা বলা বাহুল্য। সেখানে সামাজিক সংস্কার ও সংগ্রামের প্রকল্প ছিল, ছিল ব্রতের মহনীয়তা। কোনও পণ্যরতি বা 'বনামবাজি'র ছকে এ জিনিস ব্যাখ্যা করা ঠিক হবে না।

এক আস্ত শতাব্দী জুড়ে বইয়ের চেহারার বদল এক মস্ত ও আলাদা প্রসঙ্গ, বলতে গেলে একটি বড়োসড়ো প্রবন্ধেও কুলোবে না। কয়েকটি স্থূল আঁচড়ে কাজ সারছি।

উনিশ শতক জুড়ে ছাপা বই আগেকার কালের পুঁথির লিপিকরদের রীতিনীতি ছেড়ে এক মুদ্রণ-সংস্কৃতির সংকেত-প্রণালীর দিকে এগিয়েছে। সেটা আখ্যাপত্রের চেহারায় হোক, বর্ণযোজনার রীতিতে হোক, যুক্তব্যঞ্জনের রূপে হোক, বা প্রচ্ছদে হোক। এ ছাড়া প্রযুক্তির কল্যাণে কাঠখোদাই, উড-এনগ্রেভিং, লিথোগ্রাফ ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় ছাপা ছবি ক্রমশ বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। হরফের ছাঁচ ও ঢালাই, বানানরীতি, যতিচিহ্নের ব্যবহার, পৃষ্ঠাসংখ্যা বসাবার নিয়ম, শীর্ষক-নির্ঘণ্ট-সূচি-প্রারম্ভিক 'ম্যাটার' — সবকিছুর মধ্যেই যে প্রবণতা দেখা যায় তা হল সমতার। 'স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন' ছাড়া কোনও শতাব্দীতে কোনও সংস্কৃতিতে ছাপা বই সফল হয়নি। একটু ভাবলেই বোঝা যায় যে, তা নাহলে একই বইয়ের কাজ বা তার বিভিন্ন খণ্ডের কাজ একাধিক প্রেসে বা ভিন্ন ভিন্ন কম্পোজিটরকে দিয়ে করানো সম্ভব হবে না, এক রাজ্য থেকে অন্য এক রাজ্যে গিয়ে মুদ্রাকর কাজ পাবেন না। ১৮৭০ সালেও দেখি ওরিয়েন্টাল প্রেসের মালিক যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ জাতীয় মেলার ভাষণে বলছেন যে, রীতিনিয়মের সমরূপতা ছাড়া বাংলা ভাষায় মুদ্রণের উন্নতি অসম্ভব।

এ ছাড়া বেশি কাটতির বইয়ের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ ও চুরির চেষ্টায় লেখকের ও প্রকাশকের সিলমোহর বসানোর ও নকল করার চেষ্টাও দেখি, তা ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির মোহরই হোক, বা ঈশ্বরচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের সইয়ের প্রতিলিপিই হোক। কালোবাজারও বাজারের বিস্তারের এক অব্যর্থ লক্ষণ।

তথ্যসূত্র

(সময় ও স্থান সীমিত, কাজেই এই সূত্রপঞ্জি পূর্ণাঙ্গ নয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিজের রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়নি। লেখ্যাগারে সংগৃহীত দলিল, চিঠি, প্রতিবেদন, গ্রন্থপঞ্জি ইত্যাদিরও উল্লেখ করিনি। বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত সুপরিচিত আলোচনা ও জীবনীগ্রন্থ বাদ গেছে, যদি না তা আমি এই প্রশ্নোত্তরে ব্যবহার করে থাকি।)

১। অতুল সুর, *বাংলা মুদ্রণের দু'শ বছর* (কলকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৩৮৫)

২। অভিজিৎ নন্দী, 'বইপাড়ায় বিদ্যাসাগর', *মুদ্রণের সংস্কৃতি ও বাংলা বই*, স্বপন চক্রবর্তী সম্পাদিত (কলকাতা : অবভাস, ২০০৭), ৭৯-১০৭

৩। আশিস খাস্তগীর, *উনিশ শতকের বাংলা ছাপাখানা* (কলকাতা : সোপান, ২০১৪)

৪। ইন্দ্রমিত্র, *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর* (১৯৬৯; কলকাতা : আনন্দ, ১৯৯৭)

৫। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন* (কলকাতা : আনন্দ, ১৯৮১)

৬। পরমেশ আচার্য, *বাঙালী প্রবুদ্ধ সমাজের সীমা ও বিদ্যাসাগর বিতর্ক* (কলকাতা : নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট, ২০০২)

৭। প্রসাদ সেনগুপ্ত, *হিন্দু কলেজ* (কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ২০১৬)

৮। বরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড : আদি যুগ ১৬৬৭-১৮৩৪ (কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫)

৯। বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, ৩ খণ্ড (১৩৬৪-৬; প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, কলকাতা : ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৯৯)

১০। বিহারীলাল সরকার, *বিদ্যাসাগর* (১৮৯৫; কলকাতা : নবপত্র, ১৩৮৮)

১১। মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে ঢাকার মুদ্রণ ও প্রকাশনা, ১৮৪৮-১৯০০* (ঢাকা : সময়, ২০০৪)

১২। যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, *বাংলা মুদ্রাঙ্কণের ইতিবৃত্ত ও সমালোচনা* (কলকাতা: নূতন বাংলা যন্ত্র, ১৮৭৩)

১৩। শ্রীপান্থ, *যখন ছাপাখানা এল* (১৯৭৭; কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৬)

১৪। স্বপন চক্রবর্তী, 'বাংলা মুদ্রণের আদিপর্বে যতিচিহ্নের প্রয়োগ', *পরিচয়*, ৮৭.২ (নভেম্বর ২০১৮ - ফেব্রুয়ারি ২০১৯), ৪১-৬৯

১৫। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *নির্বাচিত হরপ্রসাদ : সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা*, সত্যজিৎ চৌধুরী ও বিজলি সরকার সম্পাদিত (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০২)

১৬। Swapan Chakravorty, 'Educational Texts in Bengal, 1830-1900: Some Problems Relating to British Imports', *Founts of Knowledge: Book History in India,* ed. Abhijit Gupta and Swapan Chakravorty (Hyderabad: Orient BlackSwan, 2016), 317-33

১৭। Swapan Chakravory (ed.) *200 Years: Hindu College to Presidency University* (Kolkata: Presidency University, 2018)

১৮। Rimi B. Chatterjee, *Empires of the Mind: A History of the Oxford University Press in India under the Raj* (New Delhi: Oxford University Press, 2006)

১৯। Abhijit Gupta, 'The History of the Book in the Indian Subcontinent', *The Oxford Companion to the Book,* ed. Michael F. Suarez SJ and H. R. Woudhuysen, 2 vols. (Oxford: Oxford University Press, 2010), vol. 1, 340-52

২০। John Murdoch, *Letter to Babu Ishwar Chandra Bidyasagor on Bengali Typography, 22 February 1865* (1865; London: British Library, 2010)

২১। Francesca Orsini, *Print and Pleasure: Popular Literature and Entertaining Fictions in Colonial North India* (Ranikhet: Permanent Black, 2009)

২২। Fiona G.E. Ross, *The Printed Bengali Character and Its Evolution* (Richmond, Surrey: Curzon Press, 1999; Kolkata: Sahitya Samsad, 2009)

২৩। Ulrike Stark, *An Empire of Books: The Naval Kishore Press and the Diffusion of the Printed Word in Colonial India* Ranikhet: Permanent Black, 2007)

সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালির পরিচয় ঃ বিদ্যাসাগরের ভূমিকা

মৌ দাশগুপ্ত

সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালিকে পরিচিত করানোর বিষয়ে বিদ্যাসাগরের ভূমিকার কথা আলোচনা শুরু করতে গেলে তাঁর প্রাতঃস্মরণীয় *ব্যাকরণকৌমুদী*র (১৮৫৩ খ্রি.) কথাই বোধহয় সবার আগে বলা উচিত, কিন্তু এই গ্রন্থটির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল - সহজে শুদ্ধভাবে সংস্কৃতভাষা বাঙালি ছাত্রদের শেখানো - সে-ভাষার সাহিত্যের পরিচয় দেওয়া নয়। সে-জন্যে এই আলোচনার পরিসরে আনছি না এই বইটির প্রসঙ্গ। যদিও বাঙালির সহজে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য এর-ও আগে তিনি রচনার করেন *সংস্কৃত-ব্যাকরণের উপক্রমণিকা* (১৮৫১), কিন্তু উপরি উক্ত দুটি গ্রন্থেই পাণিনির সংস্কৃতে রচিত সূত্রগুলির ব্যাখ্যা, ভাষ্য প্রভৃতি বাংলাভাষায় করলেও এই বইদুটিকে সরাসরি সংস্কৃত থেকে বাংলায় বিদ্যাসাগরের অবদান বলে গণ্য করা অনুচিত হবে; তার কারণ আগেই বলেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরের *বর্ণপরিচয়* (১৮৫৫) সম্পর্কে এ প্রবন্ধে আলাদা করে বলতেই হয়, কারণ সংস্কৃত বর্ণমালা থেকে বাংলা বর্ণমালার বর্তমান রূপটিকে বিশিষ্ট করে তোলার পিছনে বিদ্যাসাগরের অবদানের কথা না বললে এ প্রবন্ধে ত্রুটি থেকে যাবে।

প্রতিটি সাক্ষর বাঙালির প্রথম গুরু-ঋণ বিদ্যাসাগরের কাছে। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে (পয়লা বৈশাখ, ১৯১২ সংবৎ) সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ থাকার সময়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা বাংলার ছেলেমেয়েদের সহজে মাতৃভাষা শেখানোর জন্য *বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ*প্রকাশিত করেন।

বর্ণপরিচয়-এর প্রথম ভাগের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর তাঁর এই গ্রন্থের কয়েকটি আদর্শ ও বিধির কথা বলেছিলেন। সেই যুগে প্রচলিত বাংলা

বর্ণমালা সংস্কৃত মাতৃকাপাঠের অনুসারী ছিল, কিন্তু বিদ্যাসাগর বাংলা বর্ণমালার সংখ্যা ও জাতি নির্ধারণে যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন তা সে যুগের পক্ষে বিস্ময়কর। সংস্কৃতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ফলেই বিদ্যাসাগর সেই ভাষার থেকে তাঁর মাতৃভাষার প্রধান পার্থক্যগুলি সহজে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। সুদীর্ঘ কাল ধরে চলে আসা ঐতিহ্যের অন্ধ অনুসরণ না করে ভাষাতত্ত্ব-সম্মত যুক্তিমনস্ক বিচারে তিনি নতুন করে বিন্যস্ত করলেন বাংলার যাবতীয় বর্ণমালা। বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনটি পড়ে বুঝতে চেষ্টা করা যেতে পারে উনিশ শতকের এই বাঙালি মনীষীর দৃষ্টিভঙ্গি —

> *"...বহুকাল অবধি, বর্ণমালা ষোল স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জন এই পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় দীর্ঘ ঋকার ও দীর্ঘ ঌকারের প্রয়োগ নাই, এই নিমিত্ত এই দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, অনুস্বার ও বিসর্গ স্বরবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেনা, এজন্য ঐ দুই বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। আর চন্দ্রবিন্দুকে ব্যঞ্জনবর্ণ স্থলে এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গণনা করা গিয়াছে। ড, ঢ, য এই তিন ব্যঞ্জনবর্ণ, পদের মধ্যে অথবা পদের অন্তে থাকিলে ড়, ঢ়, য় হয়। ইহারা অভিন্ন বর্ণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন আকার ও উচ্চারণ উভয়থাই পরস্পর ভেদ আছে, তখন উহারা স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হওয়া উচিত, এই নিমিত্ত উহারাও স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনবর্ণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ক ও ষ মিলিয়া ক্ষ হয়, সুতরাং উহা সংযুক্ত বর্ণ, এজন্য অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের গণনাস্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে।"*

বিদ্যাসাগরের নিজের লেখা প্রথম সংস্করণের এই ভূমিকাটি ছাড়াও উল্লেখ করা উচিত *বর্ণপরিচয়*-এর ৬০তম সংস্করণের বিজ্ঞাপনটিকে, ১৯৩২ সংবৎ অর্থাৎ ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগর তাঁর *বর্ণপরিচয়*-এর সর্বশেষ পরিমার্জন করেন। এইখানে তিনি লিখেছেন —

> *"... বাংলা ভাষার তকারের ত, ৎ দ্বিবিধ কলেবর প্রচলিত আছে।*

> *দ্বিতীয় কলেবরের নাম খণ্ড তকার। ঈষৎ, জগৎ, মহৎ প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ লিখিবার সময় খণ্ড তকার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খণ্ড তকারের স্বরূপ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত, বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষার শেষ ভাগে, তকারের দুই কলেবর প্রদর্শিত হইল।''*

— এই দুই বিজ্ঞাপন সম্মিলিত করে বাংলা বর্ণমালার সংখ্যা দাঁড়াল বারোটি স্বর ও চল্লিশটি ব্যঞ্জন অর্থাৎ মোট বাহান্নটি বর্ণ। সংস্কৃতের গতানুগতিক আনুগত্য কাটিয়ে দীর্ঘ ঋ ও দীর্ঘ ৯-এই দুই স্বরবর্ণকে ত্যাগ করে বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার মৌলিকতাকে স্বীকৃতি দিলেন। আরও অনেক পরে, *বর্ণপরিচয়*-এর প্রথম প্রকাশের একশ' বছরেরও বেশি পরে প্রকাশিত বাংলা বর্ণমালা শেখানোর অন্যান্য গ্রন্থে ৯-এই স্বরবর্ণটিকেও অনাবশ্যক-বোধে বাদ দেওয়া হয়, ফলে বর্তমানে বাংলায় স্বরবর্ণের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এগারোতে। আমাদের মনে রাখা দরকার যে এভাবে অপ্রয়োজনীয় স্বরবর্ণকে বর্ণমালা থেকে বাদ দিতে শিখিয়েছিলেন বিদ্যাসাগরই।

আধুনিক বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের বিচারে ড়, ঢ় এবং য় হল স্বনিম (phoneme) অর্থাৎ বাংলা শব্দে এই বর্ণগুলি অন্য বর্ণ দ্বারা প্রতিস্থাপনযোগ্য নয়। এগুলি যদি যথাক্রমে ড, ঢ, এবং য বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয় তবে বাংলা ভাষায় শব্দটির অর্থ বদলে যেতে পারে অথবা শব্দটি নিরর্থক হয়ে পড়তে পারে। যেমন বাড়ির জায়গায় বাডি, আষাঢ়-এর জায়গায় আষাঢ বা আয়নার জায়গায় আযনা হতে পারবে না। কিন্তু, বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় ড় এবং ঢ় আলাদা স্বনিম নয়; এগুলি যথাক্রমে ড এবং ঢ-এর allophone অর্থাৎ কোন্ জায়গায় ড-এর উচ্চারণ ড় আর কোথায় ঢ হবে ঢ় তা যে-কোনও শব্দে তাদের অবস্থান অনুযায়ী পূর্বনির্ধারিত। যেমন, দুটি স্বরবর্ণের মধ্যবর্তী ড বা ঢ-কে বহবৃচ নামে একটি বিশেষ বৈদিক সম্প্রদায় 'ড়' ও 'ঢ়' উচ্চারণ করেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (*প্রবন্ধমালা*, ১৯২০ খ্রি.) বাংলা ভাষাতে ড় এবং ঢ়-কে পৃথক বর্ণের মর্যাদা দিতে চান নি। তিনি বলেছেন শব্দের আদিতে ছাড়া অন্য স্থানে থাকলে সর্বদাই ড এবং ঢ-এর উচ্চারণ ড় ও ঢ় হয়ে থাকে; এজন্য এ-দুটিকে ড ও ঢ-এর রূপ বলে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত, পৃথক ব্যঞ্জনবর্ণ হিসেবে বাংলা বর্ণমালায় এদের গণ্য করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু

বর্ণপরিচয়-এর প্রথম সংস্করণেই বিদ্যাসাগর ড়, ঢ় ও য়-কে স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনের যে-স্বীকৃতি দিয়েছেন তা তাঁর ধ্বনিতাত্ত্বিক দূরদর্শিতারই পরিচয় বহন করে; কারণ পরবর্তীকালে বাংলায় আগত বেশ কিছু বৈদেশিক ঋণশব্দের পাঠে প্রমাদ ঘটত যদি এই ব্যঞ্জনবর্ণগুলির পৃথক অস্তিত্বের স্বীকৃতি না থাকত। যেমন, ইংরেজি রেডিও, বিডিও বা রেডি শব্দগুলির উচ্চারণের ক্ষেত্রে যথাক্রমে রেড়িও, বিড়িও বা রেড়ি-এ-জাতীয় প্রামাদিক পাঠের সম্ভাবনা ঘটত যদি বিদ্যাসাগর ড়, ঢ় ও য়-কে পৃথক স্বনিমের মর্যাদা না দিতেন; কারণ দ্বিজেন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই শব্দগুলির প্রত্যেকটিতেই ড-ধ্বনি শব্দের আদিতে নেই, আছে দুটি স্বরবর্ণের মধ্যিখানে, যেখানে থাকলে দ্বিজেন্দ্রনাথের মত অনুযায়ী তাদের স্বাভাবিক ভাবেই বাংলায় ড়-রূপে উচ্চারিত হওয়া উচিত ছিল।

বিদ্যাসাগর আজ থেকে একশ' পঁয়ষট্টি বছর আগেই উপলব্ধি করেছেন যে নাসিক্য ধ্বনি 'অনুস্বার' ও কণ্ঠমূলীয় ধ্বনি 'বিসর্গ' কোনওভাবেই স্বরবর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনা, কারণ এরা অন্য স্বরের সাহায্য ছাড়া কোনও অক্ষর (syllable) গঠন করতে পারেনা। অথচ, সংস্কৃতের সন্ততিস্থানীয় বাংলার সমতুল্য হিন্দী ভাষার বর্ণমালা রচয়িতারা কিন্তু আজও এ-সসত্য উপলব্ধি করতে পারেন নি, কারণ সেখানে এদুটি আজও স্বরবর্ণমালার অন্তর্গত হিসেবেই গণ্য হয়।

এবারে আসা যাক সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্যকে বাঙালির কাছে পরিচিত করানোর ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে। প্রথমেই আসব কালিদাসের *অভিজ্ঞানশকুন্তল* নাটকের অনুসরণে তাঁর *শকুন্তলা* (১৯১১ সংবৎ - ১৮৫৩ খ্রি) রচনাটি প্রসঙ্গে। এইটি বিদ্যাসাগরের *বর্ণপরিচয়* লেখারও আগের কাজ। সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বোচ্চ আলোকস্তম্ভ যে-কালিদাস, তাঁর অতিপ্রসিদ্ধ নাটকটির সঙ্গে সংস্কৃত না-জানা বাঙালি পাঠককে পরিচিত করানোই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এটি সংস্কৃত নাটকটির হুবহু অনুবাদ নয়, বরং তার ভাব ও কাহিনির অনুকৃতি, যেখানে বিদ্যাসাগরের নিজস্ব সম্পাদনাও একটা মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। প্রসঙ্গত জানাই, *অভিজ্ঞনশকুন্তল* নাটকটির নানারকম পাঠ সারা ভারত জুড়েই পাওয়া যায়, সেটির কাশ্মীরী পাঠ, দক্ষিণভারতীয় পাঠ-এর সঙ্গে বহু প্রাচীনকাল থেকেই সুলভ বঙ্গদেশীয় পাঠ। বিদ্যাসাগর স্বাভাবিকভাবেই শেষের পাঠটির অনুসরণে তাঁর

শকুন্তলা রচনা করেছেন। এই পাঠভেদগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে কাহিনি, সংলাপ ও ঘটনার উপস্থাপনায় বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। আজ পণ্ডিতরা এই *অভিজ্ঞানশকুন্তল*-এর যে ক্রিটিকাল এডিশন করেছেন তার মধ্যে বঙ্গদেশীয় পাঠের অনেককিছুই গৃহীত হয়নি; সেসব কালিদাসের নিজস্ব রচনা নয়, বরং পরবর্তী সময়ে পরিবর্তিত ও প্রক্ষিপ্ত বলে নানা যুক্তিসমেত তাঁরা প্রমাণিত করেছেন। যাই হোক বিদ্যাসাগরের সময়ে এই নাটকের ক্রিটিকাল এডিশন ছিল না, তাই যে বঙ্গীয় সংস্করণটিকে তিনি জানতেন সেটিরই কিছু পরিমার্জনা করে বাঙালির পাঠকদের জন্যে পরিবেশন করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের *শকুন্তলা* নাটক নয়, নাটকের কাহিনি, এর মধ্যে মধ্যে যুক্ত হয়েছে কিছু সংলাপ। এই লেখাটির শুরুতেই বিজ্ঞাপনে তিনি জানিয়েছেন —

> *"যাঁহারা অভিজ্ঞানশকুন্তল পাঠ করিয়াছেন, এবং এই উপাখ্যান পাঠ করিবেন, চমৎকারিত্ব বিষয়ে উভয়ের কত অন্তর, তাঁহারা অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারিবেন; এবং, সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকট কালিদাস ও অভিজ্ঞানশকুন্তলের এই রূপে পরিচয় দিলাম বলিয়া, মনে মনে, কত শত বার, আমায় তিরস্কার করিবেন। বস্তুতঃ, বাঙ্গালায় এই উপাখ্যানের সঙ্কলন করিয়া, আমি কালিদাসের ও অভিজ্ঞানশকুন্তলের অবমাননা করিয়াছি। পাঠকবর্গ! বিনীত বচনে আমার প্রার্থনা এই, আপনারা যেন, এই শকুন্তলা দেখিয়া, কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলের উৎকর্ষ পরীক্ষা না করেন।''*

বিদ্যাসাগরের এই জবাবদিহি বস্তুতপক্ষে বৈষ্ণবোচিত বিনয় নয়, কারণ সত্যি সত্যি তিনি এর মূল কাহিনির ও চরিত্রগুলির যথেচ্ছ পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, যার কারণ প্রধানত তাঁর ওপরে সমসাময়িক দেশ, কাল ও সর্বোপরি ভিক্টোরিয়ান নীতিবোধের প্রভাব। এই প্রবন্ধের পরিসরে কালিদাসের মূল নাটকের থেকে বিদ্যাসাগরকৃত পরিবর্তনের সবকটি খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখার সম্ভব নয়; তাই দৃষ্টি-আকর্ষণ করে এমন কতগুলি প্রধান পার্থক্যেরই উল্লেখ এই আলোচনায় করব।

প্রথমত, বঙ্গদেশীয় পাঠ অনুসরণ করায় বিদ্যাসাগরের *শকুন্তলা* কাহিনিতে এমন বেশ কিছু প্রসঙ্গ এসেছে যেগুলি আধুনিক গবেষক পণ্ডিতদের মতে মূল গ্রন্থের অন্তর্গত নয়, যেহেতু কাহিনির যৌক্তিক পারম্পর্য, চরিত্রগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা এবং কালিদাসের রচনাশৈলি ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সেগুলি খাপ খায় না। তাছাড়া, *অভিজ্ঞানশকুন্তল*-এর কেবল বঙ্গদেশীয় পাঠেই সেগুলির উল্লেখ আছে, অন্যান্য পাঠে নেই। যেমন, নাটকের প্রথম অঙ্কে রাজার সঙ্গে শকুন্তলার প্রথম সাক্ষাৎকারের মুহূর্তটি এই পাঠে যথেষ্ট স্থূলভাবে পরিবেশিত, শকুন্তলার প্রগল্‌ভতা এবং রাজার প্রতি তার আকর্ষণ তার আচরণে এত বেশি উচ্চকিত যে কালিদাস-বিশেষজ্ঞদের মতে তা নাটকের মূল পাঠের অন্তর্গত হতে পারেনা; শকুন্তলা কালিদাসের মানসপ্রতিমা, পুরো নাটকের বিভিন্ন প্রসঙ্গে তার সারল্য, সৌন্দর্য এবং সুরুচিপূর্ণ ব্যবহারের বর্ণনায় এমন এক অকপট মাধুর্যময় ঋজুতার পরিচয় কালিদাস দিয়েছেন যা বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা-চরিত্রে পাওয়া যায় না, কারণ তা বঙ্গদেশীয় পাঠ অনুসরণে রচিত। বুদ্ধদেব বসু সম্ভবত *শকুন্তলা*-র এই পাঠটিই পড়েছিলেন, যে-কারণে সেখানে শকুন্তলার প্রেমের 'কামপিচ্ছিল' বর্ণনা তাঁকে এই নাটকটির প্রতিই বিকৃষ্ট করেছিল (দ্র. *কালিদাসের মেঘদূত*, ভূমিকা)

দ্বিতীয়, কালিদাস তাঁর নাটকটির কথাবস্তু সংগ্রহ করেছিলেন প্রধানত *মহাভারত*-এর আদিপর্বে বর্ণিত দুষ্যন্ত-শকুন্তলার উপাখ্যানটি থেকে। সেখানে শকুন্তলা *মহাভারত*-এর বেশিরভাগ নারীচরিত্রগুলির মতোই স্পষ্টবাদিনী এবং তিনি লজ্জাবনতাও নন। সেখানে দুষ্যন্ত নির্জন আশ্রমে একা একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখে কামার্ত হন এবং তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে গান্ধর্ববিবাহে সম্মত করান, যে বিয়েতে কোনও সাক্ষীর প্রয়োজন থাকেনা। মেয়েটিকে ভোগ করে ফিরে যান রাজা দুষ্যন্ত। শকুন্তলার পালক পিতা কণ্ব এ বিয়ে মেনেও নেন। অন্তঃসত্ত্বা শকুন্তলা কণ্বের আশ্রমেই প্রসব করেন একটি পুত্র। ছেলের ছয় বছর বয়স হতে কণ্ব ছেলেসমেত শকুন্তলাকে পাঠিয়ে দেন রাজধনীতে দুষ্যন্তের কাছে একা। রাজসভায় উপস্থিত সপুত্র শকুন্তলাকে দেখে, তাকে চিনতে পেরেও, রাজা তা প্রকাশ করেন না এবং শকুন্তলাকে তাঁর স্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতিও দিতে চান না, পাছে তাঁর কামুক স্বভাব প্রজাদের কাছে ফাঁস হয়ে যায়। তখন শকুন্তলা উগ্রমূর্তি ধারণ

করেন এবং রাজার সঙ্গে রীতিমত বচসা করে নিজের ও ছেলের প্রাপ্য অধিকার আদায় করতে সচেষ্ট হন, এ বিবাদের নিষ্পত্তি ঘটে এক দৈববাণীতে, যেখানে ঘোষিত হয় শকুন্তলা দুষ্যন্তেরই বিবাহিত স্ত্রী এবং পুত্রটিও তাঁরই ঔরসজাত, কাজেই দুষ্যন্ত যেন ধর্ম-অনুযায়ী স্ত্রী-পুত্রকে স্বীকৃতি দেন। রাজা তখন মেনে নেন লোকনিন্দার ভয়েই তিনি চিনতে পেরেও প্রথমে শকুন্তলাকে স্বীকার করতে চাননি।

মহাভারত-এর দুষ্যন্তের এই নিন্দনীয় চরিত্র আড়াল করতে কালিদাস তাঁর নাটকে দুর্বাসামুনির অভিশাপ বৃত্তান্ত এনেছেন, যা একান্তই কালিদাসের কল্পনা। এই অভিশাপের ফলেই রাজার স্মৃতিবিভ্রম ঘটেছিল আর তাই রাজা শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যন করেছিলেন এ তত্ত্বের অবতারণা করে কালিদাস তাঁর নাটকের নায়ককে ধর্মপত্নী-পরিত্যাগের মতো ভয়ানক কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করেন। কালিদাসের সময়ে সংস্কৃত নাটকের বিধি অনুযায়ী নায়ককে হতে হত ধীর ও উদার চরিত্রের *(ধীরোদাত্তঃ), মহাভারত*-কথিত দুষ্যন্তের অনুদার চরিত্রে উদারতা স্থাপনের জন্যেই কালিদাস তাঁর নাটকে দুর্বাসার শাপের আড়াল নিয়েছেন। কিন্তু অসাধারণ সাহিত্যিক কালিদাস দুষ্যন্তের চরিত্রের মৌলিক দুর্বলতা তাঁর নাটকের ভাঁজে ভাঁজে প্রকাশ করে দিয়েছেন; সরাসরি তাঁর নারীলোলুপ কামুক চরিত্রের উল্লেখ না করেও নানা সাহিত্যিক কালিদাস দুষ্যন্তের চরিত্রের মৌলিক দুর্বলতা তাঁর নাটকের ভাঁজে ভাঁজে প্রকাশ করে দিয়েছেন; সরাসরি তাঁর নারীলোলুপ কামুক চরিত্রের উল্লেখ না করেও নানা সাহিত্যিক ইঙ্গিতে এবং দু-একটি ঘটনাপ্রসঙ্গে রাজার ভ্রমরের মতো ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ানোর অভ্যেসের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। রাজার চরিত্রের এই দিকটিকে সবথেকে স্পষ্টভাবে কালিদাস উন্মোচিত করেছেন তাঁর নাটকের পঞ্চম অঙ্কের শুরুতে রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুর থেকে ভেসে আসা হংসপদিকা নামে একটি মেয়ের গানের মধ্যে দিয়ে, সে এককালে রাজার প্রেমিকা ছিল। নাটকের পঞ্চম অঙ্কের শুরুতেই এই গানে প্রতীকী ভাষায় সে অনুযোগ করছে ''হে মধুকর, তুমি যে-আমারে মঞ্জরীকে অমনভাবে চুম্বন করেছিলে এখন পদ্মে বসামাত্রই তাকে ভুলে গেলে কি করে!" এই গান শুনে সস্মিত দুষ্যন্ত একটি এমন নির্দয় উক্তি করেন যে একলহমায় স্পষ্ট হয়ে যায় তাঁর চরিত্রের লম্পট দিকটি,

হংসপদিকা সম্পর্কে তিনি বলেন *"সকৃৎকৃতপ্রণয়ো 'য়ং জনঃ''* মানে ''এর সঙ্গে একবার প্রেম করেছিলাম বটে''! দুর্বাসার শাপের শাক দিয়ে ঢেকে রাখা রাজার চরিত্রে আঁশটে গন্ধের মাছ অন্তত একবারের জন্যে হলেও স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছিলেন কালিদাস।

কিন্তু, বিদ্যাসাগরের *শকুন্তলা* রচনার সময়কাল মহাভারত তো বটেই, কালিদাসের যুগের থেকেও অনেক পরের। ততদিনে ভিক্টোরীয় নৈতিকতা প্রভাবিত করেছে ভারতীয় জনমানসকে, বিশেষ করে বিদ্যাসাগরের মতো মানবিকতাসম্পন্ন মনীষীকে, তিনি তাঁর রচনায় নায়কের বহুগামিতার উল্লেখ পর্যন্ত রাখতে চাননি, ফলে হংসপদিকার গানের উল্লেখ করলেও মেয়েটির পরিচয় দিয়েছেন রাজভবনের এক পরিচারিকা বলে, যার ফলে তাঁকে আর নায়কের মুখে বসাতে হয়নি ''এর সঙ্গে একবার প্রেম করেছিলাম বটে''-এর মতো নির্দয় উক্তি। এটা করতে গিয়ে নাটকের seqential যুক্তি-পরম্পরা ব্যাহত হয়ে পড়ে, ফলত মূল নাটকে রাজা বিদূষক মাধব্যকে যে-কারণে হংসপদিকার মান ভাঙাতে পাঠিয়েছিলেন, সেই ঘটনাটি বাদ পড়ে যায় বিদ্যাসাগরের বলা বৃত্তান্তটিতে; এর পরিণতিতে বিদ্যাসাগরের *শকুন্তলা* কাহিনিতে হংসপদিকার গানের ঠিক পরেই যখন তপোবন থেকে শকুন্তলাকে নিয়ে কণ্বের প্রতিনিধিরা রাজার কাছে হাজির হন আর দুর্বাসার শাপের ফলে স্মৃতিভ্রম ঘটায় তাকে চিনতে পারেননা দুষ্যন্ত, তখন সেইখানে রাজার পাশে মাধব্যের অনুপস্থিতির কোনও উল্লেখ থাকেনা। কিন্তু বিদ্যাসাগরের *শকুন্তলা*-তেই অভিজ্ঞান আংটি দেখে স্মৃতি ফিরে পেয়ে রাজা যখন শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে আত্মবিলাপ করছেন, তখন মাধব্য বলছেন 'আমি প্রত্যাখ্যানকালে সেখানে ছিলাম না' — ঘটনা-পরম্পরার এই অসঙ্গতিটি দুর্ভাগ্যবশত বিদ্যাসাগরের নজর এড়িয়ে গেছিল।

মহাভারতের তেজস্বিনী শকুন্তলার তুলনায় তার অন্তত পাঁচশ' বছর বাদের লেখক কালিদাসের শকুন্তলা অনেক কোমল, অসহায় ও সরলমতি। কিন্তু বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা চরিত্র তার থেকেও বেশি সহনশীল, সে রাজার প্রত্যাখ্যানকে নিজের দুর্ভাগ্য বলে মেনে নেয়। শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করার পরে রাজা যে সত্যিই অনুতপ্ত তা জানার জন্যে কালিদাস শকুন্তলা অপ্সরা সখী সানুমতীকে

পাঠিয়েছিলেন আড়াল থেকে রাজার অনুতাপ স্বচক্ষে দেখে আসতে। রাজা যে অনুতপ্ত সে-কথা আগে থেকেই জানতে পেরেছিলেন বলে কালিদাসের শকুন্তলা তাঁকে ক্ষমা করতে পেরেছিলেন, নিজের আত্মাভিমান সম্পূর্ণ বিসর্জন না দিয়েও। কিন্তু, বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা অত অভিমানী নন, রাজার অনুতাপ হয়েছিল কিনা সে-বিষয়ে তাঁর জানার দরকার পড়েনা, তাই সেখানে বাদ যায় অপ্সরা সানুমতীর চরিত্র এবং অনেক সহজেই অভিমান ভুলে শকুন্তলা শ্বশুরবাড়ি ফিরে আসতে রাজি হন তাঁর চরম অপমানকারী বিশ্বাসঘাতক স্বামীটির সঙ্গে; রাজাকে আলাদা করে নিজের প্রেমের প্রমাণ দিতে হয়না শকুন্তলার কাছে। বিদ্যাসাগরমশাইয়ের শকুন্তলা এরকম আত্মমর্যাদা-জ্ঞানহীন কেন? নাকি তাঁর তাড়া ছিল এই বিশাল নাটকটিকে দ্রুত শেষ করার?

কালানুক্রমিক বিচারে বিদ্যাসাগরের *সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব* (প্রকাশ ১৮৫৫ খ্রি.) হল *শকুন্তলা*-র পরে তাঁর বাংলা ভাষায় সংস্কৃত সাহিত্যকে পরিচিত করানোর দ্বিতীয় প্রয়াস। ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা যখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল সে-সময় কলকাতার বিটন সোসাইটিতে পাঠ করেন এই রচনাটি। এইটিই ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় বাংলাভাষায় লিখিত সর্বপ্রথম সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস হিসেবে। যদিও তারও বেশ কয়েক বছর আগে (১৮৪৮ খ্রি.) বেরিয়েছে বিদ্যাসাগর প্রণীত *বেতালপঞ্চবিংশতি*-র বাংলা অনুবাদ, কিন্তু যেহেতু সেটি মূল সংস্কৃত থেকে নয়, বরং হিন্দী *বেতালপৈচিসী*-র থেকে অনুবাদ করেছিলেন বিদ্যাসাগর, তাই এই গ্রন্থটিকে আমাদের বর্তমান আলোচনা পরিসর থেকে বাদ রাখছি

সে-অর্থে সংস্কৃত থেকে বাংলায় বিদ্যাসাগরের করা সরাসরি গদ্য অনুবাদ হল *মহাভারতের উপক্রমণিকা* (১৮৫৮ খ্রি.)। কিন্তু, বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করার পরিকল্পনা বাদ দেন যখন ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দেই কালীপ্রসন্ন সিংহ এই অনুবাদকর্মে হাত দেন ও সে-কাজ সম্পূর্ণ করেন ১৮৬৬ সালে। কালীপ্রসন্নের এই অনুবাদটি ১৭ খণ্ডে প্রকাশিত হয়, তিনি *মহাভারত*-এর পরিশিষ্ট *হরিবংশ* অনুবাদ করেননি, এটি পরবর্তী সংযোজন বলে। কালীপ্রসন্ন তাঁর *মহাভারত* অনুবাদের ভূমিকায় জানাচ্ছেন যে তাঁর এই অনুবাদ কর্মে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন পণ্ডিত

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের *মহাভারত উপক্রমণিকা* প্রকাশিত হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজের *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকায় ১৮৫৮ সালে, এটি ছিল *মহাভারত*-এর আদিপর্বের অনুবাদ। কিন্তু কালীপ্রসন্নের অনুবাদ-যজ্ঞের কথা শুনে বিদ্যাসাগর আর নিজের কাজটি অগ্রসর করেননি, বরং নিরন্তর উৎসাহ জুগিয়ে গেছেন কালীপ্রসন্নের অনুবাদকর্মকে। বিদ্যাসাগর কেবল কালীপ্রসন্নের অনুবাদটি পড়েই ক্ষান্ত থাকেননি, তিনি কালীপ্রসন্নের অনুপস্থিতিতে এটির ছাপার কাজ ও অনুবাদ কর্মেরও দেখাশোনা করতেন বলে কালীপ্রসন্ন জানিয়েছেন।

১৮৫৯ সালে বিদ্যাসাগর প্রকাশিত করেন তাঁর লেখা *সীতার বনবাস* গ্রন্থ। এটি সংস্কৃত সাহিত্যকে বাঙালির কাছে পরিচিত করানোর জন্যে বিদ্যাসাগরের আরেকটি প্রয়াস। এটি কোনও একক গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত নয়, বরং একটি ঘটনা বিষয়ে একাধিক বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থের সন্নিবেশ করে বিদ্যাসাগর এই বইটি লেখেন। আটটি পরিচ্ছেদ সংবলিত এই গ্রন্থটির প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অধিকাংশ বিখ্যাত সংস্কৃত নাট্যকার ভবভূতিপ্রণীত *উত্তরচরিত* নাটকের প্রথম অঙ্ক থেকে গৃহীত। বাকি ছ'টি পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু নানা উৎস থেকে নেওয়া, তাদের মধ্যে প্রধান হল বাল্মীকি *রামায়ণ*-এর উত্তরকাণ্ড। এই গ্রন্থের ভূমিকা বা বিজ্ঞাপনেও বিদ্যাসাগর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় জানিয়েছেন —

> *"ঈদৃশ করুণরসোদ্বোধক বিষয় যে রূপে সঙ্কলিত হওয়া উচিত, এই পুস্তকে সেরূপ হওয়া সম্ভাবনীয় নহে; সুতরাং, সহৃদয় লোকে পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিবেন, এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারি না।"*

তবু বিদ্যাসাগরের এই লেখাটির জনপ্রিয়তা ও আকর্ষকত্ব তাঁর অনেক পরের সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *পথের পাঁচালী*-তে অপুর প্রথম দিনের পাঠশালার অভিজ্ঞতার স্মৃতিতে অমর করে রেখে গেছেন...

'Renaissance man'-এর সন্ধানে ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-রামজয় তর্কভূষণ সংবাদ

সৌমেন মুখার্জি

প্রাক-কথন ঃ ''একটি এঁড়ে বাছুর হইয়াছে''[১]

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর চরিত (স্বচরিত)' একান্তই ''সংক্ষিপ্ত'', এমনকি ''অসমাপ্ত'', যা একাধিক পণ্ডিত লক্ষ্য করেছেন।[২] সম্ভবত এই ''সংক্ষিপ্ত'' ও ''অসমাপ্ত'' বৈশিষ্ট্যই হয়ে উঠেছে বিদ্যাসাগর চর্চা-এর ক্ষেত্রে তাঁর আত্মচরিত-এর এক তুলনামূলক সীমিত পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকার কারন।[৩] 'বিদ্যাসাগর চরিত (স্বচরিত)' সম্বন্ধে এই কথাটি অযৌক্তিক নয়। যদিও আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে সংক্ষিপ্ত কিম্বা অসমাপ্ত এই বিশেষণ দুইটির কোনটাই গুরুত্বহীনতার পরিচায়ক নয়। এইটিই হবে আমাদের এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের মূল সূত্র। বর্তমান আলোচনা 'বিদ্যাসাগর চরিত (স্বচরিত)'-এর গুরুত্বের প্রাথমিক অনুসন্ধানের এক প্রয়াস। এই প্রবন্ধ কোনও চমকপ্রদ নতুন তথ্য আবিষ্কারের দাবী রাখে না, এমনকি এক বহুলচর্চিত বিষয় সমকালীন বাঙ্গালী সমাজে বিদ্যাসাগরের ভূমিকার কোনও পুনর্মূল্যায়ণ এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় নয়।[৪] আত্মচরিত পাঠ-এর

১। উক্তিটি বিদ্যাসাগর-পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের। প্রেক্ষিত বিদ্যাসাগর-এর জন্ম। 'বিদ্যাসাগর চরিত (স্বচরিত)', *বিদ্যাসাগর রচনাবলী* (কলকাতা ঃ কামিনী, ১৯৯৯/২০০০ অখণ্ড সংস্করণ), ৩২৫।

২। দ্রঃ যথা গৌতম চট্টোপাধ্যায়, 'বিদ্যাসাগর ও বাংলার নবজাগরণ', *প্রয়াণের শতবর্ষে বিদ্যাসাগর* (নতুন দিল্লী ঃ সাহিত্য আকাদেমী, ২০১৮ সং [১৯৯৩], ৬৬।

৩। ইদানিং কালের উল্লেখযোগ্য এক ব্যাতিক্রম-এর জন্য দেখুন ঃ Brian Hatcher, *Vidyasagar : The Life and After-Life of an Eminent Indian* (London, New York & New Delhi : Routledge, 2014)। বিশেষ দ্রঃ ৩য় অধ্যায়।

৪। বিদ্যাসাগর ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ নিয়ে সুবৃহৎ তথ্যসূত্রের শুধুমাত্র নামোল্লেখ করে পাদটীকার কলেবর বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। যা বর্তমান আলোচনায় ব্যবহার করা হয়েছে কেবলমাত্র সেই তথ্যসূত্রের উল্লেখ এখানে পাওয়া যাবে। বিদ্যাসাগর-চর্চার দুই-একটি মূল ধারার কথা যদিও এই ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, *বিদ্যাসাগর ঃ নানা প্রসঙ্গ* (কলকাতা ঃ চিরায়ত, ২০১৯ সং [২০১১]), ১১-২২ যথার্থই বলেছেন যে কখনও মনীষীদের চরিত্র-পূজো হয় মূর্তি-পূজোর হাত ধরে, আবার কখনও বা বিগ্রহ গড়ার জায়গা নেয় বিগ্রহ-ভাঙ্গা। এই দুইটি প্রক্রিয়াই ইতিহাসবোধ ও বৈশ্লেষিক মননশীল চিন্তার পরিপন্থী।

ব্যাকরণ আমাদের এই অনুসন্ধানে বিশেষভাবে সাহায্য করবে। দুই-একটি কথা এই প্রারম্ভিক পর্বে সেরে রাখা প্রাসঙ্গিক হবে।

প্রথমত-এই আত্মচরিত-এর ঠিক কতটা *আত্ম*-কথা? এইটি ভেবে দেখবার প্রয়োজন ও অবকাশ দুই-ই রয়েছে। রচনাটির বিন্যাস দুইটি পর্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাতে মূলত রয়েছে ওঁর পারিবারিক অবস্থা ও অবস্থান, দুঃখ, দৈন্য, সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত, সম্পর্কের জটিলতা ও পরশ্রীকাতরতার এক বিবরণ। এই বৃত্তান্তের নট-নটি ওঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দ। পণ্ডিতেরা বিদ্যাসাগরের এই ঘাত-প্রতিঘাতলব্ধ অভিজ্ঞতার দিকে, পরিবারের চলমানতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[৫]

দ্বিতীয়ত-রচনাটির এই অসমাপ্ততা আমাদের ভাবায় বিদ্যাসাগর স্বয়ম কি চিত্রপট পরিকল্পনা করেছিলেন, তা তলিয়ে দেখার। পাঠিকা/পাঠক আজ হাতে যা পেলেন, তা সেই মূল পরিকল্পনার উপক্রমণিকা মাত্র। সুতরাং লেখকের পরিকল্পনা ও পাঠিকা/পাঠকের সামনে উপস্থাপিত চিত্র নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা একান্ত প্রয়োজন, যদিও তা সহজ নয়, কেউ বা বলবেন, আদৌ সম্ভব নয়।[৬] কিন্তু এই খণ্ডিত চিত্রটি যে কেবলমাত্র ভাবীকালের বিদ্যাসাগর ও সেদিনের শৈশবের ''এঁড়ে বাছুর''-এর জীবন-চিত্র নয় তা মনে করার যথেষ্ট কারন উপস্থিত। বরং বলা ভাল এইটি — একান্তই এই খন্ডিত, সংক্ষিপ্ত, অসমাপ্ত রচনাটি যা আজকের

আবার কখনও বা দেখা যায় পরিবেশিত তথ্যে ভ্রান্তি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ১৮৯৫-এ প্রকাশিত জীবনী চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের *বিদ্যাসাগর*-এর কথা, যার সার্বিক মূল্য অনস্বীকার্য হলেও তথ্য-প্রমাদ বর্জিত নয়। বিদ্যাসাগর-অনুজ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের *ভ্রমনিরাস* এই ভ্রান্তি নিরসন ও সংশোধনের প্রয়াস।

৫। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের জন্য দ্র ঃ J. H. Broomfield, *Elite Conflict in Plural Society: 'Twentieth-Century Bengal* (Bombay: Oxford University Press, 1968), 11: "The interchange between urban and rural bhadralok society...". Sumit Sarkar, 'Vidyasagar and Brahmanical Society' in S. Sarkar, *Writing Social History* (New Delhi: Oxford Unversity Press, 2013 [1997]), 222-224 দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতা ও শহরতলিতে পণ্ডিত-বসতির দিকে। Hatcher, *Vidyasagar,* ৩-য় অধ্যয়ে ('Man in motion') 'বিদ্যাসাগর চরিত (স্বচরিত)'-টি দেখেছেন 'a text in motion' বলে, যার মূল আলোচ্য বিদ্যাসাগর নিজে নন, ওনার পরিবারবর্গ; দ্রঃ তদেব ৬০।

৬। Jacques Derrida, *Of Grammatology* (trans. Gayatri Chakravorty Spivak) (Baltimore: Johns Hopkings University Press, 1976) প্রমুখ এই মতের এক প্রধান প্রবক্তা। Quentin Skinner, 'Interpretation and the Understanding of Speech Acts', *Visions of Politics, Vol. I* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009 [2002]), 104-106, অপরপক্ষে বক্তা/লেখিকা/লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে যেকোনো উক্তি/রচনা (illocutionary) এবং শ্রোতার দৃষ্টিকোণ থেকে তার ফলশ্রুতির দিকে (perlocutionary) দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

পাঠিকা/পাঠক উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন — বিদ্যাসাগরের একরকম জীবন তথা চরিত্র-গঠনের উপাদানের অন্বেষণ। রচনাটির গুরুত্বও সেইখানে।

চরিত-পাঠের ব্যাকরণ ঃ বিদ্যাসাগরের 'renaissance man'

লেখিকা/লেখক কি চিন্তা করে লেখেন ও পাঠিকা/পাঠক সেই রচনায় কি খোঁজেন এর দ্বন্দ্ব থেকেই যায়। বর্তমান আলোচ্য রচনাটির অসমাপ্ততার কারনে এই দ্বন্দ্ব বরং অধিকতর হয়ে ওঠে। আমাদের আলোচনা এই দ্বন্দ্বর সমাধানের কোন অতি সরলীকরণের প্রচেষ্টা নয়। আমাদের আলোচনার মূল বিষয় বিদ্যাসাগরের ''সংক্ষিপ্ত'' ও ''অসমাপ্ত'' এই রচনায়, বা বলা ভাল উপক্রমণিকায়, বিদ্যাসাগর-মানসের অনুসন্ধান। আধুনিক যুগের গোড়ার পর্বের অন্যতম আত্মকথা, শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত', প্রসঙ্গে সুদীপ্ত কবিরাজ যথার্থই বলেছেন যে 'চরিত' শব্দটি একাধারে চরিত্র তথা জীবনের ঘটনাবলী ও চরিত্র-চিত্র অঙ্কনের মধ্যকার দ্বন্দ্বর দ্যোতক।[৭] এই ঘটনাবলী রমন্থন ও চরিত্রের আলেখ্য অঙ্কনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে উঠে আসে বিদ্যাসাগরের চোখ দিয়ে দেখা এক সমাজ-চিত্র, বা বলা ভাল বিদ্যাসাগরের নিজের হাতে প্রস্তুত টীকা। পাশাপাশি দেখা প্রয়োজন, এই রমন্থন ও চরিত্রের আলেখ্য অঙ্কনের মধ্যে কি স্থান পেল বা পেল না।

এই দুই-একটি কথা মাথায় রেখে এগোলে দেখা যায় যে বিদ্যাসাগরের চরিতকথার এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা জুড়ে রয়েছে তৎকালীন পণ্ডিতসমাজের এক চিত্র ও সেই প্রেক্ষাপটে ওঁর পিতামহর জীবনালেখ্য। বিদ্যাসাগরের আখ্যানের বিশ্লেষণ করে একাধিক পণ্ডিত খুঁজে পেয়েছেন বিদ্যাসাগরের ওপর ওঁর পিতামহর ''প্রভাব'',[৮] কিম্বা বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিকোণ থেকে পিতামহ-পৌত্রর এক গভীর যোগসূত্রের সন্ধানের প্রচেষ্টা।[৯] কিন্তু এই যোগসূত্রের সম্যক বিশ্লেষণের জন্য আমাদের ফিরে

৭। Sudipta Kaviraj, "The Invention of Private Life: A Reading of Sibnath Sastri's Autobiography" in David Arnold and Stuart Blackburn (eds), *Telling Lives in India: Biography, Autobiography, and Life History* (Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press), 85: "*Carita* contains the fertile ambiguity of reference to both the character displayed in the events of the life and a recounting of that story."

৮। গৌতম চট্টোপাধ্যায়, 'বিদ্যাসাগর ও বাংলার নবজাগরণ', ৬৭-৬৮।

৯। Hatcher, *Vidyasagar,* 70: "... a profound connection with his grandfather Ramjay."

যেতে হবে বিদ্যাসাগরের হাতে গড়া ওঁর পিতামহের চিত্রপটের কথায়, বিশেষত সমাজ ও চরিত্র-চিত্র অঙ্কনে ওঁর ব্যবহৃত বিশেষণের দিকে। অন্যভাবে বলা যায়, বিদ্যাসাগরের আখ্যানের রামজয় তর্কভূষণ একান্ত বিদ্যাসাগরের হাতে অঙ্কিত চিত্র, বিদ্যাসাগরের নিজের পছন্দের রঙে রঞ্জিত। এই চরিত্র বিদ্যাসাগরের একান্ত কাছের মানুষ — প্রতিবাদী, দৃঢ়, সংযত, নীতিজ্ঞ, অর্থাৎ সেইসব গুণাবলী যা বিদ্যাসাগর স্বয়ম একান্ত কাম্য বলে মনে করেছেন। মনে রাখা দরকার এই উন্নত চরিত্র-চর্চা উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ ও মানসজগতের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক।[১০] চারিত্রিক দৃঢ়তা, নৈতিকতা প্রভৃতি গুণাবলীর প্রতি বিদ্যাসাগরের স্বভাবত নিষ্ঠা বিদ্যাসাগরকে পিতামহের চরিত্র-রচনায় বিশেষভাবে উদ্যুক্ত করে, এমনকি এও বলা যায় যে চরিত্র-গঠনের আদর্শ পরাকাষ্ঠার সন্ধান বিদ্যাসাগর রামজয় তর্কভূষণের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন।

কিন্তু বহুলচর্চিত ঘটনাবলীর ক্ষেত্রেও স্থানবিশেষে দেখা যায় অন্যান্য লেখকের সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির সূক্ষ্ম তারতম্য। রামজয় তর্কভূষণ কোন কূপমণ্ডূক পণ্ডিত ছিলেন না। বিদ্যাসাগর লিখেছেনঃ ‘‘তিনি দ্বারকা, জ্বালামুখী, বদরিকাশ্রম পর্যন্ত পর্যটন করিয়াছিলেন’’।[১১] সুমিত সরকার দেখিয়েছেন এই তীর্থভ্রমণ কালে বিদ্যাসাগরের পিতামহীর দুর্দশা, স্বজনের বৈরিতার সম্মুখে জীবনসংগ্রামে ওঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা বিদ্যাসাগরের মানস-পটে গভীর দাগ রাখে।[১২] দেখা যাক এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর-অনুজ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন কি বলেন। রামজয় তর্কভূষণের বনমালীপুর প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেনঃ ‘‘এদিকে রামজয়, তীর্থস্থানে থাকিয়া স্বপ্ন দেখেন যে, তুমি পরিবারবর্গকে কষ্ট দিয়া তীর্থক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতেছ, ইহাই তোমার অধর্ম হইতেছে’’।[১৩] এর মধ্যে কি তোথাও রয়েছে বিদ্যাসাগরের থেকে কিছুটা আলাদা হয়ে পিতামহর ঔদাসীন্যর প্রতি এক প্রচ্ছন্ন সমালোচনা ? এই

১০। Kaviraj, ‘The Invention of Private Life’.

১১। ‘বিদ্যাসাগর চরিত (স্বচরিত)’, ৩৩৪।

১২। Sarkar, ‘Vidyasagar and Brahmanical Society’, 241: “Admiration for Ramjoy does not blind Vidyasagar to a realization that much of the price of his independence had to brone by grandmother Durgadevi”.

১৩। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, *বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাস* (কলকাতাঃ চিরায়ত, ১৯৯২ সং (১৮৯১ ও ১৮৯৫)), ৩। আমরা আরও দেখতে পাই যে উপক্রমণিকা তথা শৈশবের অংশগুলি বিদ্যাসাগরকে শোনানো হয় এবং বিদ্যাসাগর ‘‘রচনা উত্তম হইয়াছে’’ রায় দেন। তদেব, ১৮

প্রশ্নটি ভেবে দেখার অবকাশ আছে, যদিও বর্তমান নিবন্ধের সীমিত পরিসরে এর বেশি এগোনো সম্ভব নয় সঙ্গত কারনেই। কিন্তু শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের পিতামহ চরিতালেখ্য রচনা যদিও অন্য প্রসঙ্গ, সার্বিকভাবে দেখা যায় পিতামহচরিত রোমন্থনে দুই পৌত্রর মধ্যেকার সাযুজ্যঃ রামজয় তর্কভূষণ এঁদের দুইজনের কাছেই এক দৃঢ়চেতা, নির্ভীক, ন্যায়পরায়ণ পুরুষ। বিদ্যাসাগরের রামজয় তর্কভূষণ চারিত্রিক দৃঢ়তা ও নিরভিমান ব্যবহারের এক আদর্শ সমন্বয়। বিদ্যাসাগর অঙ্কিত স্বজনবর্গের বৈরিতা, পরশ্রীকাতরতা তৎকালীন সমাজের এক করুণ বিবরণ। বিদ্যাসাগরের পিতামহ তাঁর ''নিরতিশয় স্বার্থপর ও পরশ্রীকাতর'' তথা ''নির্বোধ'' শ্যালকের অজস্র আক্রমণ উপেক্ষা করে জীবননির্বাহ করেন নিজের আত্মসম্মান বজায় রেখে; বিদ্যাসাগরের কথায় — ''তর্কভূষণ মহাশয় নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন; কি ছোট কি, কি বড়, সর্ববিধ লোকের সহিত সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন''।[১৪] রামজয় তর্কভূষণের স্পষ্টবাদিতা এবং ক্রোধের সম্মুখীন হয়েও আত্মসংযম ক্ষমতা ছিল উল্লেখযোগ্য, যেমন ছিল তাঁর ভদ্রতাবোধ ও ভদ্রলোকচিত ব্যবহার সম্বন্ধে প্রগাঢ় মন্তব্য — ''তিনি যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান, ধনবান, ও ক্ষমতাসম্পন্ন হইলেও, তাঁহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না''।[১৫] বলা হয়ত ভুল হবেনা যে এর মধ্যে নিহিত রয়েছে বিদ্যাসাগরের মানবচরিত্র তথা তৎকালীন সমাজ সম্বন্ধে গভীর উপলব্ধি।

উপসংহার

বিদ্যাসাগরের রামজয় তর্কভূষণ সুদূরের লৌহ-পুরুষ নন, স্বাধীনচেতা, অনাসক্ত, ''তেজস্বী'' পুরুষ,[১৬] বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাসের ভাষায় ''সাক্ষাৎ ঋষি''।[১৭] সমসাময়িক ব্রাহ্মণ সমাজের ঘাত-প্রতিঘাত যদি বিদ্যাসাগরের এই রচনার বৃহৎ প্রেক্ষাপট হয়, পিতামহ রামজয়ের চরিত্রের সীমিতপরিসরের আলোচনার মাধ্যমে ঔচিত্যবোধ, নৈতিকতা ও এক উন্নত চরিত্রগঠনের আদর্শ সন্ধান এই রচনার অক্ষরেখা। অন্যভাবে বলা যায়, এইটি শুধুমাত্র পিতামহের সঙ্গে এক ''profound connection''-এর কথা নয়, বহুলাংশে এক আদর্শ চরিত্র-সন্ধান।

১৪। 'বিদ্যাসাগর চরিত (স্বচরিত)', ৩৩৪।

১৫। তদেব, ৩৩৪। তুলনীয় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৮২৩-এ রচনায় ''মধ্যবিত্ত লোক'' এবং ''দরিদ্র অথচ ভদ্রলোক''; দ্রঃ Sarkar, 'Vidyasagar and Brahmanical Society', ২২৭।

১৬। 'বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত)', ৩৩৩।

১৭। তদেব, ৩২৫।

শিক্ষাভাবনায় বিদ্যাসাগর

গোপা দত্তভৌমিক

১.

বালক ঈশ্বরচন্দ্র যখন ঠাকুরদাসের সঙ্গে কলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হলেন তখন শহরের বিদ্যাচর্চা দুই কূল ঘেঁষে চলছে এবং ধর্মান্তরণের ধুম পড়েছে। সে এক ঝড়ের সময়, প্রাচীনে নবীনে সংঘাত। সংস্কৃত কলেজের গায়েই ছিল হিন্দু কলেজ, সামাজিক ভূমিকম্পের এপিসেন্টার। ১৮২৯-১৮৪১ খ্রীস্টাব্দ মোট বারো বছর ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে পড়েছেন। তাঁর শিক্ষাভাবনা এই সময় থেকেই গড়ে উঠতে থাকে। রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল দুয়ের উচ্ছ্বাস ও আবেগের উদ্গিরণ দেখেই তিনি নিজের পথটি সন্ধান করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজে দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছেলেরা পড়ত। হিন্দু কলেজে পড়ত ধনী বাঙালি রাজা বেনিয়ান ব্যবসায়ীদের ছেলেরা। তাদের কুলকৌলান্য সকলের হয়ত ছিলনা কিন্তু কাঞ্চন কৌলীন্যের অভাব ছিলনা। দুই দলে চালচলন ও কথাবার্তায় পার্থক্য ও বিরোধ ছিল যথেষ্ট ফলে দুই কলেজের ছাত্রদের মধ্যে মনোমালিন্য এমনকি মারামারিও হত। হিন্দু কলেজের শিক্ষকরা সংস্কৃত কলেজের শিক্ষকদের অবজ্ঞার চোখে দেখতেন।

এদিকে ১৮২৯ সালেই সতীদাহপ্রথা রদ হচ্ছে। রামমোহন রায় একদিকে, রাধাকান্তদেব অন্যদিকে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা দুদলেই ছিলেন। তর্কবিতর্কে হাওয়া উত্তপ্ত। আর এই ক্রমান্বয় বিতর্কেই অপসারিত হচ্ছে মধ্যযুগীয় জড়তা। শহরে প্রচুর পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, আলোচনার জন্য সভা স্থাপিত হচ্ছে। বিনয় ঘোষ বিদ্যাসাগর সম্পর্কে লেখা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে একটি কথায় জোর দিয়েছেন, সমাজ শিক্ষা প্রভৃতি যে সব বিষয় নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় সংগ্রাম করেছেন তার সূচনা তাঁর মনে ছাত্রজীবনে ঈয়ংবেঙ্গলদের আন্দোলন, আলোচনা ও এই সবকিছুর রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল।

হুগলি নদীর দুই তীর ধরে বিদেশি বণিকদের কুঠিস্থাপন বাংলার সমাজে অষ্টাদশ শতক থেকেই একটা অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিবর্তনের ঢেউ এনেছিল। রাজনৈতিক পট ও বদলাল অচিরেই। ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড ক্রমে রাজদণ্ড রূপে দেখা দিল। ইংরেজি পড়ার ঝোঁক তখন বাড়ল জীবিকার প্রয়োজনে। নতুন গড়ে ওঠা বণিকের শহর কলকাতা তখন নানা ধরণের জীবিকার সন্ধান দিচ্ছে। মাসান্তে নির্দিষ্ট আয়ের বেতন পাওয়ার আশায় গ্রাম থেকে বহু মানুষ পাড়ি দিচ্ছেন সেখানে। ভবানীচরণের দেওয়া আখ্যা সার্থক করে কলকাতা যেন সত্যিই এক কমলালয়। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় চোদ্দ পনেরো বৎসর বয়সে কলকাতা এসেছিলেন উপার্জনের চেষ্টায়। বিদ্যাসাগর তাঁর অসমাপ্ত আত্মচরিতে নিজের বাবার জীবিকা অন্বেষণ ও তারজন্য ইংরেজি ভাষা শেখার ব্যাপারে অপূর্ব সাবলীল গদ্যে যা লিখেছেন, সেই ছবির বেদনাময় রেখার মধ্যেই যেন পুত্রের শিক্ষাভাবনার বীজ ডানা ঝাপটাচ্ছে। সংস্কৃত পড়ার তীব্র ইচ্ছা ছিল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশের সন্তান ঠাকুরদাসের। কিন্তু পরিস্থিতি অন্যরকম।

‘এই সময়ে মোটামুটি ইঙ্গরেজী জানিলে সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে, অনায়াসে কর্ম হইত। এজন্য সংস্কৃত না পড়িয়া, ইঙ্গরেজী পড়াই, তাঁহার পক্ষে পরামর্শসিদ্ধ স্থির হইল। কিন্তু সে সময়ে ইঙ্গরেজী পড়া সহজ ব্যাপার ছিল না। তখন, এখনকার মত, প্রতি পল্লীতে ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় ছিলনা। তাদৃশ বিদ্যালয় থাকিলেও তাঁহার ন্যায় নিরুপেয় দীন বালকের তথায় অধ্যয়নের সুবিধা ঘটিতনা।’

ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগেও এই দেশে দেশজ শিক্ষাব্যবস্থার একটি প্রাচীন ধারা অবশ্যই ছিল। প্রাথমিক স্তরে ছিল পাঠশালা ও মক্তব — অক্ষর পরিচয়, সাধারণ গণিত, চিঠিপত্র লেখা, ধর্মগ্রন্থ পাঠ এই ধরণের পাঠক্রম ছিল সেখানে। উচ্চশিক্ষায় ইচ্ছুকরা এরপর টোল চতুষ্পাঠী এবং মাদ্রাসায় পড়তে যেতেন। পাঠশালা মক্তব এবং টোল চতুষ্পাঠী, মাদ্রাসার মধ্যে ধারাবাহিক আন্তঃযোগাযোগ ছিলনা। এখনকার প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় — এই কাঠামোটি ক্রমে পাশ্চাত্যধারা অনুসরণেই গড়ে উঠল। দেশীয় কাঠামোতে মেয়েদের পড়াশোনা করার সুযোগ প্রায় ছিলনা বললেই চলে। মেয়েদের পড়াশোনা করা নিয়ে নানাবিধ কুসংস্কার ছিল, তাছাড়া অতি অল্পবয়সেই তাঁদের বিয়ে হয়ে যেত। হটী বিদ্যালঙ্কাররা নেহাতই ব্যতিক্রম ছিলেন। তবে ধনী

জমিদার বাড়িতে মেয়েদের কিছুটা লেখাপড়া শেখানোর চল ছিল হঠাৎ বাড়ির কর্তার মৃত্যু বা অসুস্থতা ঘটলে যাতে সম্পতি রক্ষা করতে তাঁরা সমর্থ হন।

উনিশ শতকের প্রথম তিন চারটি দশক ইংরেজ শিক্ষাবিদদের মধ্যে প্রাচ্যবিদ্যাপন্থী ও পাশচাত্যবিদ্যাপন্থীদের ধারাবাহিক বিতর্ক চলছিল। প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার দুটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তিনি পড়াশোনা করেছেন সংস্কৃত কলেজে। চাকরি করেছেন ফোর্ট উইলিয়াম ও সংস্কৃত কলেজে। রঞ্জন চক্রবর্তী ও শিবাজীপ্রতিম বসু জানাচ্ছেন, প্রাচ্যপন্থী হোরেস উইলসন ও এইচ.টি. প্রিন্সেপ মনে করতেন ভারতীয় সংস্কৃতির মূলোৎপাটন করে সম্পূর্ণ বিদেশি ভাষায় শিক্ষাদান যেমনটি চলছিল হিন্দু কলেজে তা আকাঙ্ক্ষিত ও প্রয়োজনীয় নয়। দরকার হল দেশজ শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষাপ্রণালীর ধীরে ধীরে মিশ্রণ ঘটিয়ে পশ্চিমী জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো।

‘উইলসন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মতোই, ১৮২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজে, এই দ্বৈত পদ্ধতির (দেশজ/ভারতীয় ভাষা ও ইংরেজি ভাষা) শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেন। এই দ্বৈতপদ্ধতি ছিল পাশচাত্যপন্থীদের চক্ষুশূল। ফলে তাঁরা (মূলত বেন্টিঙ্ক, ট্রেভেলিয়ান প্রমুখ) চেয়েছিলেন প্রাচ্যপন্থীদের আখড়া ফোর্ট উইলিয়ম ও সংস্কৃত ; এই দুটি কলেজকেই বন্ধ করে দিতে। এ নিয়ে তাঁদের সঙ্গে প্রাচ্যপন্থীদের তুমুল বিরোধ কলকাতার সেই সময়কার শিক্ষা ও প্রশাসনিক জগতকে প্রবল ভাবে আলোড়িত করেছিল। বিতর্কের এই আবহেই বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন ও বারোবছর অতিবাহিত করেন। এই বিতর্কের দৃঢ় প্রভাব তাঁর শিক্ষা ভাবনায়ও পড়েছিল।

গ্রাম থেকে আসা ঐতিহ্যপন্থী ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলেটি দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে বিদ্যার্জনের পথে চলতে চলতে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করতেন উন্মার্গগামিতার পাশাপাশি ইয়ংবেঙ্গলদের যুক্তিবাদী মনোভাব, কুসংস্কার বিরোধিতা। বীরসিংহের প্রখর মেধাবী বালকটিকে নানা ভাবনার স্রোত ও প্রতিস্রোতের মনোযোগী পর্যবেক্ষক ও পরে স্বতন্ত্র ভাবনা ও কর্মোদ্যোগে প্রদীপ্ত মানুষরূপে গড়ে তুলেছিল বহুলাংশেই উনিশ শতকের কলকাতা। দুটি বিরোধী ভাবধারার সমন্বয় ঘটিয়ে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থার রূপায়ণের তাঁকে উৎসুক করেছিল। এইসূত্রে তাঁর চাকুরিজীবনের দিকে আমরা একটু তাকিয়ে নিতে পারি।

১৮৪১-৪৬ খ্রী. ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেডপণ্ডিত

১৮৪৬-৪৭ খ্রী. সংস্কৃত কলেজে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি

১৮৪৯-৫০ খ্রী. ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেড রাইটার কোষাধ্যক্ষ

১৮৫০-৫৮ খ্রী. সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরির আবেদন করার সময় তাঁর ইংরেজিজ্ঞানকে প্রসারিত করতে বলেছিলেন তাঁর গুণগ্রাহী কলেজ সেক্রেটারি ক্যাপ্টেন জি.টি মার্শাল। বিদ্যাসাগর ইংরেজি ও হিন্দি গভীর মনোযোগে ভালোভাবে শিখতে শুরু করেন। তাঁর অনুবাদগ্রন্থাদি এবং প্রাঞ্জল স্বচ্ছ সাবলীল ইংরেজি ভাষায় লেখা তাঁর চিঠিপত্র ও নথিসমূহ দুটি ভাষাই তিনি কী অসাধারণ ভাবে আয়ত্ত করেছিলেন তার প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত আছে। জ্ঞানচর্চার দশদিগন্ত দেশের সাধারণ মানুষের কাছে উন্মোচিত হোক এটি তাঁর প্রথমাবধি স্বপ্ন ছিল। নিজে একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিতকে মাসে দশটাকা বেতন দিয়ে হিন্দি শিখতেন। ইংরেজি পড়তেন বন্ধু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরে নীলমাধব মুখোপাধ্যায় ও রাজনারায়ণ গুপ্ত — এই ছাত্রদের কাছে।

এই সময় থেকেই তিনি সংস্কৃতভাষা ও তার ব্যাকরণ নতুন ও সহজতর প্রণালীতে শেখাতে শুরু করেন। বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো বহুছাত্র তাঁর কাছে পড়তে আসতেন। এঁদের পড়াবার জন্য তিনি নতুন ভাবে ব্যাকরণ লিখতে শুরু করেন। উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণ কৌমুদীর এইভাবে সূত্রপাত। বৌবাজারে তাঁর হিদারাম ব্যানার্জি লেনের বাসাবাড়ির বৈঠকখানা একটি ছোটোখাটো বিদ্যায়তন হয়ে উঠেছিল। তখন কলকাতার ধনীসমাজে বাবুদের মধ্যে বিলাসবৈভব কুরুচির অন্ত নেই। তারই মধ্যে শিক্ষার দীপ জ্বালানোতে তিনি ব্রতী হলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সাহেব সিভিলিয়ান ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্যপূর্ণ বন্ধুতা ছিল। নানা বিষয় নিয়ে তাঁদের আলোচনা হত। তাঁর পাণ্ডিত্য ও উদারতায় বিদেশি ছাত্ররা মুগ্ধ ছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবিদ্যার আদানপ্রদানে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে পূব-পশ্চিমের ভাবসংযোগ গড়ে উঠত।

১৮৪৬ সালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হলেন। শিক্ষা কাউন্সিলের সেক্রেটারি ময়েট সাহেব বিদ্যাসাগরকেই চেয়েছিলেন।

আবেদনপত্রে বিদ্যাসাগর প্রথম তাঁর শিক্ষাভাবনা লিপিবদ্ধ করেন। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাপ্রণালী সংস্কার করতে চেয়েছিলেন তিনি। তাঁর Alma mater - কাজেই ভালোই জানা ছিল কী কী প্রয়োজন এই প্রতিষ্ঠানের। পরে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপনার পদ পেয়েও লেননি তিনি। ঐ কলেজের শিক্ষা প্রশাসনেই থাকতে চেয়েছেন। বোঝা যায় তিনি তাঁর নতুন ভাবনা প্রয়োগ করতে চান। কিন্তু একবছর তিনমাস কাজ করে কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্তের তীব্র অসহযোগিতায় চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন বিদ্যাসাগর। রসময় দত্তকে তিনি যে চিঠি লেখেন তা তাঁর শিক্ষাভাবনার অমূল্য দলিল হয়ে রয়েছে।

'I have carefully studied the working of the system, and the suggestion made are brought forward with the view of facilitating the acquirement of the largest store of sound Sanskrit and English learning combined, under the impression that such a training is likely to produce men who will be highly useful in the work of imbuing our Vernacular dialects with the science and civilization of the Western World.'

ধ্রুপদী সংস্কৃতবিদ্যার সঙ্গে পাশ্চাত্যবিদ্যার সংযোগ ও সমন্বয়ে দেশীয় ভাষার উন্নতিসাধন করাই তাঁর লক্ষ্য। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও সভ্যতার কথা বিশেষ করে তিনি উল্লেখ করেছেন।

২.

বিদ্যাসাগরের সামগ্রিক শিক্ষাচিন্তার ভিত্তি হল দেশের মানুষের শিক্ষার অধিকারে বিশ্বাস ও দেশের মানুষের শক্তির উপর আস্থা। রসময় দত্তের সঙ্গে মতানৈক্যের জন্য চাকরি ছাড়লেন বিদ্যাসাগর। রসময়ের ব্যঙ্গোক্তির উত্তরে তাঁর বিখ্যাত প্রত্যুত্তর আমরা জানি। দরকার হলে আলুপটল বেচবেন তবু সম্মান খোয়াবেন না। জীবিকার জন্য যে কোনো সৎ স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন করতে তাঁর কুলগত শ্রেণীগত সংস্কারে বাধতো না। এই মানসিকতা অর্জন করা সেযুগে খুব সহজ নয়। স্বাধীন বাণিজ্যবৃত্তির প্রতি অনুরাগ সে যুগের জাগরণের লক্ষণ। বিদ্যাসাগর ছাড়াও তারানাথ তর্কবাচস্পতির কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। নানা ধরণের ব্যবসা করে তারানাথ প্রচুর ধন উপার্জন করেন। বিদ্যাসাগর ব্যবসা শুরু করলেন বইছাপার। মুদ্রিত পুস্তক তাঁর কাছে মুক্তির নিশান। দেশে লেখাপড়া প্রসারের প্রধান অস্ত্র ছাপা

পাঠ্যবই — তা তিনি ভালোভাবেই জানতেন। প্রিন্টিংপ্রেস যেন নবযুগের প্রমিথিউস। বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন দুই বন্ধু মিলে 'সংস্কৃত প্রেস ও ডিপজিটরি' প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৪৬ বা ১৮৪৭ সালে। ধার করে জোগাড় করা হয়েছিল মূলধন। এই সময় থেকে চাকরি করলে ও বিদ্যাসাগর আর পুরোপুরি 'চাকুরিজীবী' নন, স্বাধীন ব্যবসায়ী ও বটে। এই প্রেস থেকে প্রকাশিত হবে বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, বাঙ্গালার ইতিহাস, জীবনচরিত, কথামালা, চরিতাবলী, বোধোদয়, আখ্যান মঞ্জরী। অজস্র পাঠ্যবই বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছোবার সেই সূত্রপাত। নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করার ব্রত হাতে কলমে গ্রহণ করলেন।

এর ফলে তাঁকে ভবিষ্যতে সমালোচনা ও সইতে হবে। অনেকেই তাঁকে text book writer বলেছেন, এতে অবজ্ঞা কম নেই। এই দলে আছেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। অজস্র পাঠ্যবই লেখার বদলে সাহিত্যরচনা করে নিজের খ্যাতি বৃদ্ধি করতে পারতেন। তার বদলে দেশের ছেলেমেয়েদের হাতে পাঠ্যবই তুলে দেবার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করেছেন। সেইসময় এর খুবই দরকার ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বৃদ্ধবয়সেও কার্মাটারে তাঁকে রাত জেগে পাঠ্যবইয়ের প্রুফ সংশোধন করতে দেখেছেন। ছাত্রদের হাতে ত্রুটিহীন শুদ্ধ বই তুলে দেবার প্রয়াসে অতন্দ্র ছিলেন তিনি।

'আমি বলিলাম : কথামালার প্রুফ আপনি দেখেন কেন, আর রাত জেগেই বা দেখেন কেন? তিনি বলিলেন — ভাষাটা এমন জিনিষ, কিছুতেই মন স্পষ্ট হয়না; যে আর একটা শব্দ পাইলে ভাল হইল; তাই সর্বদা কাটাকুটি করি। ভাবিলাম — বাপরে, এই বুড়াবয়সেও ইঁহার বাংলা ইডিয়মের ওপর এত নজর।' ১৮৫১ সালে বিদ্যাসাগর আবার ফিরে এলেন সংস্কৃত কলেজে প্রিন্সিপাল হয়ে। তাঁর হাতে লেখা ছাব্বিশ প্যারা সম্বলিত একটি নোট আছে যাতে কী কী সংস্কার তিনি কেন করতে চান তার বিবরণ রয়েছে। সংস্কৃত কলেজে তিনি মুক্তচিন্তার পরিসর তৈরি করলেন। সংস্কৃত গণিত প্রহেলিকাময় লীলাবতীর বদলে ইংরেজির মাধ্যমে গণিত শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। সমস্ত রকমের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অভিমতের দর্শন পাঠ করতে দিলে ছাত্রদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিমত গড়ে উঠবে এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা আয়ত্ত করার উপরে জোর দিলেন। সর্বদাই নোট্সের বদলে মূল টেক্সট বই পাঠ্য করার পক্ষপাতী ছিলেন বিদ্যাসাগর। বেনারস সংস্কৃত

কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালেন্টাইনের মিলের দর্শনের সংক্ষিপ্তসারস্বরূপ একটি বই ছিল। সেটি কলকাতা সংস্কৃত কলেজে পাঠ্য করার ইচ্ছে ছিল তাঁর। বিদ্যাসাগর জানিয়েছিনেল মূল বই পড়াই প্রয়োজন ও সেই ক্ষমতা ছাত্রদের আছে। তাঁর সব পদক্ষেপই যে সমালোচনার ঊর্দ্ধে তা অবশ্য নয়। বেদান্তকে তিনি ভ্রান্তদর্শন রূপে চিহ্নিত করেন। এই মত অনেকের কাছেই তখন একপেশে মনে হয়েছিল, আজও হবে।

পাশ্চাত্যবিজ্ঞানচর্চার একটি উদ্ভট প্রতিক্রিয়া উনিশ শতকের মাঝামাঝি দেখা দিতে শুরু করে। খ্রীষ্টান মিশনারীদের আক্রমণ ও ব্রাহ্মদের উত্থানে কোণঠাসা হিন্দুধর্মের পক্ষে এ হয়ত ছিল বিচিত্র এক আত্মরক্ষা ও আত্মগরিমা প্রচার। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা সূত্রের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের দূরান্বয়ী কোনো মিল চোখে পড়লে ও বলবার চেষ্টা করা হত প্রাচীন ভারতে এই সব তত্ত্ব ও সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল, পশ্চিমী বিজ্ঞান তার অনুসরণ করছে মাত্র। শশধর তর্কচূড়ামণি ছিলেন এই বিষয়ে সর্বাগ্রগণ্য। এই নির্বিচার যুক্তিহীন ধর্মোন্মদনা বা শাস্ত্রোন্মাদনা বিদ্যাসাগরকে বেদনা দিত। শিক্ষাসংসদকে লেখা চিঠিতে তিনি বলছেন,

'Lately a feeling is manifested among the learned of this part of India, especially in Calcutta and its neighbourhood, that when they hear of a scientific truth, the germs of which may be traced out in their shastras, instead of showing any regard for that truth, they triumph and the superstition regard of their own shastras is redoubled.'

পরে রবীন্দ্রনাথ এই মানসিকতাকে বিদ্রূপবিদ্ধ করবেন তাঁর নানা রচনায়। মেঘনাদ সাহা রসিকতা করে সবই বেদে থাকার কথা বলবেন।

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে ছাত্রদের শরীরচর্চার জন্য ব্যায়ামের আখড়া স্থাপন করেন। যে আটবছর অধ্যক্ষ ছিলেন কলেজের রক্ষণশীলতাও অনেকখানি ভেঙে দিয়েছিলেন। আগে শুধু ব্রাহ্মণরাই এখানে পড়ার সুযোগ পেত। ১৮৫১ সালে তিনি প্রথম কায়স্থদের জন্য পরে ১৮৫৪ সালে, সব হিন্দুদের জন্য কলেজের দরজা খুলে প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্যচর্চার সুযোগ করে দেন। এর ফলে ১৮৫৭ তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে গ্রীক-লাতিন আরবি-ফারসি সহ নানা ধ্রুপদী ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ও পাঠ্যভাষা হিসেবে জাতিধর্মানির্বিশেষে সবার জন্য চালু

করতে অসুবিধা হয়নি। নিয়মানুবর্তিতা, নিয়মিত হাজিরাসহ শৃঙ্খলার প্রবর্তন করেন। Corporal punishment বা শারীরিক শাস্তিতে তিনি একেবারেই বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু শৃঙ্খলাভঙ্গ মোটেই বরদাস্ত করতেন না। পাঁজি মেনে বিভিন্ন তিথির বদলে রবিবার ছুটির দিন ঘোষণা করেন। ছাত্রদের প্রতি অবারিত ছিল তাঁর স্নেহ। আর্থিক সাহায্য ছাড়াও বাড়িতে ডেকে এনে খাওয়াতে ভালোবাসতেন তাঁদের।

৩.

কোন ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হবে তা ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে একটি ধারাবাহিক সংকট ছিল। ১৭৮১ সালে কলকাতা মাদ্রাসা, ১৭৯১ সালে বারাণসী সংস্কৃত কলেজ ধ্রুপদী প্রাচ্যবিদ্যাই কেন্দ্রে। ১৯৭২ সালে চার্লস গ্রান্ট বললেন ধীরে ধীরে শুধু ইংরেজির মাধ্যমে দেশীয়দের শিক্ষা দিতে হবে। কাজের সুবিধার্থে খুবই একপেশে চিন্তা এটি। ১৮৩৫ সালে টমাস ব্যাবিংটন মেকলের বিখ্যাত মিনিট বিজয়ী হল এবং বেন্টিঙ্ক শিক্ষার জন্য নির্ধারিত অর্থ ভারতের জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রসারে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নিলেন। শাসক মনে করলেন সাম্রাজ্যের স্তম্ভরূপে থাকবেন ইংরেজি-শিক্ষিতরা, যাঁরা আসলে বাদামি সাহেব। চিন্তায় মনোভাবে তাঁরা হবেন ব্রিটিশ, কিন্তু চামড়ার রঙে ভারতীয়। ব্রিটিশদের মধ্যেও এর বিপক্ষে ছিলেন প্রাচ্যবাদীরা। ১৮৪৩ সালে উত্তরভারতের শাসনকর্তা টোমাসন গ্রামে গ্রামে হিন্দি পাঠশালা স্থাপন করেন। এগুলি খুবই সফল হয়েছিল। বাংলাদেশে ও হার্ডিঞ্জ ১০১টি পাঠশালা স্থাপন করেন কিন্তু তত্ত্বাবধানের অভাবে এগুলি বিনষ্ট হয়। একটি তথ্য মনে রাখার দরকার, ১৮৩৫ সালেই বেন্টিঙ্ক পাদ্রী উইলিয়ম অ্যাডামকে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট দিতে বলেন। অ্যাডাম তিনবছরের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিয়েছিলেন এবং পাঠশালাগুলির সংস্কার করতে বলেছিলেন। তিনি জাতীয় শিক্ষার সৌধ করতে চেয়েছিলেন পাঠশালাগুলোকে। মেকলের রিপোর্টের চাপে অ্যাডামের রিপোর্ট চাপা পড়ে যায়। পরে ছোটোলাট ফ্রেডরিক জে. হ্যালিডে ১৮৫৪ সালে বিদ্যাসাগরের প্রেরণায় জনশিক্ষাপ্রসারে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা পেশ করেন।

বিদ্যাসাগর শুধু প্রাথমিক লেখাপড়া, অঙ্ক নয়, যতদূর সম্ভব বাংলাতে পুরো শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। টেক্সটবইয়ের যে তালিকা তিনি প্রস্তুত করেন তাতে ভাষা ছাড়া

ছিল ইতিহাস, ভূগোল, পাটিগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, নীতিবিজ্ঞঅন, রাজনীতি ও শারীরবিজ্ঞানের পাশাপাশি জীবজন্তুর প্রাকৃতিক বিবরণ। এইসব বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক লিখতে হবে তাও তিনি বলেন। প্রতি স্কুলে দুজন করে শিক্ষক রাখার সঙ্গে তাদের বেতন বাড়ানোর প্রস্তাব রাখেন। তবে তাঁর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল চারটি জেলাকে নির্বাচন করে মডেল স্কুল স্থাপন। হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া, মেদিনীপুরকে নির্বাচন করে তিনি মডেলস্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। তাঁর কয়েকটি দৃঢ় কর্মনীতি ছিল, ইংরেজি স্কুলের কাছাকাছি বাংলা স্কুল স্থাপিত হবেনা কারণ তাহলে বাংলা স্কুল প্রার্থিত সমাদর পাবে না। শিক্ষকদের যথারীতি প্রশিক্ষণ দেবার জন্য নর্মাল স্কুল স্থাপন করতে হবে। স্কুলপরিদর্শক নিযুক্ত হবেন, বছরে একবার তিনি রিপোর্ট দেবেন। পাঠশালাগুলির উন্নতিসাধন করতে হবে।

মডেল স্কুল স্থাপনের সঙ্গে শহর ও গ্রামের অধিবাসীদের তিনি যুক্ত করে নিতে চেয়েছিলেন। ১৮৫৫-১৮৫৬ সালের মধ্যে উপযুক্ত চারটি জেলায় তিনি পাঁচটি করে মোট কুড়িটি স্কুল স্থাপন করেন। স্কুলের জমি কোথাও জমিদার দান করেন, কোথাও গ্রামবাসীরা জোগাড় করেন। স্কুলবাড়ির টাকা ও অন্যান্য সামগ্রীও এভাবে জোগাড় করা হয়। অর্থাৎ ওপর থেকে চাপানো নয়, শিক্ষার সঙ্গে সমাজের আন্তঃযোগাযোগ স্থাপন করতে অগ্রসর হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। সরকার স্কুলপিছু মাসিক পঞ্চাশটাকা Grant in aid দিত। প্রথম ছমাস ছাত্ররা বিনা বেতনে পড়ত, তারপর মাইনে দিয়ে পড়া শুরু হত। হিন্দু কলেজে একটি বাংলা পাঠশালা ছিল সেটিকে তিনি শিক্ষক প্রশিক্ষণকেন্দ্রে রূপান্তরিত করেন ও অক্ষয়কুমার দত্তকে এর ভার দেন। পরিকল্পনা থাকে যে নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা সেখানে প্রশিক্ষণ পেয়ে বাংলা স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেবেন। বিদ্যাসাগর এই সময় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা, নর্মাল স্কুল, চারজেলার মডেল স্কুল, বাংলা পাঠশালা সব তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব নিয়ে দিনরাত পরিশ্রম করতেন। তাঁর এই সর্বাত্মক চেষ্টার ফলে চারটি জেলার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে গোটা বাংলাদেশে স্কুল প্রতিষ্ঠার একটি আন্দোলন শুরু হয়। এখানে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ আশাকরি অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। আমার মতো নিতান্ত সাধারণ মানুষ এই অভিজ্ঞতার সূত্রে বিদ্যাসাগরের অলোক সামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাব অনুভব করেছিল। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাসংসদের সভাপতি থাকার সময় ২০০৭ সালে দেখেছিলাম পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বহু স্কুল দেড়শো বছরে পা দিচ্ছে। ঐ সব স্কুল স্থাপিত হয়েছিল

১৮৫৭ সালে। সব স্কুলই স্থানীয় মানুষের উদ্যোগে স্থাপিত। এই তথ্য প্রমাণ করে বিদ্যাসাগরের মডেল স্কুল স্থাপনের পবিকল্পনা কী বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল।

স্ত্রীশিক্ষাও তখন ধীরে ধীরে গতিলাভ করছে। ইয়ংবেঙ্গলরা তো উৎসাহী ছিলেনই, রক্ষণশীলরাও বাড়িতে মেয়েদের পড়াতে চাইছিলেন। বারাসতে প্যারীচরণ সরকার, কালীকৃষ্ণ মিত্র, নবীনকৃষ্ণ মিত্র বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন ১৮৪৭ সালে। ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল (পরে বেথুন স্কুল) স্থাপিত হল ১৮৪৯ সালে। মেয়েদের যে গাড়ি আনানেওয়া করত তার গায়ে বিদ্যাসাগর লিখিয়ে দিলেন 'কন্যা অপি এবং পালনীয়া শিক্ষণীয়া অতি যত্নতঃ।' তিনি জানতেন মহানির্বাণতন্ত্রের ঐ পংক্তি শাস্ত্রমানা দেশের মানুষের জন্য দরকার। বারবার তিনি এইজন্যই শাস্ত্রের দ্বারস্থ হয়েছেন। মানবতার খাতিরে, যুক্তির খাতিরেই স্ত্রীশিক্ষা বা বিধবাবিবাহ প্রচলন করা উচিত তিনি জানতেন কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশবাসীর কাছে যুক্তি নিস্ফল হবে এটা জানতেও তাঁর বাকি ছিলনা। কিন্তু কলকাতা আর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেই তো চলবে না। ১৮৫৭ থেকে ১৮৫৮ সালের মধ্যে বিদ্যাসাগর ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। এবারও তিনি বেছে নিলেন পূর্বোক্ত চারটি জেলা। হুগলিতে ২০টি, বর্ধমানে ১১টি, মেদিনীপুরে ৩টি, নদীয়াতে ১টি স্কুল স্থাপিত হল। মোট ছাত্রীসংখ্যা দাঁড়াল ১৩০০। গ্রামবাসীরা সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন, বিমুখ হল সরকার। বিদ্যাসাগর মডেলস্কুলের মত করেই বালিকাবিদ্যালয়গুলি চালাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সুখাসনকে প্রায় উন্মুল করার প্রান্তে নিয়ে গেল। অনেক ওলোটপালোট ঘটে গেল এবং কোম্পানির শাসনের পাট চুকল। মহাবিদ্রোহের ইংরেজ রচিত তৎকালীন ইতিহাস পড়লে পাল্টা ঘৃণার ভয়াবহ উদগার বেশ চোখে পড়ে। এই ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ নানাভাবে হয়েছে, শিক্ষাক্ষেত্রও বাদ পড়েনি। ১৮৫৮ সালের জুনে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অফ ডিরেক্টরস বাংলার সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল, 'not to sanction on any account any increase of expenditure in any part of India in connection with education without our authority previously obtained'. বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত বালিকাবিদ্যালয়গুলি চরম বিপন্নতার মুখে দাঁড়াল। সরকার প্রশ্ন তুলল পণ্ডিত কী করে ধরে নিলেন যে সরকার খরচ মঞ্জুর করবে। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ — বিদ্যাসাগরের বন্ধু, 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক বলেছিলেন স্বদেশের হিতানুষ্ঠানের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের 'জ্ঞানগম্য' থাকতনা।

১৮৫৮ সালের ৩ নভেম্বর বিদ্যাসাগর সরকারি চাকরি ছেড়ে দেন। এর পিছনে নানাবিধ কারণ আছে, বিভিন্ন ব্যাপারে ওপরওয়ালাদের সঙ্গে তাঁর মতসংঘাত হয়েছিল। বালিকা বিদ্যালয়গুলি যে নিতান্ত ন্যায্য সাহায্য থেকে বঞ্চিত হল, এটি ও একটি কারণ। তিনি নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার খুলে স্কুলগুলিকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন। তিনি জানতেন স্ত্রীশিক্ষার বাধা কী প্রচণ্ড। বাল্যবিবাহ, অবরোধপ্রথা, বহুবিবাহ ইত্যাদি ছাড়াও ছিল দীর্ঘদিনের কুসংস্কার। এমনকি ব্রাহ্মদের মনেও অনেক বাধা ছিল। ছেলেদের আর মেয়েদের সিলেবাস এক হবে কিনা তা নিয়ে দীর্ঘদিন বিতর্ক চলেছে। পুরুষের শিক্ষা হবে বুদ্ধিপ্রধান আর নারীর হবে হৃদয়প্রধান এই বদ্ধমূল সংস্কার এখনো পুরো দূর হয়েছে বলা যায়না। ১৮৭৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেয়েদের পরীক্ষা দেবার অধিকার দিল। চন্দ্রমুখী বসু এম.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তাঁকে এক সেট শেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলি উপহার দিয়ে বিদ্যাসাগর যে চিঠিটি লেখেন তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হল, 'সেদিন তোমায় দেখিয়া ও তোমার সহিত কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া আমি যারপরনাই আহ্লাদিত হইয়াছি। তুমি সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবিনী হইয়া সুখে কাল হরণ কর, এবং স্বজনবর্গের আনন্দদায়িনী ও সজ্জনসমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন, হও, এই আমার আন্তরিক অভিলাষ ও ঐকান্তিক প্রার্থনা।'

প্রতিটি শব্দে যেন আশীর্বাদের কণা ঝরে পড়ছে। ঘর হতে যাদের আঙিনা বিদেশ সেই মেয়েদের একজনকে 'সজ্জন সমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন হও' — এই আশীর্বাদ করার সাহস দেখিয়েছিলেন তিনি। তাঁর মনে নারী পুরুষের মেধার পার্থক্য নিয়ে কুসংস্কার ছিলনা। বিধবাবিবাহ প্রবর্তন বিষয়ে তাঁর লেখাপত্র পড়লে মেয়েদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা অনুভব করা যায়।

৪.

বিদ্যাসাগর সরকারি চাকরি ছাড়ার সময়েই সরকারি অনুদান বিষয়ে বীতস্পৃহ ছিলেন। ঔপনিবেশিক সরকারের মনোভাব যে দেশে শিক্ষাপ্রসার এবং বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা প্রসারের পক্ষে খুব অনুকূল তেমনটা মনে করার সত্যিই কারণ ছিলনা। যদিও ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এই সময়ই হয়েছে। ১৮৫৩ সালে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির সনদ নবীকরণের সময় বাংলার শিক্ষাসংসদের প্রেসিডেন্ট

চার্লস ক্যামেরন যে আবেদনপত্র পাঠান সেটি এই প্রসঙ্গে একটু মনে রাখা দরকার। ভারতীয় যুবকরা ইংল্যাণ্ডে গিয়ে উচ্চশিক্ষা নিতে পারবে না বলে তিনি এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে বলেন ও ডিগ্রি দেবার ব্যাপারে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। সিভিল ও মেডিক্যাল সার্ভিসের মত এডুকেশন সার্ভিস চালু করতে বলেন। ১৮৫৪ সালে চার্লস উড তাঁর ডেসপ্যাচে প্রেসিডেন্সি টাউনগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব ছাড়াও শিক্ষাসংক্রান্ত কাজ পরিচালনার জন্য একটি স্বতন্ত্র ডিপার্টমেন্ট স্থাপন করতে বলেন। শিক্ষকদের ট্রেনিং দেবার পাশাপাশি স্কুল কলেজের সংখ্যা বাড়ানো ও সরকারি গ্রান্ট দেবার কথা বলেন।

আপাতদৃষ্টিতে খুব উদার মনে হলেও কোম্পানির শিক্ষাবিস্তার নীতির মধ্যে প্রশাসনের ব্যাপারটিই প্রধান ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শাসনের দিক থেকে শিক্ষার প্রসার কীভাবে ঘটালে সুবিধা হবে তা পরিকল্পনাকারীরা মাথায় রেখেছিলেন। উপনিবেশে অন্য কিছু আশা করাও অসম্ভব। কার্যত অবশ্য ব্যাপারটা আরো ঘোরালো ও শাসকের দিক দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে দাঁড়ায়। তার কিছু পরিচয় পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে। উচ্চশিক্ষায় ফি বাড়ানো তখন সরকারি নীতির অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৮৫৮ সালে লিখেছিলেন সরকার প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রয়োজন হলে বন্ধ করে দেবার কথা ভাবছেন। একজন ঝানু ইংরেজ সিভিলিয়ানের মত উদ্ধার করে গিরিশচন্দ্র জানিয়েছেন যে সরকার মনে করেছিল সস্তায় ইংরেজি শিক্ষা পাওয়ার ফলে নানা ধরণের জীবিকায় সহজে প্রবেশ করে এক নতুন অভিজাতশ্রেণীর উদয় হচ্ছে। ভারতের বর্ণব্যবস্থায় চিরাচরিত জন্মদ্বারা স্থিরীকৃত আভিজাত্য বিপন্ন হচ্ছে। এই প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতারই প্রকাশ ঘটেছে ১৮৬০ সালে যখন একশোটি বাংলা স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা রূপায়িত করার সময় লেফটেন্যান্ট গভর্নর জে.পি. গ্রান্ট নির্দেশ দেন, 'restrict the improved course to the measurement of land, to some short Bengali Grammar and to the very first elements of Geography and Indian History.'

একদিকে সরকার শিক্ষার প্রসারে স্পষ্টভাবে অনাগ্রহী, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার ব্যাপারে মিশনারীদের উৎসাহ নেই। এই পটভূমিতে বিদ্যাসাগর গড়ে তুলেছিলেন ঐতিহাসিক মেট্রোপলিটান স্কুল ও কলেজ (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ)। মেট্রোপলিটান নামটি উনিশ শতকের অনেকগুলি বিদ্যায়তনের সঙ্গে যুক্ত

হয়েছিল। আমাদের আলোচ্য মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশনের সূত্রপাত হয়েছিল ১৮৫৯ সালে। এর সূচনা লগ্নের সঙ্গে জড়িত ছিলেন ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, মাধবচন্দ্র ধাড়া, পতিতপাবন সেন, গঙ্গাচরণ সেন, যাদবচন্দ্র পালিত এবং বৈষ্ণবচরণ আঢ্য। অর্থের জোগান দেন শ্যামাচরণ মল্লিক। গ্রন্থাগারের বইপত্র দেন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দত্তপরিবার। কয়েকমাস পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালন সমিতিতে যোগ দেন। পরে প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচাতে অন্য সদস্যরা বিদ্যাসাগরের উপর পরিচালনাভার অর্পণ করেন। তিনি কঠোর ও নিখুঁত নিয়মাবলি প্রণয়ন করে ও তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করিয়ে প্রশাসনিক শিথিলতার পথ রুদ্ধ করেন। ক্রমে এই প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে তাঁর প্রিয় সন্তানের তুল্য এবং এটিকে সরকারী কলেজের প্রবল প্রতিস্পর্ধী শক্তিরূপে তিনি দাঁড় করান। বিনয় ঘোষ বিদ্যাসাগরের উপর সুইট্‌জারল্যান্ডের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ যোহান হাইনরিখ পেস্টালজির প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। পেস্টালজির জীবৎকাল ১৭৪৬-১৮২৭ খ্রীঃ। তাঁকে আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের জনক মনে করা হয়। পেস্টালজির শিক্ষাভাবনা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক এবং সামগ্রিক। তিনি মানুষের অন্তর্গত শক্তির বিকাশে শিক্ষাকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন, সমাজের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন শিক্ষাকে। দারিদ্র্য দূরীকরণে যোগ্য জীবিকার সন্ধানে শিক্ষাই হবে সোপান — এই ছিল তাঁর মত। জন্মগত ভাবে শিক্ষার অধিকার প্রতিটি মানুষের আছে, মস্তিষ্ক, হৃদয় ও হাতের সম্মেলনে সমর্থ শিক্ষার্থীকে কেন্দ্রে রেখে শিক্ষককে সহৃদয় ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষার্থী পর্যবেক্ষণ করবে, নিজের ভুল সংশোধন করবে, বিশ্লেষণ করবে — শিক্ষক তাকে সাহায্য করবেন। এই সম্পর্কে মানবিক উষ্ণতার ওপর জোর থাকবে, শারীরিক শাস্তির প্রশ্ন সেখানে আসতেই পারেনা।

বিদ্যাসাগর যে যুগের মানুষ তখন ছাত্রদের ওপর দৈহিক নিপীড়নকে কোনো দোষ বলে মনেই করা হতনা। পাঠশালা এবং স্কুলে দৈহিক ও মানসিক উৎপীড়ন কম ছিলনা। বিদ্যাসাগর কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠানে দৈহিক, মানসিক নির্যাতন নিষিদ্ধ করেন। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যে সেকালের প্রথা অনুযায়ী বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে প্রচণ্ড মারধোর করতেন, সেই স্মৃতি তাঁর নিশ্চয়ই মনে ছিল। তাই বলে শৃঙ্খলাভঙ্গের কোনো ক্ষমা ছিল না। মেধাবী ছাত্রদের পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা রেখেছিলেন, দরিদ্র ছাত্রদের জন্য তাঁর দরজা সর্বদা খোলা থাকত। বহুছাত্রকে তিনি নিজে আর্থিক

সাহায্য করতেন। বইপত্র কিনে দিতেন। শিক্ষক, ছাত্র, চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারী — সকলের অসুখবিসুখে তিনি প্রয়োজন হলেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন; অনেক সময় নিজে সেবা শুশ্রূষাও করতেন।

মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশনে বি.এ ক্লাস খুলবার জন্য ১৮৬৪ সালে বিদ্যাসাগর অগ্রসর হন। সব নিয়ম মেনে আবেদন করা সত্ত্বেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সরাসরি তা নাকচ করে দেয়। ভাবলে অবাক লাগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনার সময় থেকে বিদ্যাসাগর ছিলেন সেনেটের মাননীয় সদস্য। আবেদন করার সময়েও তিনি সেনেট সদস্য — তবু আবেদন নাকচ হল। সিসিল বীডন এবং বিশপ কটন সহ অন্য অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি চাইলেও অনুমোদন যে দেওয়া হলনা তার একটা কারণ পিছন থেকে সব পণ্ড করার জন্য অনেকে ছিলেন, বিশেষ করে রেজিস্ট্রার সাটক্লিফ সাহেব, তিনি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষও বটে। তিনি দেশি অধ্যাপক দ্বারা পরিচালিত প্রতিযোগী কলেজ স্বভাবতই চাইছিলেন না।

ইন্সটিটিউশনের বাড়ি নিয়েও বিদ্যাসাগর যে কম ঝামেলা পোহাতে হয়নি। ভাড়াবাড়িতে স্কুল ছিল, বাড়িওয়ালা তুলে দেবার জন্য মামলা করেছিলেন। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন ১৮৬৮ সাল থেকে স্কুলের প্রধান ব্যয়ভার বিদ্যাসাগর বহন করেছেন। মেট্রোপলিটানে শিক্ষকদের মাইনে বেশ ভালোই ছিল। ভালো শিক্ষকদের আকর্ষণ করার জন্যই এই ব্যবস্থা বোঝা যায়। ১৮৭২ সালে বিদ্যাসাগর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এফ.এ কোর্স খোলার অনুমোদন চেয়ে আবেদন করেন। আগের বার শুধু দেশীয় অধ্যাপকদের নাম দেওয়াতে কর্তৃপক্ষ অনুমোদন দেননি — এটি অনুমান করে বিদ্যাসাগর এবার দেশীয় অধ্যাপক নিয়োগের পক্ষে জোরালো যুক্তি দিলেন। আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাসে দীপ্ত দৃঢ় তাঁর মতামত, 'I would take the liberty to remind you that the Sanskrit College, which teaches upto the B.A. standard, has an exclusively native staff, and that our Professors would be drawn from the same class of men. We feel confident that native Professors, if selected with care and judgement, would be found quite competent...'

তিনি স্পষ্ট জানালেন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াবার খরচ সব অভিভাবকের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়, আর উচ্চশিক্ষালাভে ইচ্ছুক বহু ছাত্রকে তাদের অভিভাবকরা মিশনারী কলেজে পাঠাবার বিরোধী। তাই মেট্রোপলিটানের মতো প্রতিষ্ঠানে

পড়ার সুযোগ ছাত্রদের কাছে বরলাভের তুল্য হবে। এইবার এফ.এ কোর্স খোলার অনুমতি মিলল। সাধারণ ঘরের ছেলেদের কাছে উচ্চশিক্ষার দরজা খোলার একটি পর্বের সূচনা হল। যদিও নানা প্রতিকূল সমালোচনা ছিল কিন্তু ১৮৭৪ সালে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে এফ.এ পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় হলেন। দেশীয় শিক্ষকদের জ্ঞান ও অধ্যাপনার মান সম্বন্ধে অপপ্রচার জোরালো ধাক্কা খেল। কার্মাটার থেকে খবর পেয়ে কলকাতা চলে এলেন বিদ্যাসাগর, যোগেন্দ্রচন্দ্রকে নিজের গ্রন্থাগার থেকে সুন্দরভাবে বাঁধানো স্কটের ওয়েভারলি নভেলের একটি সেট নিজে হাতে লিখে উপহার দিলেন। ১৮৭৯ সালে বি.এ পড়াবার অধিকার লাভ করল মেট্রোপলিটান, ফার্স্টগ্রেড কলেজে উন্নীত হল। কোনোরকম সরকারি অনুদানের তোয়াক্কা না করে বিদ্যাসাগর এই কলেজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। ১৮৮২ সালে মেট্রোপলিটান বি.এল কোর্স খুলল। এই ঘটনার সুদূরপ্রসারী প্রভাব আছে আমাদের জাতীয় জীবনে। উনিশ শতকের শেষ দিকে আইনজীবীরা দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই আইনজীবীরা বেশিরভাগ এসেছিলেন মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে এবং তাঁদের একটা বড়ো অংশই মেট্রোপলিটানের আইনের ছাত্র।

মেট্রোপলিটানে পড়াতেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার লাহিড়ি, নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, সারদারঞ্জন রায়, সূর্যকুমার আচার্য প্রমুখ বিখ্যাত অধ্যাপক। কলেজে যে জাতীয়বাদী হাওয়া বইত তার বর্ণনা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় স্মৃতি থেকে উদ্ধার করেছেন। ১৮৭৮ সালে ব্রহ্মবান্ধব মেট্রোপলিটানে এফ.এ পড়েন, সুরেন্দ্রনাথ ক্লাসে সরাসরি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতেন, কে কে ম্যাটসিনি বা প্যারিবলডি হতে চায়। ক্লাসশুদ্ধ ছেলে একযোগে জানাত তারা সবাই ঐ আদর্শে বিশ্বাসী। বিদ্যাসাগর খুব ভালোভাবেই জানতেন কোন কোন অধ্যাপক কীভাবে ক্লাসে ছেলেদের দেশপ্রেমে উদীপ্ত করছেন। তিনি কোনোরকম নিয়ন্ত্রণ করেননি। তাঁর মৌন সম্মতি ছিল উচ্চশিক্ষার সঙ্গে দেশাত্মবোধের দীক্ষায়। মেট্রোপলিটানের সাফল্য অতি অল্পকালের মধ্যেই বিদ্যোৎসাহী জাতীয়তাবাদী বাঙালিদের বেসরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে সাহস জুগিয়েছিল। ১৮৮১ সালে আনন্দমোহন বসু স্থাপন করলেন সিটি কলেজ, ১৮৮৪ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্থাপন করলেন রিপন কলেজ এবং ১৮৮৭ সালে গিরিশচন্দ্র বসু বঙ্গবাসী কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য যে তৃষ্ণা বাঙালির মনে জেগে উঠেছিল তা

মেটাবার বিস্তৃত ব্যবস্থা বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠল। অনেক স্বল্প খরচে উচ্চমানের শিক্ষা যে দেওয়া যায় বিদ্যাসাগর তা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। সরকারের কাছে এক পয়সা সাহায্য না নিয়ে সম্পূর্ণ দেশীয় অধ্যাপকদের নিয়োগ করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সমান্তরাল শক্তিকেন্দ্র গড়ে উঠল। আর্থিক দিকে তুলনামূলক ভাবে দুর্বল উচ্চশিক্ষার্থীরা প্রাইভেট কলেজগুলিতে ভর্তির সুযোগ পেল। উচ্চশিক্ষায় প্রেসিডেন্সির একচ্ছত্র আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বিদ্যাসাগর উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়নে পথিকৃৎ হলেন।

তথ্যসূত্র

১। *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ* ঃ বিনয় ঘোষ ; ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৮৪

২। *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর* ঃ ইন্দ্র মিত্র; আনন্দ, ২০০৭

৩। *বিদ্যাসাগর রচনাসমগ্র* প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড; বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, ভূমিকা ঃ রঞ্জন চক্রবর্তী, শিবাজীপ্রতিম বসু

৪। *বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য ব্যক্তিত্ব*; কোরক সংকলন, সম্পাদনা ঃ তাপস ভৌমিক, ২০১৪

৫। *দ্বিশতজন্মবর্ষে ঈশ্বরচন্দ্র*; কোরক, সম্পাদনা ঃ তাপস ভৌমিক, ২০১৯

৬। *A Short history of Vidyasagar College.* শতবর্ষ স্মরণিকা

৭। *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী* ঃ বিহারীলাল সরকার, ১৩২৯

৮। *বিদ্যাসাগর* ঃ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গরমণীর বিদ্যাসাগর

অনিতা অগ্নিহোত্রী

গত বছর, ২০১৯ এর সেপ্টেম্বর মাসে, আমার হাতে একটি নিমন্ত্রণ পত্র এসে পৌঁছল। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন থানার জামুয়াপতি গ্রামের একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবক্ষ মূর্তি স্থাপিত হবে। আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে সেই মূর্তিটি উন্মোচন করার জন্য। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মের দুশো বর্ষ পূর্ণ হতে চলেছে। বাংলা জুড়ে তার আয়োজন চলেছে নানা ভাবে। লেটার প্রেসে ছাপা গোলাপী রঙের নিমন্ত্রণ চিঠিটি মনে অপূর্ব উচ্ছ্বাস এনে দিল। এ কী সম্ভব? আমি কি আমার সৃষ্টিকর্তার মুখোমুখি হবো, তাঁর আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করে? পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রকৃত অর্থেই আমার সৃষ্টিকর্তা। কেবল তুচ্ছ কায়া টুকু বাদ দিলে, আমার চেতনা, অক্ষর জ্ঞান, ভাষা বোধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ সবই তাঁর নির্মাণ ও কাজের ফলশ্রুতি। রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় হবার বহু পূর্বে অক্ষর জ্ঞানহীন অবস্থায় আমার ভাষা নগরীর দ্বারদেবতা বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচয়। আমি জানিনা, আমার সমসাময়িক, তরুণ বা প্রবীণতর কোনও বাঙালি নারী আছেন কিনা, যাঁর চেতনা, শিক্ষানুরাগ, মনন, কল্পনার বিকাশ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উত্তরাধিকার নয়। অথবা উত্তরাধিকারের এই ঋণ যিনি অন্তরের কাছে স্বীকার করেন না। যাইহোক, আমার মতন সকল বাঙালী রমণীর প্রতিনিধি হয়ে কাশফুলে সাজানো রাজপথের প্রান্ত, দিগন্ত পর্যন্ত বিছানো ধানের সবুজ পার হয়ে এক দ্বিপ্রহরে আমি দাঁতন থানার জামুয়াপতি গ্রামে পৌঁছলাম। একটি স্মরণীয় অপরাহ্ন কাটালাম স্থানীয় মানুষ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের সান্নিধ্যে। গ্রামের নাম জামুয়াপতি হলেও, স্কুলের নাম কোনও গূঢ় ঐতিহাসিক কারণে ভেটি আমলা বোর্ড-১ প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্কুলে রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মর্মর মূর্তি আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবার বিদ্যাসাগরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা

হয়ে ষোলোকলা পূর্ণ হ'ল। ব্যক্তিগত ভাবে, আমি মূর্তি উপাসক নই। মূর্তির চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় ও স্পষ্ট বই। লেখা বই, জীবনী গ্রন্থ। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তাঁর মূর্তি বা রবীন্দ্রনাথের প্রতিদিন একবার করে দেখাও মানুষটি সম্বন্ধে কল্পনার নির্মাণে সহায়ক হতে পারে।

আমি এই দুই মণীষী কেই কাছ থেকে দেখছিলাম। রবীন্দ্রনাথ যেন ঋষি, নিজেই এক ধ্যানবিন্দু। বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্মবীর, যাঁর মুখ মেদিনীপুর অঞ্চলের এক সাধারণ মানুষের মতন। তাঁর বিরাট মেধা, জ্ঞান নিহিত হয়ে আছে কাজের অভিব্যক্তির নিবিড়ে। মানুষের সঙ্গে আড়াল সৃষ্টি করেনি। রবীন্দ্রনাথের অবয়বে যদি মূর্ত হয়ে থাকে তাঁর দর্শন ও কল্পনা, বিদ্যাসাগরের আবক্ষ-প্রতিমা বলে, তাঁর জীবনকে জানতে গেলে প্রবেশ করতে হবে জ্ঞান চর্চা ও কর্মের গভীরে।

ফুলে পল্লবে রঙিন কাগজের পতাকায় সাজানো স্কুলের বাড়ী, তার সামনে পর্দার দড়ি টেনে মূর্তি উন্মোচন, তারপর খোলা মাঠে শামিয়ানার নীচে মঞ্চে বসে শোনা ছাত্র-ছাত্রীদের আবৃত্তি, গান, নাচ, জিমন্যাস্টিক। অভিভাবকদের আগ্রহ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তুলনায় কিছু কম নয়। ছোট মেয়েটির জিম্‌ন্যাস্টিক এর পদসঞ্চার ভুল হবার সম্ভাবনায় তার মা যেভাবে কাছে এসে দেখানোর চেষ্টা করছিলেন, তাও খুব মনোহর লাগছিল আমার চোখে। ঐ ছোট মেয়েটি, তার তরুণী মা কি জানে, আজ যাঁর মূর্তি উন্মোচন হ'ল, আর যাঁকে নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতা আবৃত্তি হয়েছে মঞ্চে, তাঁর স্নেহ আশীর্বাদ দুশো বছর পার হয়ে এসে ঝরে পড়ছে আমাদের সবার মাথায়!

অনুষ্ঠান শেষে অপেক্ষা করেছিল একটি বিস্ময়। অতিথি হিসেবে আমার হাতে তুলে দেওয়া হ'ল একটি উপহার। গ্রামবাসিদের পক্ষ থেকে নব্বই বছর বয়সী প্রবীণতম কর্মকার হাতে দিলেন গ্রামের কামার শালে তৈরি একটি বঁটি ; স্থানীয় ভাষা যাকে বলে, পুনিক্। ওড়িশার সীমান্ত অঞ্চলে, বঁটির নাম বলতে শুনেছি 'পনিকি'। পুনিক্-পনিকি দুয়েরই মধ্যে ধ্বনিগত সাম্য আছে এবং ভাষাভিত্তিক আত্মীয়তা। কাছাকাছি জন্মানো কোনও গাছের কাঠে গাঁথা, গ্রামের নাম লেখা, কামার শালে তৈরি লোহার ফলাটি — তার ধার এত ভয়ঙ্কর যে, উদ্যোক্তারাই বললেন, সাবধানে ধরে নিয়ে যেতে। খুবই সুদূর তুলনা, এবং অনুপযুক্তও, তবু ঐ

লোহার সামগ্রীটি আমাকে পলকের জন্য মনে করাল তাঁকেই, যাঁর মূর্তির উন্মোচন হয়েছে কিছুক্ষণ আগে।

দুশো বছর আগে বিধাতা নির্মিত এই খাঁটি লোহার ফলায় জ্ঞান ও কর্মপরায়ণতার যে ধার ছিল, তার সঙ্গে হৃদয় উৎসারিত করুণার কোনও বিরোধ ছিলনা। একবিংশ শতকের পুত্র সন্তানকে তার পরিবার শেখায় — ছি! মেয়েদের মত কাঁদতে নেই! ঊনবিংশ শতাব্দীর বীরসিংহের সন্তান পরের দুঃখে কেঁদে আকুল হতেন। এতে তাঁর পৌরুষ খর্ব হল কি না, তা কখনো ভাবার সময়-সুযোগ পান নি। ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষ। এক মুঠো ভাতের অভাবে মারা যাচ্ছে মানুষ। বিদ্যাসাগর অন্নছত্র খুলেছেন বীরসিংহ গ্রামে। যে মেয়েরা খেতে আসে, তাদের পেটে ভাত নেই, ফলে মাথায় তেলও নেই। প্রান্তিক বর্গের মেয়েদের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়ে বরাদ্দ দু পলা তেল দিত বিক্রেতারা তফাৎ রেখে। 'আহা এভাবে কি মানুষকে কিছু দিতে হয়? বিদ্যাসাগর নিজেই এগিয়ে এলেন তখন। নিজের হাতেই তিনি গরীব দুঃখিনীদের রুক্ষ চুলে তেল মাখিয়ে দিতে লাগলেন।'

নিজের জীবনের গত ছ দশকে পর্দায় ও খবরে পৌরুযেয় বহু কাজ দেখেছি, পড়েছি। মার দাঙ্গা, খুন জখম, ধর্ষণ, লুন্ঠন, রাজনৈতিক বস্ত্রহরণ, মদ্যপ অবস্থায় বেগে গাড়িয়ে চালিয়ে ফুটপাথ বাসিদের হত্যা, এ ছাড়া আইন ফাঁকি দিয়ে জনগণের অর্থ ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে বিদেশ গমন ইত্যাদি। কোনও দরিদ্র নারীর চুলে তেল লাগিয়ে দিতে, কিংবা ক্ষুধার্তের জন্য আহার ছাড়াও তেলের বরাদ্দ করতে দেখিনি ভারতীয় কোনও পুরুষকে। মেধা, কর্মদক্ষতা ও কঠিন পরিশ্রমের ক্ষমতার সঙ্গে হৃদয় জোড়া করুণার এই সমাপতন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মধ্যে যেমন ঘটেছিল, দ্বিতীয় বার দেখিনি বলেই সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গুণবত্তার এই আপাত বিপরীত সন্নিবেশকে আমরা সামাজিক স্মৃতি থেকে মুছে দিয়ে অস্বীকার করতে চেয়েছি।

বিধবাদের দুঃখ মোচন করবেন এই সঙ্কল্প যখন করেছিলেন বিদ্যাসাগর, তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৩/১৪ বছর। তাঁর প্রতিবেশির কন্যা, বাল্য সহচরী, বিধবা অবস্থায়, একাদশীর দিন উপবাসে আছে জানার পর তিনি কেঁদেছিলেন। দিনের পর দিন

ভেবেছেন বিদ্যাসাগর ও পুঁথির পাতায় শাস্ত্রোক্ত যুক্তি খুঁজেছেন বিধবা বিবাহের সপক্ষে।

রাতে না ঘুমিয়ে, দিনে চিন্তামগ্ন আত্মবিস্মৃত অবস্থায় আহার ভুলে, অধ্যয়ন করে চলেছেন নানাবিধ বই ও পুঁথি। শেষ পর্যন্ত পরাশর সংহিতার সেই শ্লোকটি খুঁজে পেলেন, যাতে ক্লীব, পতিত, প্রব্রজমান, নষ্ট এবং মৃত পতির স্থানে অন্য পতি গ্রহণ করার বিধান দেওয়া হয়েছে। ১৮৫৫ সালে বিধবা বিবাহের সমর্থনে শাস্ত্রসম্মত একটি পুস্তিকাও লিখে ফেললেন বিদ্যাসাগর। পিতা ও মাতা উভয়েই তাঁর এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন। বিদ্যাসাগর ও সমকালীন সমাজসংস্কারকদের পক্ষ থেকে বিধবা বিবাহ বিষয়ক আইন পাসের জন্য যে প্রস্তাব গিয়েছিল, তা নিয়ে ঝড় উঠে ছিল নিন্দা, কুকথা, অশ্রাব্য তিরস্কারের। অজস্র অর্থও ব্যয় করেছিলেন বিদ্যাসাগর। তাঁর সাহায্যার্থে শেষ পর্যন্ত প্যারী চরণ সরকারকে এগিয়ে আসতে হয়। নানা গীত ও কবিতায় বিধবাদের পক্ষ থেকেও মনোব্যথার বিশদ বিবরণ ও আশীর্বচন বর্ষিত হয়েছিল বিদ্যাসাগরের মাথায়। যদিও বিবাহের আইনের বিপক্ষেই বেশি প্রস্তাব এসেছিল, বাংলা ও দেশের নানা প্রান্ত থেকেই, ১৮৫৬ সালে ২৬শে জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাস হ'ল।

বালবিধবাদের কৃচ্ছ্রসাধন, তাদের সুখবঞ্চিত জীবন, বিধবাদের আজীবন পরনির্ভরশীলতা ও লাঞ্ছনার নিয়তি যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বিধবা বিবাহ আইন পাসের পথে নিয়ে গিয়েছিল, লোকাচার কে তিনি শাস্ত্রবিধি ও আইন বলে পরিবর্তিত করতে চেয়েছিলেন, কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহ নামক কুপ্রথা বন্ধ করার জন্য ও তিনি একই ভাবে জনমত গঠন করার চেষ্টা করেছিলেন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এর সদস্য, বর্ধমান ও কৃষ্ণনগরের জমিদারগণ, রাজা দিগম্বর মিত্র, রমানাথ ঠাকুর এঁদের মাধ্যমে — দুঃখিনী আশ্রয় চ্যুতা মহিলারা দ্বারে দ্বারে দুমুঠো অন্নের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন, পরিবার দ্বারা প্রতারিত হচ্ছেন, এ কষ্ট তাঁর বুকে বেজেছিল। বহুবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থে বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিয়েছেন, হুগলী জেলার ৮৬ খানি গ্রামের ১৯৭জন কুলীন সন্তান ১২৮৮ জন রমণীর পাণিগ্রহণ করেছেন। এঁদের 'চিরদুঃখানলে' দগ্ধ করেছেন কুলীন পতিরা। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে কোনও সরকারী আইন পাশ করাতে সক্ষম হননি বিদ্যাসাগর,

একথা সত্য। কিন্তু যা আমাদের মনে দেড়শ বছর পেরিয়ে এসে বিস্ময় জাগায়, তা হ'ল — বহু শত বর্ষ ধরে লোকাচার স্বীকৃত এই দুই প্রথা, যার বৈষম্যমূলক অভিঘাত মেয়েরা নিঃশব্দে বহন করে আসছিলেন, সমাজকর্তাদের, অন্য শিক্ষিত, সক্ষম ব্যক্তিদের পূর্ণ সম্মতি ক্রমে, অন্তপুরের অন্তরাল থেকে সেই প্রথার বলি প্রদত্ত মেয়েদের অস্ফুট দীর্ঘনিঃশ্বাস ও অশ্রুবাষ্প এই হৃদয়বান পুরুষের কাছ পর্যন্ত কি ভাবে পৌঁছেছিল? মানবহৃদয়ের তুচ্ছতম সূক্ষতম বিষাদ যাঁর হৃদয়ে পৌঁছে করুণা সঞ্চার করে, তিনিই মহাপ্রাণ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃতিত্ব হ'ল, তাঁর অনুভূতি কেবল অনুভবেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তিনি চেষ্টা করেছেন চেষ্টাকে একটি কার্যকর কাঠামো দিতে — বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রে, নিরোধন আইন। বহুবিবাহের ক্ষেত্রেও — আইন প্রণয়ন করিয়ে নেওয়ার জন্য সামাজিক আন্দোলন, যদিও শেষ পর্যন্ত আইন হয়নি। স্থিতধী ও প্রাজ্ঞ, তিনি বহু অভিজ্ঞতায় জানতেন, আন্দোলনের আবেগ ব্যক্তির আবেগের চেয়ে শক্তিশালী, কিন্তু তাকে জাগিয়ে রাখতেও জনসমর্থন, অর্থ সবকিছুরই প্রয়োজন। না হলে তার উচ্ছ্বাসও সমাপ্ত হয় একদিন। আইন কার্যকর থাকে, আহত মানুষ আইনের আশ্রয় চাইতে পারে প্রয়োজনে। বিধবা বিবাহ যদি নারীর স্বাভাবিক জীবন যাপনের শর্ত হয়, বহুবিবাহ রোধ তার সম্মানজনক জীবনযাপনের আয়োজন; এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মেয়েদের জন্য বিদ্যাসাগরের আরও একটি মহান উদ্যোগ—শিক্ষা। বাংলাভাষায় শিক্ষা প্রসারের জন্য যে বিপুল পরিশ্রম বিদ্যাসাগর মহাশয় করেছিলেন, স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের কাজকেও তার চেয়ে আলাদা করা যায়না। বলা যায়, দেশজ শিক্ষা ব্যবহার ভিত্তি ভূমিই হ'ল 'বঙ্গ বিদ্যালয়' স্থাপন। ১৮৫৪ সাল, সংস্কৃত কলেজের গ্রীষ্মাবকাশে বিদ্যাসাগর ঘুরে বেড়াচ্ছেন গ্রামে গ্রামে ঃ শিয়াখালা; রাধানগর; ক্ষীরপাই; চন্দ্র কোণা; কামারপুকুর; রামজীবনপুর; পাঁতিহাল। এ সব গ্রামে প্রতিষ্ঠা হবে আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয়। গ্রামের মানুষ আপন খরচে বিদ্যালয়ের বাড়ি তৈরি করে দেবেন, এমন প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিযুক্ত হয়েছিলেন, বঙ্গবিদ্যালয় সমূহের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক; কিছুদিন পর সরকারী শিক্ষাবিভাগে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও, লেফটেন্যান্ট গভর্ণর হ্যালিডের বিশেষ আগ্রহে বিদ্যাসাগর পেলেন ইন্সপেক্টর অব্ স্কুলস্ এর পদমর্যাদা এবং অতিরিক্ত বেতনও। হ্যালিডে

সাহেব ঠিকই অনুমান করেছিলেন, এই কাজে তাঁর চেয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি বঙ্গদেশে কেউ নেই।

এবার স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের কথা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও বাঙলায় কোনও বালিকা বিদ্যালয় ছিল না। সম্পন্ন পরিবারে শিক্ষয়িত্রীরা এসে মেয়েদের পড়াতেন। 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি'র মহিলা শিক্ষয়িত্রীরা ও মিশনারীরা মিলে অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় খোলেন কলকাতার নানা জায়গায়। ১৮২০-২২ সাল। এর পর লেডিজ সোসাইটি, শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন — এঁদের তরফ থেকেও স্কুল আরম্ভ করা হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে খ্রীষ্ট ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য মিশে যাওয়ায় হিন্দু মেয়েরা আগ্রহী হচ্ছিলেন না। ১৯৪৭-এ বারাসত-এ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হ'ল কালীকৃষ্ণ মিত্র ও প্যারীচরণ সরকারের উদ্যোগে। এর জন্য প্রচুর কুকথা ও সামাজিক নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছিল দুজনকেই। এরপর ১৮৪৯ সালের ৭ই মে, বেথুন-এর বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হ'ল। ১৯৫০ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় হলেন বেথুনের বালিকা বিদ্যালয়ের অনারারি সেক্রেটারি। বাঙ্‌লার ছোটোলাট হ্যালিডের সঙ্গে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার নিয়ে আলোচনা করতে যেতেন বিদ্যাসাগর। হ্যালিডের অগাধ আস্থা ছিল বিদ্যাসাগরের কর্ম তৎপরতা এবং অভিজ্ঞতার উপর। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কয়েকবার বিদেশী পোশাক পরেও গেছেন।

১৮৫৭ সালের মে মাসে বর্ধমান জেলার জৌগ্রামে একটি আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে ডিরেক্টর অব্ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন কে জানালেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। ৪৭ টাকা মাসিক খরচ হিসেব করা হয়েছিল, সরকার মঞ্জুর করলেন ৩২ টাকা। এতে বিদ্যাসাগর মনে করনেন, বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে সরকারের সম্মতি আছে। ১৮৫৭ সালের নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ সালের মে মাসের মধ্যে বাংলার হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলায় পঁয়ত্রিশটি বালিকা বিদ্যালয় খুলে ফেললেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র। রাজ্য সরকারের অনিচ্ছা ছিল, হ্যালিডে সাহেব বারণও করেননি, কিন্তু বাদ সাধলেন ভারত সরকার। তাঁরা মাসিক অর্থ সাহায্যের মঞ্জুরী দিলেন না। সব ক'টি স্কুলের খরচ মিলে হয় মাসে ৮৪৫ টাকা। ছ'মাসে হাজার তিনেক টাকা বকেয়া মাইনে। এ বিষয়ে অনুমতি না নিয়ে স্কুল খোলার বিষয়ে রাজ্য

ও ভারত সরকারের প্রচুর পত্রালাপ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের দায়িত্ব ছাড়তে বাধ্য হলেন, সরকারী সহযোগিতার অভাবে, অথচ তাঁর চিন্তা দূর হলনা। ভারত সরকার বকেয়া অর্থ তিন হাজার মঞ্জুর করলেও, মাসিক অর্থ সাহায্যের কোনও প্রতিশ্রুতি দেননি। শিক্ষক, পণ্ডিতরা মাসিক বেতন কিভাবে পাবেন? বিদ্যাসাগর তখন নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভান্ডার নামে একটি ভাণ্ডার খুলে অর্থসাহায্য সংগ্রহ করে স্কুলগুলি চালাতে সচেষ্ট হলেন। ধীরে ধীরে আরও তিন চার বছরে ৭টি স্কুল মঞ্জুরী পেল। জেলায়, মফস্বল অঞ্চলে স্কুলগুলি প্রশংসা পেল। বেথুন স্কুলের সেক্রেটারি হিসেবে শিক্ষিকা ও কর্মীদের বর্ধিত ভাতা, নতুন ভবন, কোচ হাউস ও আস্তাবল নির্মাণের জন্য নানা ধরণের আর্থিক সাহায্যের আবেদন করে বেঙ্গল গভর্নমেন্টকে বার বার চিঠি লিখেছেন। চিঠি গুলি পড়লে বোঝা যায়, কত যত্ন, অভিনিবেশ, ভাবনা চিন্তা এই সব প্রস্তাবের পিছনে আছে। এগুলি কোনও মতেই মামুলী সরকারী চিঠি নয়। স্ত্রী শিক্ষা ক্রমশঃ প্রসারিত হয়েছে বাংলায়। তার অগ্রগতি রুদ্ধ করার মত কোন শক্তিই ছিল না। 'বামাবোধিনী' পত্রিকার প্রতিবেদন অনুসারে নিজের দেহাবসানের কিছু আগে বেথুন কলেজ দেখে এসে বিদ্যাসাগর মহাশয় অশ্রুবিসর্জন করেছিলেন। কোনও বন্ধুকে বলেছিলেন — ''মেয়েরা এত উন্নতি করিয়াছে, যে তাহা স্বপ্নেরও অতীত, কিন্তু যে বেথুন এত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া স্কুল স্থাপন করিল, সে ইহা দেখিতে পাইল না — এই দুঃখে হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে।"

রোদনের বিষয় এ নয়, আমাদের আনন্দ ও উদ্‌যাপনের বিষয় — বাঙালী রমণীরা কত উন্নতি করেছে শিক্ষায়, স্বাধীন চিন্তায়, গবেষণা ও প্রযুক্তিতে; তাদের স্বাতন্ত্র্য, অধিকার রক্ষায় তাদের লড়াই আজ সারা দেশের কাছে আদর্শ-স্বরূপ। আপনি দেখলে উৎফুল্ল হতেন, বিদ্যাসাগর। আর এই জন্যই আমার, আপনাকে মাত্র একটি বার দেখতে খুব ইচ্ছে করে। আধিদৈবিক কোনও অভিজ্ঞতা নয়, সাধারণ চর্মচক্ষের দেখা। সংস্কৃত কলেজের সামনে পাণ্ডুলিপি ও বই হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কতবার ভেবেছি, এ তো হতেই পারে, এ আর এমন কি আশ্চর্য। বিপুল পরিশ্রম করেছিলেন আপনি, প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন নিজের উপার্জন থেকে, সে সব বিফলে যায়নি, বিদ্যাসাগর। আমরা তিলে তিলে তার সদ্ব্যবহার করেছি। আমরা, মেয়েরা, কিছুই তো ফেলতে পারিনা! এই কথা আপনাকে অন্তত একবার বলার

জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছি, যে, বর্ণের পৃথিবীতে যে প্রবেশাধিকার আপনি দিয়েছিলেন, সেখান থেকে পায়ে হেঁটে আমরা পৌঁছেছি বাংলাভাষা চর্চার রাজপথে। আপনার গদ্য পৃথিবীর নানা ধ্বনি তরঙ্গ শ্রবণে মননে লালন করতে করতে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের লালিত বঙ্গভাষার কুসুমিত উদ্যানে চয়ন করেছি প্রস্ফুটিত চিন্তার আনন্দ সম্ভার। বঙ্গরমণীদের পক্ষ থেকে আপনাকে হৃদয়ের উজাড় করা কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে কত কিছুরই উল্লেখ যে বাকি রয়ে গেল - যা হতে পারত সম্পূর্ণ এক বা একাধিক বইয়ের বিষয় বস্তু। আপনার ভাষা নির্মাণের কৃতিত্ব, অগাধ করুণায় লালন করা শত শত মানব মানবীকে, অজস্র পুস্তকের সংগ্রহ, সংস্কৃত কলেজ, মেট্রোপলিটান স্কুল, ব্রিটিশ শাসকের সামনে কখনও বঙ্কিম না হওয়া মেরুদণ্ডের আদর্শ, গৌরবান্বিত বাংলা ও আবেগপূর্ণ ইংরাজিতে আপনার অজস্র পত্রালাপ, বাঙালির অকৃতজ্ঞতা ও ঔদাসীন্যে আহত আপনার বাস ভূমির সন্তান সাঁওতালদের সঙ্গে, তাদের সঙ্গে বন্ধুতা, তাদের সাহচর্যে নিজেকে আহ্লাদিত করে নেওয়া, অকুতোভয় চিকিৎসকের দায়িত্ব পালন — এত অভিজ্ঞতা, গুণ, কর্মবৈচিত্র্যের সমাহার — এবং প্রগাঢ়, আকাশচুম্বী করুণার সঙ্গে তার সন্নিবেশ - বাঙালী কি দেখেছে কোনও দিন? তাই দুর্বোধ্য অহমিকার আঘাত এখনও প্রথম আপনার দিকেই নিক্ষিপ্ত হয়। যা আমরা বুঝতে পারিনা, তাকে নিশ্চিহ্ন, অবলুপ্ত করে আমাদের শান্তি নেই। কিন্তু যা ওরা জানেনা; বস্তু-গত চিহ্নে আপনি নেই, বিদ্যাসাগর। তাই, মূর্তি ভেঙে টুকরো করে, কুৎসার কালি ছিটিয়ে যা টেনে নামানো যায়না, তা হল বিদ্যাসাগর নামের 'আইডিয়া' বা মানব-সভ্যতার ধারণাটিকে। তা করতে গেলে বুকের ভিতর থেকে টেনে বার করে নিতে হয় আপনাকে, লক্ষ লক্ষ জীবন ও চেতনার গভীরে প্রবেশ করে, এবং কে না জানে, তা আজ আর সম্ভব নয়। দুটি শতাব্দী আপনার হাত ধরে পার হয়ে আসার পর।

আমাদের জীবনের অধিকার দিয়ে, সংসারে সম্মানিত অবস্থান দান করে এবং শিক্ষিত, স্বনির্ভর জীবনের উপহার দিয়ে আপনি নিজের কর্মগৌরবকে দিয়ে গেলেন অন্তহীন প্রবহমানতা।

বঙ্গরমণীর প্রণাম আপনাকে, বিদ্যাসাগর।।

তথ্যসূত্র

করুণাসাগর বিদ্যাসাগর। ইন্দ্র মিত্র। ২০১৯ (১৯৬৯)

অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মমতা চৌধুরী রায়

বঙ্গপ্রদেশে হিন্দু বঙ্গসন্তানদের জন্য কোম্পানি বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত প্রথম সরকারি কলেজ 'গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজ'। এই কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা। কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮২৪) পর পঁচিশ বছরেরও অধিক সময় অতিক্রান্ত হয়েছিল অধ্যক্ষর পদ সৃষ্টি (১৮৫১) করতে। বিদেশি সরকারের এই উদাসীন আলস্য ভাঙতে কাজে লাগল প্রথম অধ্যক্ষ মহাশয়ের ইচ্ছাশক্তি আর উদ্যম। মাত্র একত্রিশ বছরের ঈশ্বরচন্দ্র দায়িত্ব নিলেন প্রায় তাঁরই সমসাময়িক আল্মা মাতেরের। সংস্কৃত কলেজ যেন এই দিনটির অপেক্ষায় ছিলেন — কবে সেই মেধা ও কর্মশক্তিতে অদ্বিতীয় ছোটঘাট গ্যাঁট্টাগোঁট্টা সবল শরীরের গোঁয়ার গোবিন্দ ছেলেটি যাকে সতীর্থরা কৌতুক করে 'ঠিপ্‌লে' নামে ডাকত, তার বৃষস্কন্ধে এই প্রাঙ্গনের সকল ভার তুলে নেবে। অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের কার্যকলাপ ধীর চিত্তে অনুধাবন করলে মুগ্ধ আশ্চর্য বোধে হৃদয় প্লাবিত হয়। প্রখর মেধা, অতুল পাণ্ডিত্য, তীব্র সংস্কার মুখী চেতনা, সুদূর প্রলম্বিত দৃষ্টিশক্তি, অক্লান্ত পরিশ্রম, বজ্রকঠিন প্রতিজ্ঞা, অটল আত্মবিশ্বাস আর রাজকীয় মর্যাদাবোধ নিয়ে নির্মোহ যুগপুরুষটি অধ্যক্ষতার যে বেঞ্চমার্ক নির্মাণ করেছিলেন সেটিকে স্পর্শ করার সামর্থ্য আর কে দর্শাতে পেরেছেন!

ঊনবিংশ শতক বাংলার ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ। প্রতীচ্যের সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পকলার প্রতি তৎকালীন ভদ্রসমাজের আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। হিন্দু সমাজের সংস্কার ও ধর্মাচরণবিধিকে স্পর্দ্ধিত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে একদল নব্যযুবক যা কিছু নতুন ও প্রতীচ্যের তাকে নির্বিচারে অতি সমারোহে গ্রহণ করবার প্রকাশ্য প্রয়াস প্রদর্শন করতে শুরু করল। না বুঝেই হীরের টুকরো ডিরোজিও সাহেবকে তাঁরই শিষ্যদের এই উগ্রদলটি প্রাণপ্রিয় শিক্ষককে দোষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ফেলল। আবার এদের আতিশয্যে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজও সনাতন সংস্কার

সমূহকে ধর্মজ্ঞানে রক্ষা করতে তৎপর হয়ে উঠলেন। এই দুই প্রলম্বিত বিপ্রতীপ ভাবধারার সমন্বয় সাধনে প্রাণপাত করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। সংস্কারমুখী সমন্বয় দৃষ্টির উৎস ছিল সে যুগের কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজকে সেরকমই একটি পীঠস্থানে উন্নীত করেছিলেন। ১৮১১ সালে লর্ড মিন্টো ভারতের মত প্রাচীন সভ্য দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে নবদ্বীপ ও ত্রিহূতে দু'টি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। দীর্ঘ এক দশকের নীরবতার পর তদানীন্তন সরকারের জুনিয়র সেক্রেটারি বিদগ্ধ প্রাচ্যবিদ হরেস হেম্যান উইলসন যুক্তি দেখালেন মফঃস্বলে দুটির পরিবর্তে রাজধানী কলকাতার কেন্দ্রস্থলে একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করলে বহুছাত্র উপকৃত হবে এবং পরিচালনার সুবিধা হবে। যুক্তিটি গ্রাহ্য হল এবং ১৮২১ সালের সরকারি প্রস্তাবে গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজের জন্য বার্ষিক পঁচিশ হাজার টাকা মঞ্জুরের সাথে সাথে একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য দিক্‌দর্শন নির্ধারিত করে দেওয়া হ'ল — ''সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা এই কলেজের আশু উদ্দেশ্য হলেও, ক্রমশঃ হিন্দুদের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইংরাজি ভাষাশিক্ষারও এই স্থান উপায়স্বরূপ হবে''। বণিক শাসক বুঝেছিলেন ব্যবসায় বৃদ্ধির জন্য চাই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান — সমাজের নাড়ি বুঝে কর্মসাধন এই ছিল তাদের মন্ত্র। ইতিমধ্যে হিন্দুপ্রধানদের উদ্যোগে ও আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হিন্দু কলেজ — এই উদ্যোগের প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন অন্তরালে রামমোহন রায় আর সম্মুখে ডেভিড হেয়ার প্রমুখ। বাংলার মেধাবী যুবসমাজকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে মননশীল, উন্মুক্ত হৃদয়ের কর্মোদ্যোগী করে তুলবার নব্য শিক্ষা চাহিদার বিষয়টি সরকার আঁচ করতে পারলেও রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় এড়িয়ে যেতে যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন। তাই সংস্কৃত মাধ্যমে শিক্ষাদানের বিরুদ্ধে রামমোহন রায়ের যুক্তিপূর্ণ বিস্তারিত পত্রটি মোটেই বিবেচনাযোগ্য মনে করা হ'ল না। শুধু শিক্ষাক্ষেত্রে এক ভারসাম্য রক্ষার নীতি চলতে থাকল। এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে সমন্বয়ের পথে আধুনিক সংস্কার সাধনে সবচেয়ে তৎপরতা দেখিয়েছিলেন অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর — তাঁর কলেজে, বিদ্যালয় পরিদর্শকরূপে এবং পরবর্তীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনায় জড়িত থেকে। তিনি শাস্ত্র ত্যাগ করেন নি, শাস্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা করেছিলেন।

দুই

১৮২৩ সালে 'জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্স্ট্রাকশন' গঠিত হ'ল এবং এই কমিটির উপর আশু দায়িত্ব বর্তাল কলকাতা সংস্কৃত কলেজকে অবিলম্বে প্রতিষ্ঠা করা। ১৮২৪ সালের পয়লা জানুয়ারি ৬৬ নং বহুবাজারের ভাড়া বাড়িতে কলেজ চালু হ'ল। ১৮২৬ সালে সংস্কৃত কলেজকে বর্তমান নিজস্ব ভবনে অধিষ্ঠিত করার সাথে সাথে পাশ্ববর্তী দু'টি ভবনে স্থান পেল হিন্দু কলেজ ও হিন্দু স্কুল। দু'টি ভিন্ন শিক্ষাপ্রণালী একই প্রাঙ্গণে অনুশীলিত হতে থাকল — ভিন্ন প্রশাসক ও ভিন্ন ভাবধারার ছাত্রদের মধ্যে ঠোকাঠুকির গম্ভীর ও চপল বহু দৃষ্টান্তের ইতিবৃত্ত সেই সময়টাকে যেন আরও জীবন্ত করে তোলে। সংস্কৃত কলেজের প্রশাসনের দায়িত্ব অর্পিত ছিল সেক্রেটারির উপর। সম্পূর্ণ অবৈতনিক বিদ্যালাভের সুযোগের সাথে দরিদ্র ছাত্রদের আর্থিক বৃত্তির ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। বীরসিংহ গ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পরিবারের দূরন্ত মেধাবী অষ্টম বর্ষীয় পুত্রকে পিতা ঠাকুরদাস সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করলেন ১৮২৯ সালে। হিন্দু কলেজ সেসময় ডিরোজিও'র পদার্পণে উজ্জীবিত। অনুসন্ধিৎসু সচেতন বালকটি দুই কলেজের দু'টি ধারাকে খুব কাছ থেকে অবলোকন করবার সুযোগ পেয়েছিল। আধুনিকতার এই পার্শ্ব স্পর্শ ঈশ্বরচন্দ্রের মননশীলতায় পূর্ণমাত্রায় প্রবেশ করল ১৮৪১-১৮৪৫ সময় কালে যখন তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদার হিসাবে নব্য সিভিলিয়নদের শিক্ষাদান ও তাঁদের থেকে গ্রহণেও মগ্ন ছিলেন। ক্রমশঃ নিজগুণে ও পরিশ্রমে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারি মার্শাল সাহেবের দক্ষিণ হস্ত হয়ে উঠলেন তরুণ পণ্ডিত। তাঁর এই পরিচিতির সূত্রেই ঈশ্বরচন্দ্র যুক্ত হলেন সংস্কৃত কলেজের প্রশাসনের সাথে। মার্শালর সাহেব কিছুকাল সংস্কৃত কলেজের সম্পাদকের অতিরিক্ত দায়িত্ব বহন করেছিলেন। কলেজটির উন্নতি সাধনে যে কঠোর পরিশ্রম, পাণ্ডিত্য ও মননশীলতা এবং এক দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন সেটি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। ফলে তাঁরই সময়ে সৃষ্ট সহকারি সম্পাদকের পদটি যখন রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যুতে শূণ্য হ'ল সাহেব কাল বিলম্ব না করে মাত্র ২৫ বছরের ঈশ্বর পণ্ডিতকে রাজি করালেন ঐ পদ গ্রহণ করতে। ইতিমধ্যে সংস্কৃত কলেজের স্থায়ী সম্পাদক হয়েছেন নিম্ন আদালতের জজ সাহেববাবু রসময় দত্ত। তাঁরই কাছে ঈশ্বরচন্দ্র আবেদন পত্র পাঠালেন। মাসিক ৫০ টাকা বেতনে সহকারি সম্পাদক রূপে সংস্কৃত কলেজের প্রশাসনে তাঁর যোগদান ১৮৪৬ সালের এপ্রিল

মাসে। এই অভিজ্ঞতা সুখের হয় নি। তরুণ ঈশ্বরচন্দ্র কোমর বেঁধে নেমে পড়েছিলেন সংস্কৃত কলেজের গুণগত মানোন্নয়নের কাজে। শিক্ষক-ছাত্রদের হাজিরার ওপর নজরদারি, প্রতি মাসে প্রত্যেক শ্রেণির পরীক্ষা গ্রহণ করে ফলাফল নির্দিষ্ট সময়ে সেক্রেটারির কাছে জমা দেওয়া, প্রশ্নপত্র তৈরী করা ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করেও মাত্র তিনমাসের মধ্যে একটি অত্যন্ত শ্রমসাধ্য কাজ সুসম্পন্ন করলেন — আধুনিক উন্নতর পাঠপ্রণালীর বিস্তারিত রূপরেখা সম্পাদক রসময় দত্তের কাছে পেশ করলেন। এই তীব্র গতিময়তা স্থবির সম্পাদকের পছন্দ হ'ল না — সহকারির রিপোর্টটি ফাইলের নীচে ঠাঁই পেল। কিন্তু মার্শাল সাহেবের সাথে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে ঈশ্বরচন্দ্র রিপোর্টটি সাহেবের গোচরে এনে পরামর্শ চেয়েছিলেন। সাহেব প্রকাশ্যে লিখিত প্রশংসা করে বসলেন — "The Assistant Secretary consulted me some time ago on a plan of study which he had prepared at a great sacrifice of time and labour. I would strongly recommend the Council (of Education) to give it a trial. If I am not mistaken the result would prove highly satisfactory."

ব্যাস, তরুণ সহকারিটি পরিপক্ক সেক্রেটারি মহাশয়ের দ্বেষানলে পড়লেন! ঈশ্বরচন্দ্রের সমস্ত উদ্যোগেই হিন্দু কলেজের পৃষ্ঠপোষক রসময় দত্ত যেন সর্ষেতে ভূত! 'চরৈবেতি' মন্ত্র যাঁর জীবনের সকল প্রেরণার উৎস, সেই বীরপুরুষ কেন বদ্ধ পরিবেশে আট্‌কা থাকবেন? দরিদ্র পরিবারের সব দায়িত্বের কথা মনে রেখেও ঈশ্বরচন্দ্র পদত্যাগ করলেন। শোনা যায় রামবাগানের দত্ত পরিবারের সম্পন্ন সম্পাদক মহাশয় জনান্তিকে মন্তব্য করেছিলেন, চাক্‌রি ছেড়ে ঈশ্বর খাবেটা কি? কথাটি ঈশ্বরের কানে তুলতে দেরী হয় নি। ঈশ্বরচন্দ্রের বিদগ্ধ ছাত্র আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য গর্ব করে এই প্রসঙ্গ উদ্ধার করেছেন — ঈশ্বরচন্দ্র সংবাদবাহককে উত্তর দিয়েছিলেন, 'বোলো, মুদির দোকান করে খাব!'

তিন

এই মহাজীবনের প্রতিক্ষণই কর্মময়। সরকারি কর্ম ত্যাগ করে তিনি সংসারের সমস্ত আর্থিক দায় ঋণ করেও হাস্যমুখে বহন করেছিলেন। ১৮৪৯ সালে পুনরায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেড রাইটারের পদে মাসিক আশি টাকা বেতনে যোগদান করলেন। মধ্যবর্তী সময়ে মনোসংযোগ ছিল গ্রন্থাদি রচনায়। হয়তো বা সংস্কৃত কলেজের অসমাপ্ত সংস্কারও তাঁকে বিদ্ধ করত। আবার এল উচ্চতর কর্তৃপক্ষের

সাদর আহ্বান- সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক হয়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে যোগদান করতে অনুরোধ করলেন শিক্ষা কাউন্সিলের সেক্রেটারি ডঃ ময়েট। সে সময়ে কাউন্সিলের সর্বাধ্যক্ষ (প্রেসিডেন্ট) ছিলেন শিক্ষানুরাগী মহামতি বেথুন সাহেব। ঈশ্বরচন্দ্রের সতীর্থ পণ্ডিত মদন মোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের পদটি ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদের জজ পণ্ডিত হয়ে যোগদান করায় এই শূন্যতা। বিদ্যাসাগর তাঁর পূর্ব তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বিস্মৃত হ'ন নি। তখনও সেই বাবু রসময় দত্তই সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি। আবার কলেজের ম্রিয়মান মূর্তিটিও ঈশ্বরচন্দ্রের অসহ্য। তিনি এক পত্রে শিক্ষা কাউন্সিলকে স্পষ্ট জানালেন অধ্যাপকের পদ গ্রহণে আপত্তি নেই, যদি অদূর ভবিষ্যতে অধ্যক্ষের পূর্ণ দায়িত্ব ও ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হয়। যাই হোক ১৮৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক পদে যোগদান করলেন। শিক্ষা কাউন্সিলের অনুরোধে কলেজের প্রকৃত অবস্থা এবং কি কি ব্যবস্থা নিলে সর্বাঙ্গীন উন্নতি হতে পারে এ বিষয়ে অতি সত্ত্বর ১৬ই ডিসেম্বর একটি সুচিন্তিত রিপোর্ট পেশ করলেন। বাবু রসময় দত্ত সুযোগ পেলেন না পুনরায় এই রূপরেখাটিকে ফাইল বন্দি করে ফেলার। পরিবর্তে শিক্ষা প্রশাসনের উচ্চতম মহলে পরিচিতির সূত্রে দত্ত মহাশয় হয়তো অবগত হয়েছিলেন অধ্যক্ষ পদ সৃষ্টিতে সরকারি সদিচ্ছা ও উদ্যোগের কথা। রসময় দত্ত পদত্যাগ করলেন। ইতিমধ্যে শিক্ষা কাউন্সিলের সর্বাধ্যক্ষ বেথুন সাহেবের সাথে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা তৈরী হয়েছে। তখন বেথুন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগরের অসামান্য প্রত্যয়ী শিক্ষা ব্যবস্থাপনার শক্তিকে সাহেব কাজে লাগাচ্ছেন। গুণগ্রাহী বেথুন ও ডঃ ময়েট স্থির জানতেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হ'লে প্রাণপাত করবেন সরকারি কলেজটির পুনর্গঠনে। শিক্ষা কাউন্সিল পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মাকে সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যক্ষরূপে এইভাবে সুপারিশ করেছিলেন — ''বাবু রসময় দত্তের পদত্যাগে এই প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠনের একমাত্র অন্তরায় দূর হ'ল। এই সময়ে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত অধ্যক্ষ পদের জন্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। একদিকে তিনি ইংরাজি ভাষায় অভিজ্ঞ, অন্যদিকে সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণির পণ্ডিত। উপরন্তু, তাঁর মত উদ্যমশীল, কর্ম্মনিপুণ, দৃঢ়চিত্ত লোক বাঙালির মধ্যে দুর্লভ ....।'' সরকার সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক ও সহকারি সম্পাদকের পদদ্বয় বিলুপ্ত করে অধ্যক্ষের পদ সৃষ্টি

করলেন — মাসিক দেড়শত টাকা বেতনে। বেতন বাবদ সরকারি খরচ এক পয়সাও বৃদ্ধি পেল না। মাত্র, একত্রিশ বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যক্ষরূপে যোগদান করলেন ২১ জানুয়ারি, ১৮৫১।

দুর্ভাগ্যের বিষয় যে পদটি তাঁরই আগ্রহ উদ্দীপনায় সৃষ্ট হ'ল সেই পদে বিদ্যাসাগরের নিয়োগ নিয়ে অসূয়াকাতর বঙ্গসন্তানদের প্রতিভূ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ তাঁর প্রণীত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনীগ্রন্থে একটি উদ্ভট গল্পের অবতারণা করেছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ জানান, ''জনশ্রুতি যদি সত্য হয়", তবে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ শূন্য হওয়ায় বেথুন সাহেব তাঁর অতি প্রিয় তর্কালঙ্কার মহাশয়কে ঐ পদে যোগদানের জন্য আহ্বান করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের নাম সুপারিশ করেন অতএব ঈশ্বরচন্দ্রের অধ্যক্ষ পদলাভ ইত্যাদি। কটূ ও মিথ্যা ''জনশ্রুতি" বিদ্যাসাগরের সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এই তো শুরু! ইতিহাসনিষ্ঠ বিচক্ষণ মানুষটি এ বিষয়ে প্রকৃত সত্যকে ডকুমেন্ট করে যাবার তাগিদ অনুভব করেছিলেন। তাঁর প্রণীত ''বেতাল পঞ্চবিংশতি" গ্রন্থের একাদশ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত তাঁর বক্তব্যের কিয়দংশ উদ্ধার করা হ'ল — 'আমি যে সূত্রে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতাপদে নিযুক্ত হই, তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত এই — মদনমোহন তর্কালঙ্কার, জজ পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া মুর্শিদাবাদ প্রস্থান করিলে, সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। শিক্ষা সমাজের তৎকালীন সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত ডাক্তার ময়েট আমাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। আমি নানান কারণ দর্শাইয়া, প্রথমতঃ অস্বীকার করি। পরে, তিনি সবিশেষ যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করাতে, আমি কহিয়াছিলাম, যদি শিক্ষা-সমাজ আমাকে প্রিন্সিপালের ক্ষমতা দেন, তাহা হইলে আমি এই পদ স্বীকার করিতে পারি। তিনি আমার নিকট হইতে ঐ মর্মে একখানি পত্র লিখাইয়া লয়েন। তৎপরে, ১৮৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে, আমি সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হই। সংস্কৃত কলেজের বর্তমান অবস্থা, ও উত্তরকালে কিরূপ ব্যবস্থা করিলে। সংস্কৃত কলেজের উন্নতি হইতে পারে, এই দুই বিষয়ে রিপোর্ট করিবার নিমিত্ত আমার প্রতি আদেশ প্রদত্ত হয়। তদনুসারে আমিই রিপোর্ট সমর্পণ করিলে, ঐ রিপোর্ট দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া শিক্ষাসমাজ আমাকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা কার্য সেক্রেটারি ও এসিস্টান্ট সেক্রেটারি এই দুই ব্যক্তি দ্বারা নির্বাহিত হইয়া আসিতেছিল; ঐ দুই পদ রহিত

হইয়া, প্রিন্সিপালের পদ নূতন সৃষ্টি হইল।' উক্ত যোগেন্দ্রবাবুর ''জনশ্রুতি''র সারসত্য যে কিছুই নাই সেকথাও স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছিলেন। আমরা পূর্বেই অধ্যক্ষ পদে ঈশ্বরচন্দ্রের নির্বাচনের বিষয়ে শিক্ষা সংসদের বিবৃতি উদ্ধার করেছি — ''...... (পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা) একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। তাঁর মত উদ্যমশীল, কর্ম্মনিপুণ, দৃঢ়চিত্ত লোক বাঙালির মধ্যে দুর্লভ..।'' সভাপতি মহামতি বেথুনের মত বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁর দুই অতি প্রিয় হিন্দু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র ও মদন মোহনের চারিত্রিক গঠন বৈপরীত্য যথার্থই পাঠ করতে পেরেছিলেন। ঐ বিষয়ে দুই অধ্যাপকের বিদগ্ধ শিষ্য আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মন্তব্য স্মরণ করলে সত্য ভাস্বর হয়ে ওঠে, — ''বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর দুইজনেই বোধহয় কাছাকাছি ছিলেন, কিন্তু চরিত্র অংশে আস্‌মান জমিন্ প্রভেদ। যাহাকে backbone কহে, বিদ্যাসাগরের তাহা পূর্ণমাত্রায় ছিল, কিন্তু সে বিষয়ে তর্কালঙ্কার হয়তো vertebrate শ্রেণীর অন্তর্গত হয়েন কিনা সন্দেহ।''

চার

সংস্কৃত কলেজের উপযুক্ত সংস্কারের মাধ্যমে পুনর্গঠন ও যুগোপযোগী ব্যবস্থাপনার পূর্ণ দায়িত্ব ও অধিকার নিয়ে একত্রিশ বছরের যুবক ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা প্রথম অধ্যক্ষের আসনে অধিষ্ঠিত হলেন।

এরপর ১৮৫১ থেকে ১৮৫৩ সময়কাল প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত কলেজের প্রায় নবনির্মাণের এক উজ্জ্বল ইতিহাস। সর্বাগ্রে অতি আবশ্যকীয় দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত সাহিত্যের পুস্তকগুলির কলেবর পরিবর্তন করে অধ্যক্ষ পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করলেন। বহুব্যবহারে ছিন্ন গলিত প্রাচীন অমূল্য পুঁথিগুলির মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করে ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্র-শিক্ষক সবার প্রভূত প্রশংসা লাভ করলেন।

ছাত্র অনুকূল আধুনিক পাঠক্রম প্রণয়নে ঈশ্বরচন্দ্রের মত উদ্যমী শিক্ষাবিদ চির বিরল। ইতিপূর্বে সহকারি সম্পাদকরূপে ও পরে অধ্যক্ষ পদলাভের প্রাক্কালে বিদ্যাসাগর উপযুক্ত পাঠপ্রণালীর বিস্তারিত রূপরেখা রচনা করেছিলেন। এবার রূপায়ণ শুরু হ'ল। প্রথমেই ব্যাকরণ শ্রেণির পাঠ্যবই বোপদেব রচিত দূরায়ত্ত ''মুগ্ধবোধ'' কে সরিয়ে তাঁর প্রণীত বোধগম্য ব্যাকরণ কৌমুদী ও উপক্রমণিকাকে অবশ্যপাঠ্য করলেন। তিনবছর ধরে 'মুগ্ধবোধ' মুখস্থ করেও অধিকাংশ ছাত্র সংস্কৃত ব্যাকরণে যথেষ্ট পারদর্শী হতে পারত না। ফলে সাহিত্য শ্রেণিতে অসুবিধায়

পড়তে হ'ত। বিদ্যাসাগর বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়নের সাথে সাথে প্রয়োগশৈলি শেখানোর জন্য সংস্কৃত গদ্য ও পদ্যের নির্বাচিত সংকলন ''ঋজুপাঠ''কে পাঠক্রমের অন্তর্গত করলেন। ব্যাকরণের সাথে উচ্চসাহিত্যের নিবিড় যোগটি ছাত্ররা এবার বেশ ধরতে শুরু করল। অধুনা বহুল চর্চিত Learning Outcome based Cauriculam Framework (LOCF) রচনার প্রথম ও কার্যকরী নিদর্শন বোধহয় অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র এইভাবে প্রথম নির্মাণ করেছিলেন। শুধু ছিল না কোন গালভরা নাম ও বহু ঘন্টার পেডাগজি চর্চা। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC) বিষয়ভিত্তিক LOCF রচনার এক মহাযজ্ঞ শুরু করেছেন। জানি না এই প্রয়াস কবে এবং কতদূর সিদ্ধ হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছাত্রদের যুগোপযোগী সক্ষমতা প্রদান। একটি সমাজের শিক্ষা চাহিদা নিয়ত পরিবর্তিত হয়। অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর সেই যুগে এই বিষয়টিকে আপোষহীন গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজে পাঠের সুবাদে তিনি জানতেন ইংরাজিতে এই কলেজের ছাত্ররা কতটা দুর্বল থেকে যেত। সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে তিনি ছাত্রোত্তর জীবনে ইংরাজি ও হিন্দিতে পাঠ গ্রহণ করে অসামান্য ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজে ইংরাজি পাঠক্রম চালু করার পূর্ব প্রয়াস কার্যকরী হয়নি। দৃঢ়চেতা অধ্যক্ষ ১৮৫৩ সালে ইংরাজি বিভাগকে বিস্তৃত ও সুনিয়ন্ত্রিত করে ইংরাজি পাঠকে আবশ্যিক করলেন। তাঁরই উদ্যোগে অধ্যাপকরূপে যোগদান করলেন হিন্দু কলেজের মেডেল প্রাপ্ত ছাত্র প্রসন্ন কুমার সর্বাধিকারী (পরবর্তী সময়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ)। একে একে আরও চারজন বিদগ্ধ ইংরাজি শিক্ষক বিভাগের গৌরব বৃদ্ধি করলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষায় যখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররাও অন্যান্য কলেজের ছাত্রদের সাথে সমকক্ষতায় কৃতকার্য হ'ল, অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র পরম তৃপ্তি লাভ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন যুগান্তরের দৃশ্যপটে সংস্কৃতে গণিত পাঠের অর্থ ছাত্রদের বৃথা কালক্ষয়। তিনি অধ্যপক শ্রীনাথ দাসকে নিয়ে এলেন ইংরাজিতে গণিত পাঠ চালু করার জন্য। তাঁরই উৎসাহে রচিত হয়েছিল গণিতের নতুন পাঠ্যবই।

নতুন পাঠপ্রণালীতে সংস্কৃত কলেজে পঠন-পাঠন চলতে থাকল। একই সাথে অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর বিদ্যালয় শিক্ষার বিস্তারে অসামান্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৮৫৪ সালে শিক্ষা সনদ গৃহীত হলে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের উদ্যোগ

বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল। বিদ্যাসাগর বিদ্যালয় পরিদর্শক রূপে মেদিনিপুর, বর্দ্ধমান, হুগলি ও নদিয়া এই চার জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন। তাঁর মাসিক বেতন দুই পদ মিলিয়ে পাঁচশত টাকা ধার্য হ'ল। বিদ্যালয় শিক্ষার সাথে উচ্চশিক্ষার সমন্বয় সাধনে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা আমরা বিস্মৃত হই। এর প্রত্যক্ষ নিদর্শনরূপে তাঁর রচিত পাঠ্য পুস্তক সমূহের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তিনিই প্রথম সম্যক বুঝেছিলেন শিক্ষা বিস্তারের কার্যকারিতা নির্ভর করে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের উপর। অসামান্য শিক্ষাবিদ বিদ্যাসাগর কঠোর পরিশ্রমে বহু পাঠ্যবই রচনা করলেন — জীবন চরিত, বাঙ্গালার ইতিহাস, মহাভারতের উপক্রমণিকা, বোধোদয়, ব্যাকরণ কৌমুদী, ঋজুপাঠ, সংক্ষিপ্ত লঘু, কুমার, ভারবী ইত্যাদি ইত্যাদি। নবদ্বীপের তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় বাংলায় প্রথম ভূগোল লিখলেন। প্রসন্ন সর্বাধিকারী বাংলায় পাটিগণিত প্রণয়ন করলেন। সে এক আশ্চর্য শিক্ষা কেন্দ্রিক গবেষণার ফিল্ড ওয়ার্কের সময়। কেন্দ্রবিন্দুতে অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা।

বিদ্যাসাগর প্রকৃত অর্থেই বহুমূর্তি ছিলেন। সচেতন অধ্যক্ষ জানতেন সহকারি সম্পাদকের কাজটিও তাঁকে করতে হবে। নজর পড়ল হাজিরার দিকে। শিক্ষক মণ্ডলীর অধিকাংশেরই তিনি ছাত্র ছিলেন। তাঁদের বিলম্বে আমগন নিয়ে সরাসরি কিছু বলতে দ্বিধা হ'ত। CCTV তো ছিল না, কিন্তু কলেজ ভবনের দ্বিতলে অধ্যক্ষ মহাশয় বাস করতেন। সকাল সাড়ে দশটা বাজলেই তিনি প্রবেশদ্বারের দিকে নজর রাখতেন। কারুর বিলম্ব দেখলেই ত্বরিতে নীচে নেমে কুণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন করতেন, 'এই এলেন?' এক সপ্তাহের মধ্যে চিত্র পরিবর্তন হ'ল। শুধু বৃদ্ধ প্রখ্যাত অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকে তিনি কিছুই বলতে পারতেন না, নীরবে হেঁটমুণ্ডে অপেক্ষা করতেন। একদিন তীব্র অভিমানে বৃদ্ধ শিক্ষক বলে উঠলেন, 'তুমি যে কিছু বল না এতেই সর্বনাশ! ... (নতুবা) জবাব দিতে পারতাম, কি জন্য দেরি হয় জানাতে পারতাম। আচ্ছা, মরি আর বাঁচি, কাল থেকে যথা সময়ে আসব'।

আবার ছাত্রদের অনিয়মিত হাজিরার নিয়ন্ত্রণে অধ্যক্ষ অন্য উপায় নিলেন। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সংস্কৃত কলেজে পাঠগ্রহণ সম্পূর্ণ অবৈতনিক ছিল। ফলে ছাত্ররা বিনা প্রতিবন্ধে কলেজে প্রবেশ করতে পারত এবং সুবিধা পেলে অনেকেই ইংরাজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে চলে যেত। কেউ কেউ আবার ভর্তি হয়ে উধাও হয়ে যেত। হাজিরা খাতা থেকে নাম কাটা যাবারও পরে পুনরায় অভিভাবক সহ কারুর কারুর আবির্ভাব হত — ক্রন্দন, ক্ষমা প্রার্থনা আর ফলস্বরূপ বিনামূল্যে পুনর্বহাল।

বিনামূল্যের অমূল্য বিদ্যার এই অবহেলা অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্রের সহ্য হ'ল না। বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে তিনি ১৮৫২ সালে প্রবেশ ও পুনঃপ্রবেশ এর জন্য দুই টাকা দক্ষিণা ধার্য করলেন। এরপর ১৮৫৪ সালে এক টাকা মাসিক ছাত্রবেতন চালু হ'ল। এবার অভিভাবকরা সচেতন হলেন। বেড়ে গেল ছাত্র হাজিরার হার। আজ মনে হয় একই সাথে অধ্যক্ষ মহাশয় সংস্কৃত কলেজকে আর্থিকভাবে কিঞ্চিত স্বাবলম্বী করতে চেয়েছিলেন। একটি গ্রন্থ অথবা আকস্মিক মেরামতির জন্যও সরকারের দ্বারস্থ হতে হ'ত। বিচক্ষণ অধ্যক্ষ বিলক্ষণ জানতেন বেন্টিঙ্ক, মেটকাফ, ক্যানিং, স্যার হাইড, বেথুন, ময়েট এঁদের সমকক্ষ শিক্ষানুরাগী দরদী মানুষ শাসকগোষ্ঠিতে চিরকাল মিলবে না। ব্যয়সঙ্কোচের জন্য যখনই রাজকর্মচারীদের দৃষ্টি পড়বে, বিনা বেতনের পাঠ আপনি উঠে যাবে। উপরন্তু অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ও কাটছাট করা হবে। সেই দুর্দিনের জন্য দূরদৃষ্টি সম্পন্ন অধ্যক্ষের পূর্বপ্রস্তুতি।

শিক্ষার সাথে সমাজসংস্কারের গভীর সম্পর্কটি বিদ্যাসাগর প্রতি মুহূর্তে অনুভব করতেন। সংস্কৃত কলেজে পাঠের অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য শ্রেণির মধ্যে। অধ্যক্ষ পদলাভের কয়েক মাস পরেই ১৮৫১ সালের জুলাই মাসে কুলীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র কায়স্থ ছাত্রদের জন্য প্রবেশ দ্বার উন্মুক্ত করলেন। প্রবল বিরোধিতাকে অতিক্রম করে অধ্যক্ষ মহাশয় ১৮৫৪ সালে জাতপাতের সব নিষেধাজ্ঞা তুলে সমস্ত শ্রেণির হিন্দু ছাত্রদের সংস্কৃত কলেজে পাঠগ্রহণের অধিকার দিলেন। বিদেশী বণিক শাসককূল সহজে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজকে ঘাটাতে চাইতেন না। হিন্দু সমাজের সংগ্রামী ভূমিপুত্রদ্বয়ের হাত ধরে বিদেশী সরকার সতীদাহ প্রথা নিরোধক আইন (১৮২৯) ও পরবর্তীতে বিধবাবিবাহ আইন (১৮৫৬) পাশ করেছিলেন। রামমোহন বিদ্যাসাগরও মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন অত্যাচারী ভোগী রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে মানুষের ন্যূনতম অধিকারগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করতে লাগবে বিদেশী শাসকের সহায়তা। বিদ্যাসাগরের 'সাহেব প্রীতি' এবং বড়মানুষদের বিদ্যাসাগর-প্রীতির মূলে যে বিদ্যাসাগরের শাসকগোষ্ঠির প্রীতিলাভ এসব বিষয়ে নানান বক্রোক্তি হাওয়ায় ভাসত। সমকালের বিচার অসম্পূর্ণ ও প্রায়শই ভ্রান্ত হয়। বিদ্যাসাগরের সাহেবদের সাথে ঘনিষ্ঠতা নির্মাণের প্রধান প্রেরণা ছিল তাঁরই সমাজের রুদ্ধ জানলা দরজা উন্মুক্ত করে সূর্যালোকের প্রবেশ সুনিশ্চিত করা। সংস্কৃত কলেজে জাতপাতের নিষেধ উঠে গেল। হয়তো অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরই পরোক্ষে সরকারকে প্রেরণা দিলেন — পরের বছর ১৮৫৫

সালে হিন্দু কলেজকে যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত করে পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনা হ'ল, প্রবেশ দ্বার খুলে গেল সব ধর্মের ছাত্রদের জন্য। কে জানে!

অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের আধুনিক মনস্কতার অজস্র উদাহরণ মণিমানিক্যের মত আজও দ্যুতিময়। প্রাচীন রীতি অনুযায়ী সংস্কৃত কলেজ প্রতি অষ্টমী ও প্রতিপদে বন্ধ থাকত। বিদ্যাসাগর মহাশয় পরিবর্তে সপ্তাহে রবিবার ছুটি চালু করলেন। ছাত্রদরদী মানুষটি খেয়াল করলেন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে ছাত্রদের শারীরিক অসুস্থতা ও মানসিক অবসাদ বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে যে গ্রীষ্মকালীন ছুটির ব্যবস্থা চালু আছে সেটি অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রবর্তিত হয়েছিল।

দেড়শো বছরেরও আগে এই ক্ষণজন্মা অধ্যক্ষ ছাত্রদের কর্মসংস্থানের জন্য কি উদ্যোগটাই না গ্রহণ করতেন! সে সময়ে হিন্দু কলেজ ও কলকাতা মাদ্রাসার কৃতবিদ্য ছাত্রদের সরাসরি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিয়োগ করার ব্যবস্থা ছিল। অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৫২ সালে সরকারের কাছে আবেদন করলেন এই একই সুযোগ তাঁর ছাত্রদেরও দেওয়া হোক। প্রস্তাব গৃহীত হ'ল — সংস্কৃত কলেজের প্লেসমেন্টের চিত্র নতুন মাত্রা পেল। আবার যখন জেলায় জেলায় মডেল স্কুল ও বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছিল যথেষ্ট দ্রুততার সাথে অধ্যক্ষ-পরিদর্শক বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের শিক্ষকরূপে বহু কর্মসংস্থান করে দিয়েছিলেন। সে সময়ে NAAC (National Assessment and Accreditation Council) কোথায় ছিল! মূল্যায়ণের মাথাব্যথায় প্লেসমেন্ট নিয়ে মাথা ঘামানোর যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা নিয়ে সুগভীর চিন্তা ভাবনা কতটুকু আছে আমাদের?

সংস্কৃত কলেজকে যেন দুইহাতে উত্তোলন করে এক উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠা করলেন অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ছাত্রাবস্থার কথা স্মরণ করেছেন- 'ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি না থাকিলে তখনকার হিন্দুসমাজের গোঁড়ামির দিনে সংস্কৃত কলেজে এত পরিবর্তন হইতে পারিত না।' সংস্কৃত কলেজের সংস্কার বার্তা বঙ্গপ্রদেশের সীমানা অতিক্রম করে কাশীর সংস্কৃত কলেজে পৌঁছাল। ১৮৫৩ সালের জুলাই-অগাস্টে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে আমন্ত্রিত পরিদর্শনে এলেন কাশীর অধ্যক্ষ বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ ডঃ জে.আর. ব্যালেন্টাইন। পরিদর্শনান্তে শিক্ষা কাউন্সিলকে একটি রিপোর্ট পেশ করলেন ডঃ

ব্যালেন্টাইন — ''ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের খ্যাতির কথা শুনে এবং কলকাতা সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কে তৎপ্রদত্ত রিপোর্ট পাঠ করে তাঁর সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মেছিল, এই সুধী অধ্যক্ষের সাথে সাক্ষাৎ আলাপে আমার সে ধারণা দৃঢ়তর হ'ল ....।'' কিন্তু একই সাথে ব্যালেন্টাইন সংস্কৃত কলেজে ইংরাজি পাঠ আবশ্যিক করার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং তাঁর নিজের প্রণীত গ্রন্থ সহ আরও কয়েকটি গ্রন্থকে পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভূক্ত করবার পরামর্শ দেন। শিক্ষা কাউন্সিল ডঃ ব্যালেন্টাইনের অভিমত অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্রকে প্রেরণ করেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র যুক্তি সহকারে ডঃ ব্যালেন্টাইনের মতামত কেন কলকাতা সংস্কৃত কলেজে আরোপ করা ভ্রান্ত হবে তার উত্তম ব্যাখ্যা দেন। তাঁর এই পত্রের সুফল হয়েছিল। অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা হ'ল। বিদ্যাসাগরের সংস্কার সমূহের কারণে সংস্কৃত কলেজে ছাত্রসংখ্যা ও সুখ্যাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। শিক্ষা কাউন্সিল এই দক্ষ, কর্মযোগী অধ্যক্ষের বেতন দ্বিগুণ করে মাসিক তিনশত টাকা স্থির করলেন ১৮৫৪ সালে জানুয়ারি মাসে।

অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর ছিলেন প্রকৃত অর্থেই বহুমূর্তি। কলেজ প্রাঙ্গণে তিনি কঠোর প্রশাসক। আবার ছাত্রদের মাঝে বালকস্বভাব বন্ধু প্রায়। একদিন কোন এক বাইরের কাজে আটকে পড়ায় বেলা অধিক হয়ে গেল। পথে পড়ল পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের ছাত্রাবাস। বিদ্যাসাগর ত্বরিতে প্রবেশ করে দু'ঘটি জল মস্তকে ঢেলে ছাত্রদের আহার্য থেকে তুলে উদর তৃপ্তি করলেন। সঙ্গে কত গল্প, রং-তামাসা। ছাত্ররা মুগ্ধ আনন্দে মোহগ্রস্ত। আবার ত্বরিতে কলেজে সবার আগে উপস্থিত হয়ে গম্ভীরমূর্তি ধারণ করলেন।

ছাত্রদের বিশৃঙ্খলা কঠোর হস্তে দমনে তিনি আপোষহীন ছিলেন। ইংরাজি শিক্ষক কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের অল্প বয়স হেতু প্রায় সমবয়স্ক ছাত্ররা তাঁর কাছে পাঠ নিতে অস্বীকার করে। ঘোষ মহাশয়কে যারপরনাই অপদস্থ করে বিদায় দেবার ব্যবস্থা করে ফেলে আর কি! অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র জানতে চাইলেন কোন কোন ছাত্ররা এরকম দুঃসাহস দেখিয়েছে। এককাট্টা ছাত্ররা দোষ স্বীকার করল না। ক্ষিপ্ত অধ্যক্ষ শ্রেণির সকল ছাত্রকে বহিষ্কার করলেন। ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ নালিশ গেল। উল্লসিত ছাত্ররা আনন্দে বিহ্বল — 'এবার চাকরি তো যায়, উপায় কি হবে? দাঁড়ীপাল্লা ধরতে হবে যে!' এদিকে কর্তৃপক্ষ জানতে চাইলেন অধ্যক্ষের কোন বক্তব্য আছে কি না। অধ্যক্ষ সাহেবকে জানালেন কলেজের

আভ্যন্তরীণ ক্ষুদ্র বিষয়ে অধ্যক্ষের সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। এসকল বিষয়ে ছাত্ররা কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করবার সুযোগ পেলে তাদের অন্যায় প্রশ্রয় দেওয়া হবে, শৃঙ্খলা থাকবে না। কর্তৃপক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাথে সহমত হয়ে সমস্ত কাগজপত্র তাঁকেই অর্পণ করলেন। ছাত্ররা বিপাকে পড়ে অধ্যাপক ও অধ্যক্ষর কাছে ক্ষমা চেয়ে সে যাত্রায় পরিত্রাণ পেল। সহকর্মীদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারেও অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর ছিলেন আপোষহীন। নিজের কোন ত্রুটি হলে তিনি সানুনয় ক্ষমাপ্রার্থনা করতে পিছু পা হতেন না। একবার তারাকুমার কবিরত্নের সাথে অন্যের প্ররোচনায় তিনি অন্যায় ব্যবহার করেছিলেন। পরে ভুল বুঝতে পেরে নিজে অধ্যাপকের গৃহে গিয়ে সাশ্রুনয়নে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন! প্রশাসকের আত্মদর্শনের এই বেঞ্চমার্ক ক'জনে স্পর্শ করতে পারবে!

পাঁচ

সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষতার কর্মকালটি বোধহয় বিদ্যাসাগরের জীবনের কঠোরতম পরিশ্রমের অধ্যায় এবং একই সালে তাঁর অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের মধ্যগগন। কলেজের জন্য প্রাণপাত, বিদ্যালয় শিক্ষা বিশেষত বালিকা বিদ্যালয়ের প্রসারে নেতৃত্ব দান, উপযুক্ত পাঠ্যবই রচনা আর সর্বোপরি সমস্ত সমাজকে তোলপাড় করে বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ করার আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ। সংস্কৃত কলেজ মধ্যগগনের সূর্যালোকে দেদীপ্যমান। ১৮৫৪ সালে গৃহীত শিক্ষা সনদ অনুযায়ী হ্যালিডে সাহেব ছোটলাট হয়েই শিক্ষা বিভাগের আমূল পুনর্গঠন করলেন। শিক্ষা কাউন্সিলের পরিবর্তে শিক্ষা অধিকরণ তৈরী হ'ল এবং প্রথম শিক্ষা অধিকর্তা নিযুক্ত হলেন এক নব্য সিভিলিয়ন — গর্ডন ইয়ং সাহেব। শিক্ষা কাউন্সিলের সেক্রেটারি ডঃময়েট তখন ইংল্যান্ডে। বিদ্যাসাগর ছোটলাট সাহেব হ্যালিডেকে অনুরোধ করেছিলেন প্রথম ডি পি আই পদে একজন অভিজ্ঞ শিক্ষানুরাগীকে নির্বাচন করলে মঙ্গল হবে। প্রশাসনিক কারণেই বোধহয় সেই অনুরোধ রক্ষা করা যায় নি। পরিবর্তে ছোটলাট সাহেব নিজেই শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত জরুরি সিদ্ধান্ত নেবেন বলে পণ্ডিতকে অশ্বস্ত করেছিলেন। এবং অনুরোধ করেছিলেন তরুণ সিভিলিয়ন ইয়ং সাহেবকে যেন বিদ্যাসাগর নিজে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করে দেন। DPI এর Report for May 1855-April 1856 এ স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। "The course of instruction at the Sanskrit College adapted, as it has of late been to modern ideas and

to purposes of practical utility, is being successfully carried on and administered by its able Principal, Pandit Ishwarchandra Sharma, and is producing results, the effect of which upon the lowest classes cannot be overrated."

কিন্তু নব্য আমলা শিক্ষা অধিকর্তা গর্ডন ইয়ং এর কাছে এই দেশ, এই সমাজের সুদূর প্রসারী উন্নয়নের চেয়ে নিজের অহংবোধ এবং স্থানীয় প্রভাবশালী লবির সাথে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখার গুরুত্ব অনেক বেশি ছিল। ছোটলাট হ্যালিডে সাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায়ই ইয়ং সাহেবের অফিসে গিয়ে কাজকর্ম্ম বুঝিয়ে দিতে সচেষ্ট ছিলেন। এই পণ্ডিত পূর্বতন ডঃ ময়েটের ঘনিষ্ঠ ও গুণগ্রাহী — হয়তো তাঁর সাথে যথার্থ সহযোগিতা করবেন না এইসব অমূলক আশঙ্কায় সীমিত দৃষ্টি আমলা মহাশয় বিদ্যাসাগরকে যথাযোগ্য মর্যাদা ও সৌজন্য কখনই দেখাতে পারেন নি। হিন্দু কলেজের দু'টি অব্যবহৃত ঘর সংস্কৃত কলেজের ইংরাজি আবশ্যিক পাঠের জন্য ব্যবহার করার আবেদন করেছিলেন অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর। তখন হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ সাট্‌ক্লিফ সাহেব। একটি সামগ্রিক শিক্ষাসহায়ক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের পরিবর্তে শিক্ষা অধিকর্তা গর্ডন সাহেব সাট্‌ক্লিফ সাহেবের সাথে মন্ত্রনা করে অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরকে যথেষ্ট অসৌজন্য দেখিয়েছিলেন।

গর্ডন ইয়ং শিক্ষা অধিকর্তা হবার পূর্বেই বিদ্যাসাগর চারটি জেলার ভারপ্রাপ্ত বিদ্যালয় পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েছিলেন। অতি দ্রুততার সাথে এই চার জেলায় মডেল স্কুল স্থাপনের অসামান্য নিদর্শন তুলে ধরতে পেরেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। অপর দুই সাহেব ইন্‌স্পেক্টরের সাথে পরামর্শ করে গর্ডন ইয়ং বিদ্যাসাগরের বিবেচনা অনুযায়ী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। সেবার ছোটলাট হ্যালিডে সাহেবের মধ্যস্থতায় ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষ বিদ্যাসাগরের কর্মধারাকে সমর্থন করেছিলেন। শিক্ষা অধিকর্তা ইয়ং আরও ক্ষুব্ধ হলেন। ইতিমধ্যে হ্যালিডে সাহেবের বাচনিক নির্দেশে বিদ্যাসাগর তাঁর অধীনস্থ চারটি জেলার বহুসংখ্যক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, কোন লিখিত সরকারি মঞ্জুরিপত্র নেওয়া হয়নি। দুর্ভাগ্যবশত ইংল্যাণ্ডে মন্ত্রীসভার পরিবর্তন হ'ল। ভারতে গৃহীত শিক্ষা বিষয়ক নীতিতে এর প্রভাব পড়ল। এই সুযোগে শিক্ষা অধিকর্তা ইয়ং সাহেব বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলির ব্যয় বরাদ্দ বিলটি না মঞ্জুর করে দিলেন। মহা বিপদে পড়লেন ঈশ্বরচন্দ্র।

বিদ্যাসাগরের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করতে ইয়ং সাহেবের কোন ক্লান্তি ছিল না। সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা কাল থেকে ছাত্রদের উৎসাহবৃত্তি দানে সরকার যে ব্যয় করতেন, নতুন শিক্ষা অধিকর্তা সহসা সে সব বন্ধ করে দিলেন। উপরন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর একটি অধিবেশনে সংস্কৃত কলেজের ব্যয়ভার ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনার সময়ে কলেজটিকেই উঠিয়ে দেবার প্রস্তাব হয় এবং বহুসংখ্যক সাহেব ও বাঙালী সেই প্রস্তাবের পৃষ্ঠপোষকতাও করেন। শুধুমাত্র অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের তীব্র প্রতিবাদ ও অকাট্য যুক্তি কলেজটির অস্তিত্ব টিকিয়ে দিল। আজ সেই সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক কলেজ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে।

অভিজ্ঞতার অভাব ও বঙ্গপ্রদেশে শিক্ষা বিস্তারের বিষয়ে উদাসীনতার জন্য শিক্ষা অধিকর্তা গর্ডন ইয়ং বিদ্যাসাগরের অসাধারণ উৎসাহ, কর্মশক্তি ও বিচক্ষণতার মূল্য দিতে পারেন নি। বিদ্যালয় পরিদর্শনের একটি রিপোর্ট যখন বিদ্যাসাগর পেশ করলেন ইয়ং সাহেব আদেশ করেছিলেন রিপোর্টটি দৃষ্টিনন্দন, জাঁকজমকপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্বাধীনচেতা আত্মবিশ্বাসী ঈশ্বরচন্দ্র একটি অক্ষরও পরিবর্তন করতে অস্বীকার করলেন। এদিকে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হওয়ায় ছাত্ররা কলেজে আসা বন্ধ করল। রাজধানী কলকাতায় দিবারাত্র গোরা পাহারার ব্যবস্থা হয়। সংস্কৃত কলেজে গোরা সৈনিকদের বাসের ব্যবস্থা করলেন অধ্যক্ষ, কলেজ দীর্ঘকাল বন্ধ থাকল। এ বিষয়ে তিনি শিক্ষা অধিকর্তার সম্মতি নেন নি। ইয়ং সাহেব যারপরনাই রুষ্ট হলেন। নিজ পরিকল্পনা মত কর্মে পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হয়ে ১৮৫৭ সালের মে মাসে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদে অধিষ্ঠিত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু ইতিপূর্বেই লজ সাহেবকে ঐ পদে বহাল করা হয়েছে। ছোটলাট হ্যালিডে সাহেবের মধ্যস্থতায় আরও কিছুকাল সরকারি চাকরি বজায় রেখে অবশেষে অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা ১৮৫৮ সালের নভেম্বর মাসে সে আমলের মাসিক পাঁচশত টাকা বেতনকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে পদত্যাগ করলেন। এই মহজীবনকে, মহাপ্রাণকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিবন্ধকতার নিগড়ে পরাধীন করে বেঁধে রাখবে এমন সাধ্য নব্য আমলা গর্ডন ইয়ং এর ছিল না। ১৮৫৮ সালের ৫ই আগস্ট তিনি শিক্ষা অধিকর্তাকে যে পদত্যাগের ইচ্ছাপত্রটি দিয়েছিলেন তাতে স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ ছাড়াও বলেছিলেন —''এইরূপ গুরুতর পন্থা অবলম্বন করবার গৌণ হেতুগুলির মধ্যে দুইটি এই, — ভবিষ্যৎ উন্নতির আর কোন আশা নেই; এবং কর্তব্যপরায়ণ বিভাগীয়

কর্মচারীগণের পক্ষে যে সহানুভূতি বাঞ্ছনীয়, বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার সাথে আমার সেই ব্যক্তিগত সহানুভূতির অভাব...।"

৩রা নভেম্বর, ১৮৫৮ তারিখে বিদ্যাসাগর নতুন অধ্যক্ষ প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ প্রাচ্যবিদ ই.বি.কাওয়েলকে সংস্কৃত কলেজের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে স্বাধীন কর্মক্ষেত্রকে বরণ করে নিলেন। শিক্ষা অধিকর্তা গর্ডন ইয়ং ১৮৫৮-৫৯ সালের রিপোর্টে সংস্কৃত কলেজ পরিচালনায় কয়েকটি ত্রুটির উল্লেখ করেছিলেন হয়তো বিদ্যাসাগরকে অহেতুক কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার চেষ্টায়। নতুন অধ্যক্ষ জ্ঞানতপস্বী কাওয়েল সাহেব তার প্রতিবাদ করে লিখেছিলেন, "I do not think that these remarks were justified by the state of the college even at that period. I only wish to be considered as having helped to carry out a series of improvements which were certainly inaugurated by the late Principal". অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের অসাধারণ কার্যাবলীর যথার্থ মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন তাঁরই উপযুক্ত বিদগ্ধ উত্তরসূরী অধ্যাপক কাওয়েল। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিশ্চয়ই সংস্কৃত কলেজের ভবিষ্যতের বিষয়ে অনেকটা স্বস্তি পেয়ে পরম সন্তোষে প্রাণখুলে হেসেছিলেন।

তথ্যসূত্র

১। বন্দ্যোপাধ্যায় চণ্ডীচরণ, *বিদ্যাসাগর*, আনন্দধারা, কলকাতা, ১৩৭৬(বাং)

২। ঘোষ বিনয়, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ* (১-৩ খণ্ড), বেঙ্গল পাব্‌লিশার্স, ১৯৫৯ (ইং)

৩। বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, *কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড সংস্কৃত কলেজ, ১৩৫৫(বাং)

৪। ভট্টাচার্য গোপিকামোহন, *সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস* (২য় খণ্ড), সংস্কৃত কলেজ, ১৯৬১(ইং)

৫। গুপ্ত বিপিন বিহারী, *পুরাতন প্রসঙ্গ*, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৯(ইং)

৬। রায় অলোক, *উনিশ শতকে নবজাগরণ*, অক্ষর প্রকাশনী, ২০১৯(ইং)

ইস্পাতের স্বাক্ষর

মীনাক্ষী সিংহ

''বিদ্যাসাগর মানে মাতৃভক্তি নয়, বিদ্যাসাগর মানে বিধবাবিবাহ নয়, বিদ্যাসাগর মানে দয়াদাক্ষিণ্য নয়; বিদ্যাসাগর মানে হ'ল ইস্পাত ; যে ইস্পাত দিয়ে তৈরি হয় জাতীয় চরিত্রের কাঠামো''[১]

সমালোচকের সঙ্গে সহমত হয়ে আমরাও বলি সেই ইস্পাত ঋজু মানুষটি সমাজে আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সারাজীবনের তপস্যা ছিল স্বাধীনতার, মুক্তির। কর্মই ছিল তাঁর ধর্ম।

পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও প্রাচ্য মানবতাবাদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল বিদ্যাসাগরের জীবন। তাঁর করুণাসাগর সত্তাই বহু চর্চিত, আলোচিত; কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি যে ইস্পাতকঠিন ঋজু ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, অনেকসময় তা আমরা বিস্মৃত হই। রবীন্দ্রনাথ 'অজেয় পৌরুষ ও অক্ষয় মনুষ্যত্বের' মূর্ত প্রতীক রূপে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন[২] সত্যই বাঙালি জীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ করে অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে নিজের দৃঢ় বলিষ্ঠ জীবনকে তিনি প্রবাহিত করেছিলেন। এই তেজোদৃপ্ত খর্বকায় ব্রাহ্মণ সমস্ত অন্যায় অসাম্য কুসংস্কার ও ধর্মমোহকে অগ্রাহ্য করে সমুন্নত শিরে অভ্রভেদী হিমালয়ের মতো আসীন ছিলেন।

অনেক ছোট ছোট ঘটনাতে তাঁর এই আপোষহীন অনমনীয় ব্যক্তিত্বের পরিচয় আমরা পেয়েছি। বহু ব্যবহৃত হলেও পুনরাবৃত্ত রসনায় আবার সেগুলি উদ্ধৃত করা যায়।

তৎকালীন ইংরেজ প্রশাসন সাধারণ মানুষকে ব্রিটিশ প্রভুত্বের কথা স্মরণ করাতে কয়েকটি অবশ্য পালনীয় রীতির প্রচলন করেছিল, যা প্রায় সকলেই সসম্ভ্রমে মেনে চলতো। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন প্রতিবাদী অগ্রপথিক। ফলে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় নির্দেশিত চোগা কাপকান পরতেন না।

এশিয়াটিক সোসাইটির সভায় প্রবেশ করতে গেলে সাহেবি পোশাক পরা ছিল বাধ্যতামূলক, অন্যথায় নগ্নপদে প্রবেশ করতে হ'বে; এই ভেদবিভেদের অসম্মানসূচক নির্দেশ বিদ্যাসাগর মানেননি। তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা - ইংরেজি জুতোও ভারতীয় চটির মধ্যেকার এই ভেদনীতি দূর না হলে তিনি ভেতরে যাবেন না। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর উক্তিটি উদ্ধার করা যেতে পারে।;

''সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, যাঁহার পিতার দশবারো টাকার অধিক আয় ছিল না, যিনি বাল্যকালে অধিকাংশ সময় অর্দ্ধাশনে থাকিতেন, তিনি একসময় নিজ তেজে সমগ্র বঙ্গসমাজকে কিরূপ কাঁপাইয়া গিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে মন বিস্মিত ও স্তব্ধ হয়। তিনি একসময় আমাকে বলিয়াছিলেন; 'ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই যাহার নাকে এই চটী জুতাশুদ্ধ পায়ে টক করিয়া লাথি না মারিতে পারি''[৩]

তাঁর এই সদম্ভ উক্তির প্রামাণ্য নিদর্শনের ঘটনা বহু আলোচিত। ১৮৪৭ সালে সংস্কৃত কলেজে টেবিলে উপর জুতোশুদ্ধ পা তুলে বসা কার সাহেব ও বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎকারের ঘটনা মনে পড়বে। কিছুদিন পরে ঐ একই ভাবে টেবিলের উপর চটি শুদ্ধ পা তুলে বসে বিদ্যাসাগর কার সাহেবকে বুঝিয়েছিলেন ভারতীয়রাও প্রতিবাদ করতে জানে।

প্রতিবাদী বিদ্যাসাগরের উল্লিখিত উক্তির পাদপূরণ স্বরূপ স্মরণ করতে পারি রবীন্দ্রনাথের কথা —

''তাঁহার (বিদ্যাসাগর) সর্বজন বন্দনীয় চরণযুগল''

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু সেই চরণে প্রণাম জানিয়ে যথার্থ বলেছেন ''ওই চরণযুগেলর অঙ্গাভরণ-চটিযুগল''[৪]

তাঁর বিদ্যাচর্চা, শিক্ষা প্রসার ও করুণাকর দানকর্ম বহু আলোচিত। সেই সঙ্গে বিধবাবিবাহ প্রচলনে তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। প্রকৃতপক্ষে উনিশশতকের চল্লিশের দশক থেকে বিদ্যাসাগর সামাজিক সংস্কার মূলক আন্দোলনে অতি সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে ছিল এই আধুনিক যুগচেতনার অভ্রান্ত প্রকাশ।

রামমোহনের সহমরণ-সতীদাহ বিরোধী আন্দোলনের পথেই বিদ্যাসাগর জাতিভেদ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ব্রতী হন ও বিধবা বিবাহ

প্রবর্তনে আত্মনিয়োগ করেন, সে যুগের বহু বিশিষ্টি ব্যক্তিই এর বিরোধী ছিলেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বিবিধপ্রসঙ্গ'-র দ্বিতীয় খণ্ডে বিদ্যাসাগরের সমালোচনা করেছিলেন। এমনকি তাঁর উপন্যাস বিষবৃক্ষের নায়িকা সূর্যমুখী বলেছে;

"যে পণ্ডিত বিধবাবিবাহের বিধান দেয়, সে যদি পণ্ডিত তবে মূর্খ কে?"

এই সব তীব্র সমালোচনা বিদ্যাসাগরকে আদর্শভ্রষ্ট হ'তে দেয়নি, তিনি বলেছেন;

"আমি দেশাচারের দাস নহি। নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব"

এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ উচ্চারণের পাশাপাশি আছে সকৌতুক রসিকতাও, বিদ্যাসাগর তাঁর প্রিয়বন্ধুজনকে স্বহস্তে প্রস্তুত আহার্যে আপ্যায়ন করতে ভালোবাসতেন। একবার তাঁর নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর মধ্যমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র। বিদ্যাসাগরের স্বহস্তে প্রস্তুত 'আম আদা দিয়ে পাঁঠার মেটের অম্বল' খেয়ে পরিতৃপ্ত বঙ্কিমচন্দ্র বলেন; "এমন সুস্বাদু অন্ন তো কখনও খাই নাই"। সঞ্জীবচন্দ্র সহাস্যে বলেন; "হবে না কেন, রান্নাটা কার জানো তো, বিদ্যাসাগরের।" এরপর স্বয়ং বিদ্যাসাগরের সাহাস্য সকৌতুক মন্তব্য; "না হে না, বঙ্কিমের সূর্যমুখী আমার মতো মূর্খ দেখেনি"

বঙ্গিমচন্দ্র নিরুত্তর থাকলেও সেই ভোজন আসরে একটা হাসির তুফান উঠেছিল।[৫]

জ্ঞান তপস্বী, শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর কেবল শিক্ষাপ্রসার ও বিধবাবিবাহের প্রবর্তক রূপেই নয়, প্রতিবাদী সংগ্রামী অজেয় ব্যক্তিসত্তারূপে চিরস্মরণীয় যাঁর অন্তরে ছিল অপরিমেয় দয়া ও করুণা। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় তিনি 'ক্ষীর সমুদ্র' তাই সাগরের নোনা জল নয়, তাঁর কাছে যাঁরা এসেছেন তাঁরা পেয়েছেন অমৃতের আস্বাদন।

তাঁর জীবৎকালের সাতটি দশক ধরে জীবনের একমাত্র আদর্শ ছিল জাগতিক মানুষের মনুষ্যত্বর বিকাশসাধন। শিক্ষাব্রতী ক্ষুদিরাম বসু বলেছিলেন "বিদ্যাসাগরের ধর্মজীবন কার্যগত ছিল। কাজই তাঁর কাছে ধর্ম", তাই প্রথাগত বিচারে না হলেও প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগর ছিলেন ধার্মিক শ্রেষ্ঠ। কর্মই তাঁর সাধনা,

কর্মই তাঁর ভক্তি, কর্মই তাঁর ঈশ্বর। তাঁর বাল্যকালের নানা কাহিনি, অসাধারণ মাতৃভক্তি, সমুন্নত চারিত্রিক মহিমার বহু আলোচিত প্রসঙ্গে না গিয়ে তাঁর শিক্ষাব্রতী কর্মযোগী সংস্কারক সত্তাটিকে নতুন করে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাসে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগ দেবার পর সামাজিক সংস্কারে বিদ্যাসাগর প্রত্যক্ষ ভাবে যোগ দিলেন। ১৮৫৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা' শীর্ষক বিধবাবিবাহ সমর্থক প্রথম পুস্তিকা। ১৮৫৬ সালের ১৬ই জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়। তাঁর অদম্য ইচ্ছা ও আপ্রাণ চেষ্টা ছিল সেই সঙ্গে বাল্যবিবাহ প্রথা রদ করা। কিন্তু তখন তা' আইনসিদ্ধ হয়নি। সেই সঙ্গে তিনি পুরুষের বহুবিবাহ প্রথাকেও নির্মূল করতে চেয়েছিলেন। এই তিনটি প্রথার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল নারীর দুর্ভাগ্য ও শোচনীয় পরিণাম। বিদ্যাসাগর প্রায় তাঁর একক প্রচেষ্টায় বিধবাবিবাহকে বৈধ স্বীকৃতি দিয়ে নারীসমাজকে আধুনিকতার দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। তবু তাঁর সামাজিক সংস্কারের ব্যর্থতা নিয়ে আজও প্রশ্ন ওঠে, কারণ বিধবাবিবাহের সংখ্যা অতি নগণ্য। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর কর্মযজ্ঞে স্থির সংকল্প ছিলেন। বিধবাবিবাহ প্রচলনের আন্দোলনকে তিনি তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম বলে স্বীকার করেছেন। নারীর অকাল বৈধব্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি বিধবাবিবাহ আইন চালু করার উদ্যোগ নিয়ে সফল হ'য়েছিলেন। ট্র্যাডিশন বা সনাতনী প্রথার বিরুদ্ধে এ তাঁর প্রবল প্রতিবাদ। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগরের সারা জীবনই ট্র্যাডিশন ভাঙার ইতিহাস। সেকালে সংস্কৃত শিক্ষার সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণের উদ্যোগ, পুরোপুরি পাশ্চাত্য ধরণে বাংলা প্রাইমার লেখা — সবই তাঁর আধুনিক ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। টুলো পণ্ডিতের মতো ধুতি চাদরে শোভিত এই ব্রাহ্মণ অন্তরে ছিলেন চরম আধুনিক। তাই তাঁর লেখা 'বিধবাবিবাহ' সংক্রান্ত পুস্তিকায় তিনি স্বামী-স্ত্রীর প্রভু-দাসী সম্পর্কের বিরোধিতা করে নারী পুরুষের সমান অধিকারে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন আধুনিকীকরণের প্রবক্তা। ১৮৫২ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাসংস্কার সম্পর্কে একটি খসড়া প্রস্তুত করেন, যাতে তিনি প্রস্তাব দেন সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাক্রমে সংস্কৃতের সঙ্গে ইংরেজি ভাষাকেও সমান গুরুত্ব সহকারে অঙ্গীভূত করতে হ'বে পরের বছর ১৮৫৩ সালে কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ৫০ ব্যালেন্টাইনের রিপোর্টের উপর যে মন্তব্য পেশ

করেন তা সেযুগের প্রেক্ষিতে বিস্ময়কর। এতে সাংখ্য ও বেদান্তের প্রভাব থেকে শিক্ষার্থীদের মুক্ত রাখার জন্য ও যুক্তিবাদী সত্যনিষ্ঠ সংস্কারমুক্ত করার মানসে জন স্টুয়ার্ট মিলের গ্রন্থ পাঠ্যসূচিতে রাখার প্রস্তাব দেন। আসলে যুক্তিবাদী, বুদ্ধিবাদী, মানবতাবাদী বিদ্যাসাগর ধর্মীয় আচার বা জিজ্ঞাসা, মোক্ষলাভের বাসনা, অধ্যাত্মচিন্তার পরিবর্তে মানুষের কল্যাণব্রতে বিশ্বাসী ছিলেন। এজন্য দেশের জনসমষ্টির সঙ্গে তাঁর আত্মিকযোগ কখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি। নিজেকে Positive বলে দাবী করা বিদ্যাসাগরের আদর্শের ছায়াতেই মনে হয় রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের জ্যাঠামশাই জগমোহন চরিত্র চিত্রিত — কোমলে কঠোরে মেশানো এক অনুপম সত্তা। ইস্পাতকঠিন বিদ্যাসাগর বাল্যবিধবাদের দুঃখে অঝোরে কেঁদেছেন; পাঠকের মনে পড়বে চতুরঙ্গের 'জ্যাঠামশাই' জগমোহনও অকালবিধবা ননীবালার বেদনায় অশ্রুপাত করেছেন। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেন মধুসূদনের বিখ্যাত উক্তির সার্থক বাণীরূপ, যাঁর মধ্যে ছিল "The genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an English man and the heart of a Bengali mother"।

প্রচলিত অর্থে একজন রাজনৈতিক নেতা বা রাষ্ট্রচিন্তক ছিলেন না বিদ্যাসাগর। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষে বিদ্যাসাগরকে অনেকেই তেমন গুরুত্ব দিতে চাননা। কিন্তু জাতীয়তাবাদের প্রধান ভিত্তি যে মাতৃভাষা - ১৮৪০ এর মধ্যভাগে বিদ্যাসাগর এই সত্য অনুভব করেছিলেন। কারণ বিজাতীয় ভাষায় জাতীয়তা বোধের যথাযথ প্রকাশ ঘটা সম্ভব নয়।

কিন্তু বিদ্যাসাগরের স্বদেশপ্রীতির স্বরূপ বুঝতে পেরেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; তাঁর ভাষায় ;

"আমি তাঁহাকে (বিদ্যাসাগর) Patriot বলিতেছি যখন তিনি Woodrow সাহেবের অধীনতা শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া নিঃসম্বল হস্তে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক লেখনী যন্ত্র দ্বারা জীবিকার সংস্থানের পথ কাটিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বুঝিলাম যে হ্যাঁ ইনি Patriot, যেহেতু তিনি খাওয়াপড়া অপেক্ষা স্বাধীনতাকে প্রিয় বলিয়া জানেন"

অন্যদিকে আধুনিক কালে অনেকেই তাঁর স্বদেশ প্রীতির সীমাবদ্ধতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাঁকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষকামী বুদ্ধিজীবী বলে তাঁর বিরুদ্ধে বহুতর অভিযোগ উপস্থাপিত হ'য়েছে। এমনকি সিপাহী বিদ্রোহের

সময় সংস্কৃত কলেজকে সৈন্যদের ছাউনি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য তিনি ব্রিটিশদের হাতে তুলে দিয়েছেন এমন অভিযোগও আনা হ'য়েছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর যে স্বেচ্ছায় সেটি করেননি; এ তথ্য তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। বস্তুত ১৮৫৭ সালের ১১ই আগস্ট লিখিত এক পত্রে সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন; সেই মতবিরোধের ফলে ১৮৫৮ সালের ৫ই আগস্ট তিনি পদত্যাগ করে লিখেছিলেন "I frequently felt it disagreable and inconvenient to serve Government under existing circumstances"।

একে কি বলবো ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে তার হৃদ্যতা, তোষামোদপ্রিয়তা ও সহযোগিতার অভ্রান্ত প্রমাণ?

বিদ্যাসাগরের এই অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় নানাভাবে প্রকাশিত অতি নিকট প্রিয় বন্ধুজনের অন্যায় ও ভীরুতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে তীব্র ভৎর্সনা করতেও তিনি পিছপা হ'ননি।

রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় ছিলেন বিদ্যাসাগরের বন্ধু। বিদ্যাসাগর আয়োজিত প্রথম বিধবা বিবাহের সভায় উপস্থিত থাকার কথা দিয়েও রমাপ্রসাদ সেই অনুষ্ঠানে যাননি। বিদ্যাসাগরের প্রশ্নের উত্তরে রমাপ্রসাদ বলেন;

''আমি তো ভেতরে ভেতরে আছিই। সাহায্যও করবো তবে বিবাহস্থলে নাই বা গেলাম।''

বন্ধু রমাপ্রসাদের এ হেন আত্মরক্ষামূলক উত্তরে বিদ্যাসাগর রাগে ও বিরক্তিতে নীরব হলেন। পরক্ষণে দেওয়ালে টাঙানো ভারতাত্মার মূর্ত প্রতীক রামমোহন রায়ের একটি ছবির দিকে দৃষ্টি পড়তেই ক্রুদ্ধ বিদ্যাসাগর তীব্র কণ্ঠে রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদকে বললেন —

''ওটা ফেলে দাও, ফেলে দাও''

এই অনমণীয় প্রতিবাদী সত্তার একটি আশ্চর্য ঘটনা অনেকেরই অজানা, কিছুটা অনালোচিত-ও। ইন্দ্র মিত্রের 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে উল্লিখিত সেই ঘটনাটির কথা দিয়েই শেষ করছি আমার এই প্রতিবেদন।[৬]

সময়টা ১৮৬২ সাল। মেডিকেল কলেজের ডাক্তারি ছাত্রদের রোগীর চিকিৎসা, পথ্য প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে হাতে কলমে শেখানো হত। রোজ সকালে

সেই ক্লাস হ'ত। বনমালী চট্টোপাধ্যায় নামে এক ডাক্তারীর ছাত্র ল্যাবোরেটরিতে নিজের মনে কাজ করছিলেন। এক পরিচারকের সঙ্গে হঠাৎ সামান্য কারণে ঝগড়া, তর্কাতর্কি বাধলো। সেই পরিচারক কলেজের প্রিন্সিপাল লেক সাহেবের কাছে বনমালীর বিরুদ্ধে কুইনাইন চুরির অপবাদ দিয়ে নালিশ জানায়। যথাযথ অনুসন্ধান না করে প্রিন্সিপাল সাহেব পুলিশে খবর দিলেন, এবং চোর সন্দেহে মেডিকেল ছাত্র শিক্ষানবীশ বনমালী চট্টোপাধ্যায়ের দশদিনের কারাদন্ড হ'ল। প্রিন্সিপাল লেক সাহেব সত্যমিথ্যা যাচাই করার প্রয়োজনও বোধ করেন নি; তিনি বাংলা ক্লাসের ছাত্রদের বরাবরই অবজ্ঞা করতেন। তাদের দণ্ড দেবার সুযোগ গ্রহণ করে তৃপ্ত হলেন। সেই বছর ২২শে ডিসেম্বর সোমপ্রকাশ পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয় যে প্রিন্সিপাল বাংলা বিভাগের ছাত্রদের প্রায়ই ইতর, ছোটলোক চোর বলে অপমান করতেন এবং মিথ্যা দোষারোপ করে ছাত্রটিকে দণ্ড দিলেন। বাংলা ক্লাসের ছাত্ররা প্রতিবাদে উত্তাল হলেন। বনমালীর অকারণ দণ্ড প্রাপ্তির প্রতিবাদে প্রায় দেড়শো ছাত্র বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নেতৃত্বে গণ ইস্তফার চিঠি দিলেন এবং স্পষ্ট ভাবে জানালেন তাঁরা এই অপমানের প্রতিকার চান। প্রিন্সিপাল কোনো গুরুত্ব না দিয়ে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে ছাত্রদের পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিলেন - এবং তাতে নিজের মন্তব্য লিখলেন; ''ছাত্রেরা একজন চোরের সহিত সম দুঃখতা ও অবাধ্যতা প্রকাশ করিতেছে, অতএব তাহাদের নাম কাটিয়া দেওয়া হইল।''

সমবেত ছাত্রদল উপস্থিত হলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। বিদ্যাসাগর প্রথমে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি। তাঁর মনে পড়েছিল ১৮৫০ সালে মিলিটারী শ্রেণীর ছাত্ররা ধর্মঘট করেছিল। তদন্তে সাতজন ছাত্রকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। তার দুবছর পরে কয়েকজন ডাক্তারির ছাত্র বাইরের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে শিক্ষা কাউন্সিলে তোলপাড় হয়। লণ্ডনের "The Medical Times & Gagette" পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। সেইসব ঘটনা মনে করে বিদ্যাসাগর ছাত্রধর্মঘটে জড়িয়ে পড়তে চাননি। কিন্তু এবার ছাত্ররা তাঁর কাছে আবেদন জানালেন যে বিদেশী অধ্যক্ষ অকারণে বাঙালিছাত্রদের অপমান করেছেন; এর প্রতিবিধান একমাত্র বিদ্যাসাগরই করতে পারেন। প্রিন্সিপাল বাংলা বিভাগের ছাত্রদের বংশ জাতির মর্যাদা নিয়ে সর্বসমক্ষে অপমান করেন। ছাত্রনেতা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সেকথা জানিয়ে বিদ্যাসাগরকে বলেন বাঙালির এই অপমানে আপনিও নীরব থাকবেন? এবার আর বিদ্যাসাগরের পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব হলনা। সেই

'টিকিওলা বাঙালি ইংরেজ' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর প্রতিবিধানের আশ্বাস দিলেন। সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি ছাত্রদের কলেজে যেতে বারণ করলেন। তারপর কাগজ কলম নিয়ে ঘটনাটি আনুপূর্বিক লিখে পাঠালেন ছোটলাটের কাছে। ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব Council of Education এর প্রেসিডেন্ট এবং বিদ্যাসাগরের অনুরাগী ছিলেন। বিদ্যাসাগরের মধ্যস্থতায় ছোটলাটের হস্তক্ষেপে মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল নিজের ভুল স্বীকার করলেন। ছাত্র ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হল, তাঁদের আন্দোলন সফল হ'ল। এই আন্দোলন যতদিন চলেছিল বৃত্তিধারী ছাত্ররা কলেজ থেকে তাঁদের প্রাপ্য টাকা পাননি। সেই তিনচার মাস ছাত্রদের সকলের ব্যয়ভার যিনি বহন করেছিলেন, তিনি করুণাসাগর বিদ্যাসাগর। ধর্মঘটী ছাত্রদের আন্দোলনে সমর্থন জানিয়ে তাঁদের জাতীয় অসম্মান ও অপমানের প্রতিকার করে বিদ্যাসাগর তাঁর অজেয় পৌরুষ ও অক্ষয় মনুষ্যত্বের পরিচয় রেখেছিলেন।

এই ধুতি উত্তরীয় শোভিত খর্বকায় ব্রাহ্মণ ছিলেন বাংলাদেশের শিক্ষা ইতিহাসের যথার্থ রূপকার ও স্থপতি। তাঁর মানসিক শক্তি ছিল অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ তাই সশ্রদ্ধ বিশেষণে ভূষিত করে তাঁকে ''ব্রাহ্মণবীর''[২] বলেছেন। সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন ছিল বি্যদাসাগরের অন্বিষ্ট। রবীন্দ্রনাথ যথার্থ মন্তব্য করেছিলেন — ''এই ব্রাহ্মণ তনয় যদি তাঁর মানসিক শক্তি দিয়ে কেবলমাত্র দেশের মনোরঞ্জন করতেন, তাহলে অনায়াসে তিনি অবতারের পদ পেয়ে বসতেন।''

কিন্তু সনুন্নত মহিমা তাঁকে দেবোপম মর্যাদা দিয়েছে,

''মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখনও দিবে না দেখা
দেবতার অমর মহিমা''

দেখা দিয়েছিল — নিজ মর্ত্যসীমা চূর্ণ করেছিলেন বলেই বিদ্যাসাগরের মধ্যে দেখেছি 'দেবতার অমর মহিমা'।

তথ্যসূত্র

১। *বর্ণপরিচয়-অবিস্মরণীয় মুহূর্ত*—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ১৯৫৪ পৃঃ ৪১

২। *চারিত্রপূজা-বিদ্যাসাগর চরিত*—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩০২

৩। *রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*—শিবনাথ শাস্ত্রী

৪। *রসসাগর বিদ্যাসাগর* (পাদুকাপুরাণ)—শঙ্করী প্রসাদ বসু পৃঃ ১২৯

৫। *রসসাগর বিদ্যাসাগর* (রস রসনা রসিক)—শঙ্করীপ্রসাদ বসু পৃঃ ১০৮

৬। *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর* —ইন্দ্রমিত্র

৭। *চারিত্রপূজা-বিদ্যাসাগর চরিত* —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃঃ ৪৯৩

বিদ্যাসাগর ঃ এক স্বশিক্ষিত নিঃশঙ্ক চিকিৎসক

কৃষ্ণা রায়

তিনি ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, নির্ভীক শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসক, পুস্তক প্রণেতা এবং পুস্তক ব্যবসায়ী, অপরিসীম মানব দরদী, দক্ষ সমাজ সংস্কারক এবং সর্বার্থেই অক্লান্ত সমাজ কর্মী। আর এই শেষের কাজটি ভাল রকমে করার জন্য তিনি তাঁর সমকালে হয়ে উঠেছিলেন এক ডিগ্রীবিহীন স্বশিক্ষিত নিঃশঙ্ক চিকিৎসক। ডাক্তার ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর। কিন্তু কেন ? সেকালে কি বাংলায় ডাক্তার ছিলনা ? সেখানে বিদ্যাসাগরের মত অন্যতর শাস্ত্রে পন্ডিতের নাক গলানোর কি দরকার ছিল ? তাও জীবনের প্রান্তিক পর্বে ! উত্তরে নির্দ্বিধায় বলা যায়, ব্যবস্থা ছিল তো বটেই। ১৮৩৫ সালে কলকাতায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পর পাশ্চাত্য মতে চিকিৎসা-বিদ্যার চর্চা যথেষ্টই হোত। পাশাপাশি দেশীয় আয়ুর্বেদ, হাকিমি চিকিৎসার ব্যবস্থাও পুরোমাত্রায় বজায় ছিল। বিদ্যাসাগরের এই কাজে এগিয়ে আসার কারণ আর কিছুই নয়, তাঁর বিজ্ঞান-মনস্ক মনের কাঠামোয় সদা জাগ্রত সেই অপার সেবাপরায়ণতার মনোবৃত্তি, যা তাঁকে তাড়না করেছিল দরিদ্র-আর্ত মানুষের রোগের চিকিৎসার জন্য স্বল্প ব্যয়ে নিরাময় যোগ্য এক নতুন ধরণের প্রায়োগিক চিকিৎসা-ব্যবস্থা। ইংরেজী ভাষায় একটি শব্দ প্রায়শ ব্যবহৃত হয়, যাকে বলা হয় এমপ্যাথি (empathy), যার অর্থ সম-মর্মিতা। অনুভূতি সাপেক্ষে সিম্প্যাথি (sympathy) বা সহ-মর্মিতার সঙ্গে যার ফারাক বিস্তর। বিদ্যাসাগরের হোমিওপ্যাথি চর্চার কেন্দ্রে হয়তো ছিল দেশের অগণিত দরিদ্র-অসহায় মানুষের বেদনায় সেই জীবন প্রমাণ এমপ্যাথি, অর্থাৎ নিজের দারিদ্র ভরা শৈশব অথবা কৈশোরের অভিজ্ঞতায় যা তিনি নিবিড় ভাবে জেনেছিলেন, দুঃখ-দুর্দশা তাড়িত মানুষের জন্য সেই নিজস্ব অনুভব ক্ষণমুহূর্তের জন্য ভোলেন নি। একই স্পন্দনে অনুভব করেছিলেন তাদের দুর্দশার মাত্রা

(১০ক)। তাই হয়তো প্রথামাফিক চিকিৎসক না হয়েও তাঁর নিঃসংশয়ে চিকিৎসকের ছদ্মবেশ নেওয়া, তারই জন্য প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় দাঁড়িয়ে সমাজ সেবার ভিন্নতর রূপ আশ্রয় করা।

আগ্রহের পটভূমি ?

সময়টা ছিল ১৮৬৬ সাল। বহুদিন ধরে বিদ্যাসাগর দুরন্ত শিরোঃপীড়ায় ভুগছিলেন, প্রচলিত চিকিৎসায় কোন রকম উপশম ঘটছিল না। সেই বিপদ থেকে তাঁকে, সারিয়ে তুললেন কলকাতার বৌবাজার অঞ্চলের পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে শিক্ষিত, অগ্রণী চিকিৎসক, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দত্ত, ভারতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় অন্যতম পথপ্রদর্শক। (১) হোমিওপ্যাথি! এই বিচিত্র চিকিৎসা বিদ্যার আবিষ্কারক ছিলেন ১৭৫৫ সালে জন্ম নেওয়া জার্মান চিকিৎসক স্যামুয়েল হানিম্যান। (২) প্রথাগত ভাবে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেও সমকালীন চিকিৎসা পদ্ধতির আসুরিক প্রয়োগ পদ্ধতি দেখে তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন। এক সময় উইলিয়াম কিউলেন্স এর ''আ ট্রিটিস অন মেটেরিয়া মেডিকার'' অনুবাদ করতে গিয়ে দেখলেন পেরুভিয়ান গাছের ছাল থেকে পাওয়া সিঙ্কোনা, ম্যালেরিয়া রোগ সারায়। রসায়নে বিশেষ পারদর্শী মানুষটি নিজের ওপর এই রসায়নের প্রয়োগ করে দেখলেন তার নিজের শরীরেও ম্যালেরিয়ার মত রোগ লক্ষণ দেখাচ্ছে। আরও বেশ কিছু রসায়নের এই ধরণের প্রভাব লক্ষ্য করে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, যে বস্তু কোন সুস্থ মানুষের দেহে কোন বিশেষ রোগ লক্ষণ দেখাতে পারে, সেই একই বস্তু ওই বিশেষ রোগ বৈশিষ্ট্য যুক্ত রোগীকে নিরাময় করতে পারে। মতবাদটির ব্যাখ্যা করলেন এই ভাবে, ''লাইক কিউরস লাইক''। ১৭৯৬ সালে এই ভাবনা থেকে জাত নতুন চিকিৎসা-পদ্ধতির নাম দিলেন হোমিওপ্যাথি। অনেক বস্তুর ওপর পরীক্ষা করে, তাদের প্রয়োজন মত লঘু দ্রবণ তৈরি করে বিষাক্ত রাসায়নিক প্রভাব দূর করলেন। ১৮১০ সালে প্রকাশিত হল তাঁর বিখ্যাত বই ''দ্য অরগ্যানন অফ হিলিং আর্ট'', পরে লিখলেন আরেকটি বই ''মেটেরিয়া মেডিকা পুরা'', হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সাপেক্ষে রোগ নিরাময়ের তথ্যাদি ও রিপোর্ট। মধ্যজীবনে প্যারিস চলে আসেন। ৮৮ বছরের জীবনকালের এই বিজ্ঞানীর চিকিৎসা-দর্শন বিদ্যাসাগরকে দারুণ ভাবে প্রভাবিত করেছিল।

১৮৪৩ সালে হানিম্যানের মৃত্যু হলেও এই নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি ততদিনে সারা পৃথিবীতে আদৃত হয়ে গেছে। ভারতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রবেশ করে ১৮৩৯ সালে, ডঃ জন মারর্টিন হনিগরারগার এর মাধ্যমে, পাঞ্জাবের মহারাজা হরি সিং এর অসাড় স্বরতন্ত্রী ও উদরীর চিকিৎসায়।(৩) ১৮৪৭-৪৮ সালে ভারতে ঘটে যাওয়া কলেরার মহামারিতে দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোরে এসে চিকিৎসা করলেন আরেক হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসক ডঃ স্যামুয়ের ব্রুকিং। ততদিনে জার্মান ও সুইডিশ মিশনারিরা অল্প খরচে ভারতের সাধারণ মানুষ এবং সেনানীদের চিকিৎসা করছিলেন। (৪) কলকাতায় ১৮৫১ সালে এলেন বিখ্যাত ফরাসী হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডঃ তৌনেরে (Tonnere)। উৎসাহী রাজেন্দ্রলাল দত্ত তাঁর কাছে কিছুটা প্রশিক্ষণ পেলেন। তিন বছর পরে ১৮৬৬ সালে ইউরোপ থেকে কলকাতায় এলেন আরেক বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ডঃ টি বেরেনি (T. Bereigny), খুব সাফল্যের সঙ্গে তিনি কলকাতায় চিকিৎসা শুরু করলেন। ইতিমধ্যে বিদ্যাসাগরের পরামর্শে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় অভ্যস্ত রাজেন্দ্রলাল তাঁর কাছে আরো নিষ্ঠা ভরে এই চিকিৎসা পদ্ধতির প্রশিক্ষণ নিলেন এবং প্রাকটিশ করতে লাগলেন। (৫) কিন্তু তখনও তাঁর কাছে তেমন লোক সমাগম হয়না। এ বিষয়ে স্মরণ করা যাক বিদ্যাসাগরের সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের স্মৃতি চারণ (১), ''অনেকে বলিতে লাগিল, যদি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ভাল এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার পরম বন্ধু, তবে তাহাকে অগ্রে কেন না চিকিৎসা করেন''? এই সময়ই বিদ্যাসাগর, তাঁর এই প্রায় সমবয়সী বন্ধু ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় কয়েক দিনের মধ্যেই পুরনো মাথাধরা রোগের চিকিৎসার সুফল পেলেন। সুফল পেলেন আর কিছু সমকালীন মানুষ। উপকার পেলেন ভীষণ ভাবে কোষ্ঠবদ্ধতায় আক্রান্ত ও আর কিছু অসাধ্য ব্যাধিতে কাতর রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগরের অন্যতম জীবনীকার বিহারীলাল সরকারের ভাষায়, ''এ হেন রোগে কেবল হোমিওপ্যাথিকের বিন্দুপানে আরাম হইল দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন'' (৬ক) আশৈশব যুক্তিনিষ্ঠ বিদ্যাসাগর চিকিৎসার ফল দেখে নিশ্চিত ভাবে এর গুরুত্ব বুঝতে পারলেন। আরেক জীবনীকার চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়'' তিনি যখন বুঝিলেন যে এই বিন্দু বিন্দু ঔষধ সেবনেও উপকার হইয়া থাকে, তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ঔষধের উৎকৃষ্টতা, মূল্যের অল্পতা

এবং সেবনের সুবিধা সন্দর্শনে তিনি ইহার সুপ্রচারে প্রাণপণ সাহায্য করিতে লাগিলেন।" (৭ক)

বিদ্যাসাগরের আগ্রহ হবে না কেন? তিনি তো জানেন, উনিশ শতকের দারিদ্র লাঞ্ছিত, ম্যালেরিয়া, কলেরা, প্লেগ ইত্যাদির মহামারী অধ্যুষিত তাঁর স্বদেশে, এমন স্বল্প ব্যয়ের চিকিৎসা-পদ্ধতির ব্যবহার যথার্থ এবং বাস্তব সম্মত। ইতিমধ্যে রাজেন্দ্রলাল দত্ত ও ডঃ তৌনের, ১৮৫০-৫১ সালের ম্যালেরিয়া আক্রান্ত অনেক রুগীকে সারিয়ে তুলেছেন (৫, ১৫)। ব্রিটিশ সরকার তখন দেশীয় প্রাচীন আয়ুর্বেদ বা হাকিমি চিকিৎসাকে স্বীকৃতি দিতে নারাজ (৪)। আবার পাশ্চাত্য ঘরানায় চিকিৎসায় দেশীয় মানুষের তেমন আস্থা গড়ে ওঠেনি। এই অবস্থায় ইউরোপীয় ঘরানার এই নতুন চিকিৎসা-পদ্ধতি অবলম্বন করলে দোষ কি? উনিশ শতকের অন্যতম এই প্রাণপুরুষ, চিন্তায় মননে ফরাসী-জার্মান দর্শন-সংস্কৃতির মুগ্ধ সমর্থক, স্বল্প ব্যয়ে, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াহীন এই বিদেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতিকে মনে প্রাণে গ্রহণ করলেন, বিশ্বাস করেছিলেন এর মাধ্যমেই দেশের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন বিত্তের মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা পাবে। তাই নিজে বিষয়টি সঠিক ভাবে অবগত হওয়ার চেষ্টা করলেন, উদ্বুদ্ধ করলেন, নিজের ভাই দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও আরো পরে আরেক ভাই ঈশানচন্দ্রকে। (৫খ, ১৬) এই ঈশানচন্দ্রের উত্তরাধিকারী-রাই পরবর্তীতে ভারতের হোমিও-চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বিশেষ মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছেন। শুধু নিজের ভাইদের নয়, সে কালে তাঁর আরো অনেক অনুগত মানুষজনকে শিক্ষার জন্য পাঠিয়ে ছিলেন রাজেন্দ্রলাল দত্তের দাতব্য চিকিৎসালয়ে। সেই সব শিক্ষার্থীরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চিকিৎসা করতে লাগল। এমনই একজন ছিলেন বাবু লোকনাথ মৈত্র, যিনি এই ভাবে শিক্ষিত হয়ে বিদ্যাসাগরের সুপারিশে কাশীতে গিয়ে স্বয়ং ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রীর অসাধ্য সাধন পীড়ার নিরাময় করেন। তবে এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের সব চেয়ে বড় কীর্তি সে কালের বিশিষ্ট আলোপ্যাথি ডাক্তার, ভারতে বিজ্ঞান গবেষণা প্রচারের আদি পুরুষ, মহেন্দ্রলাল সরকারকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় উৎসাহিত করায়। এ প্রসঙ্গে সুন্দর স্মৃতিচারণ করেছেন বিদ্যাসাগরের ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১খ)। ''মহেন্দ্রবাবু মধ্যে মধ্যে ভাবিতেন,

বিদ্যাসাগর মহাশয় ভারতে অদ্বিতীয় ব্যক্তি হইয়াও হোমিওপ্যাথির এত গোঁড়া কেন? এক দিবস অগ্রজের সহিত অনেক বাদানুবাদের পর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কিরূপ তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট স্বীকার করেন। এক দিবস মহেন্দ্রবাবু ও দাদা ভবানীপুরে অনারেবল দ্বারকানাথ মিত্র মহোদয়কে দেখিতে গিয়াছিলেন। তথা হইতে উভয়ে বাটী আসিবার সময়ে এক শকটে আইসেন। আমিও উঁহাদের সমভিব্যাহারে ছিলাম। গাড়ীতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা উপলক্ষ্যে ভয়ানক বাদানুবাদ হইতে লাগিল, দেখিয়া শুনিয়া আমি বলিলাম, মহাশয় আমাকে নামাইয়া দেন। আপনাদের বিবাদে আমার কর্ণে তালা লাগিল"। সে সময়ে ভারতে দ্বিতীয় এম ডি বিখ্যাত আলোপ্যাথি চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল এত সহজে রাজি হবেন কেন? তিনি স্থির করলেন এ বিষয়ে নিজে পরীক্ষা করবেন। ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভার প্রতিষ্ঠাতা উদ্যোগী মানুষটি শেষ পর্যন্ত নিজের তাগিদে এই চিকিৎসা-প্রণালী পুংখানুপুংখ রূপে অনুসন্ধান করে নিশ্চিত হলেন (১০খ)। আলোপ্যাথিচিকিৎসাত্যাগকরেসেকালে প্রতিপত্তিসম্পন্ন হোমিওপ্যাথ-চিকিৎসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। একই ভাবে এগিয়ে আসেন ডঃ বিহারীলাল ভাদুড়ী, ডাঃ অন্নদাচরণ খাস্তগির প্রমুখ। এই তাগিদের পেছনের মানুষ কিন্তু সেই দরিদ্র-প্রেমী, সমাজসেবক-গোঁয়ার পন্ডিতটি।

শখ-শৌখিনতায় নয়, রীতিমত অধ্যাবসায়েঃ

উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে শুরু করে বিশ শতকের প্রথমার্ধে আলোপ্যাথি চিকিৎসকদের পাশাপাশি সমাজের কিছু বিশিষ্ট মানুষ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় আগ্রহী হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য এরা হয়ত সকলেই বিদ্যাসাগরকেই অনুসরণ করেছিলেন। এই তালিকায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ। (১১) কিন্তু এদের সবার পূর্বসূরী বিদ্যাসাগর ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই অনন্য। কোন সাময়িক শখ অথবা শৌখিনতায় নয়, ইউরোপীয় ঘরানার এই নতুন চিকিৎসা-পদ্ধতি তিনি আয়ত্ত করেছিলেন শিক্ষার্থীর নিষ্ঠায়। ছাত্র জীবনে যে নিষ্ঠা ও পরিশ্রমে শিখেছিলেন সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, দর্শন; পরিণত বয়সে যে আকুতিতে শিখেছিলেন ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য;

জীবনের প্রৌঢ়তবে এসেও তাঁর মধ্যে শিক্ষার্থীর সেই আগ্রহে বিন্দুমাত্র ভাঁটা পড়েনি। এমন ভাবে শিখতে কিন্তু কোন দীক্ষাহীন অচিকিৎসককে দেখা যায়নি। কেমন ছিল সেই অধ্যাবসায় পর্ব?

তাঁর সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের কথায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্রতি বৎসর প্রথমে বেরিনি কোম্পানি ও পরে থ্যাকার কোম্পানির মারফৎ অর্ডার দিয়ে বিলাত থেকে অনেক টাকার হোমিওপ্যাথি পুস্তক আনাতেন, তাঁর লাইব্রেরি এই সব বইতে ভরা থাকত।(১খ), বিদেশে সদ্য প্রকাশিত হোমিওপ্যাথি বই কিনে গোগ্রাসে পড়েছেন, ভাল করে অ্যানাটমি শেখার জন্য নরকঙ্কাল অবধি বিদেশ থেকে কিনেছেন। তার জন্য প্রথামাফিক পাঠ নিয়েছেন সে কালের বিখ্যাত অ্যানাটমির অধ্যাপক ডঃ চন্দ্রমোহন ঘোষের কাছে। ডঃ ঘোষের সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে নিয়মিত পাঠ নিতে যেতেন। (৬খ)। হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসায় রোগ-লক্ষণ পর্যবেক্ষণ খুব দরকারি। দরকার সে সব তথ্য নথিভুক্ত করা যাতে পরবর্তীতে রোগের অনুসন্ধান পর্বে ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, নিরাময় সহজ হয়। এর জন্য একেবারে প্রথা মাফিক ভাবে ডায়েরিতে নথিভুক্ত করেছেন রোগ লক্ষণ, রিপোর্ট এবং নিরাময় কাল। ইন্দ্রমিত্রের লেখা বিদ্যাসাগরের জীবনীতে এ রকম নয় জনের কেস-হিস্ট্রির উল্লেখ আছে। সে সব রোগের প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন, বমি ও হিক্কা, ক্ষুধামান্দ্য অম্বল, গোড়ালি ব্যথা, পেট ব্যথা, পাতলা মল, নিতম্বে ফোঁড়া থেকে শুরু করে জরায়ুর ক্যান্সার, এমনকি অতিরিক্ত রজস্রাব, সাদা স্রাব্য ইত্যাদি মেয়েলি অসুখের উল্লেখ ও প্রেস্ক্রাইবড ওষুধের কথা আছে। শেষোক্ত দুটি অসুখের রোগিনী যথাক্রমে তাঁর কন্যা ও পুত্রবধূ। একুশ শতকের পটভূমিতে যা সহজ ও স্বাভাবিক বলে মনে হয়, উনিশ শতকের পটভূমিতে পুত্রবধূ অসংকোচে গোপনীয় রোগের বিবরণ দিচ্ছেন চিকিৎসককে এবং চিকিৎসক শ্বশুরমশাই স্বয়ং পুত্রবধুর স্ত্রী রোগের চিকিৎসা করছেন, নথি রাখছেন, নিঃসন্দেহে এক বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা। (৮খ) চিকিৎসা-শাস্ত্রে কোন রকম ডিগ্রী না নিয়ে অকুতোভয়ে চিকিৎসা করেছেন একাদিক্রমে অনেক বছর, বেশ কিছু রোগের, যেমন সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের কিছু নিয়মিত অসুখ যেমন ঠান্ডা লাগা, জ্বর, পেট ব্যথা, অম্বল ইত্যাদি। আর এই ব্যাপারে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগে থেকেছেন বয়সে ১৩ বছরের ছোট বিখ্যাত চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল

সরকারের সঙ্গে। ১৮৭৯ সালের ১২ই এপ্রিল পেট ব্যথায় কাতর মহেন্দ্রলাল চিকিৎসার পরামর্শের জন্য বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করলেন। এক মাস পর, বিদ্যাসাগরের নাতির শরীর খারাপের কারণে তার চিকিৎসা করতে বিদ্যাসাগরের বাড়ি গেলেন মহেন্দ্রলাল। বিদ্যাসাগর তাঁকে উপহার দিলেন লিবেন্থ্যালের লেখা হোমিও থেরাপিউটিকস্ (Libenthal's Homeo Therapeutics)। এক সপ্তাহ পর মহেন্দ্রলাল শিশু রুগীর কুশল সংবাদ জানতে পুনর্বার দেখতে এলেন এবং বিদ্যাসাগরকে উপহার দিলেন হেইনিগসের আনালিটিক্যাল থেরাপিউটিক্স (Heineg's Analytical Therapeutics)। এভাবেই দুই বিশিষ্ট মানুষ একে অপরের প্রেস্ক্রিপ্সানের যথার্থতা যাচাই করে নিয়েছিলেন এবং অব্যাহত রেখেছিলেন চিকিৎসা বিদ্যার সারস্বত প্রবাহ।(১০খ)

চিকিৎসক বিদ্যাসাগর ঃ কিছু স্মৃতি, কিছু কথা ঃ

সারা জীবন অজস্র ব্যধিতে ভুগেছেন বিদ্যাসাগর। খুব শৈশবে প্লীহার অসুখে আক্রান্ত হওয়া থেকে শুরু করে ক্রনিক পেট ব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরাময়, রক্ত আমাশা, ইত্যাদি ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী (১০গ)। পরিণত বয়সে কাজের তাগিদে বিস্তৃত ভ্রমণ করতে হয়েছে হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার প্রত্যন্ত প্রান্তে। খুব কাছ থেকে দেখেছেন গ্রামের দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্য-পরিষেবাহীন দিনলিপি। সামান্য উপায় খুঁজে পেলে একজন অতি সংবেদনশীল মানুষ কি পারেন সমস্যা থেকে মুখ ফেরাতে? বিদ্যাসাগরের চিরকালীন করুণাসিক্ত মন সীমাহীন উৎসাহে তৎক্ষণাৎ পরোপকারে প্রবৃত্ত হয়েছে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় মনোনিবেশ সেই চিত্তবৃত্তিরই প্রকাশ।

অধ্যাপক ক্ষুদিরাম বসু স্মরণ করেছেন, তাঁর একবার পেটের ব্যায়রাম হওয়ায় সেকালের বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক ডঃ প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, ব্রজেন বাঁড়ুজ্জের ওষুধ কাজ দিচ্ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁকে দেখতে এসে বই খুঁজে খুঁজে ওষুধ দিলেন, দু তিন বার সেই ওষুধ খাওয়ার পর সুস্থ হয়েছিলেন। স্বয়ং মহেন্দ্রলাল সরকারের ওষুধ পাল্টে দিয়ে বিদ্যাসাগর আরেক রোগী লালদবিহারী দের লিভার আবসেস সারিয়েছিলেন।(১২)

বিদ্যাসাগরের হোমিওপ্যাথি চর্চার অত্যন্ত মানবিক (নাকি ঐশ্বরিক) বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর কারমাটড় বাস কালে দরিদ্র শিক্ষাহীন সাঁওতালদের সান্নিধ্যে। বিহারীলাল সরকার লিখছেন, ‘‘সাঁওতাল প্রবল পীড়ায় শয্যাগত, বিদ্যাসাগর তাহার শিয়রে বসিয়া মুখে ঔষুধ ঢালিয়া দিতেন, হাঁ করাইয়া পথ্য দিতেন, উঠাইয়া বসাইয়া মলমূত্র ত্যাগ করাইতেন, সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিতেন’’ —। এ আন্তরিকতার হদিশ পেয়েছে শুধু সাঁওতালরা নয়, সমাজের বিভিন্ন বৃত্তের মানুষ আর এই প্রয়াসের বলিষ্ঠতা তাঁর আকৈশোরের অভ্যাস অথবা বলা ভাল জীবন-ধর্ম। এই মরমী মনটি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বহু আগে থেকেই ছিল। সে কোন কৈশোর কালে বাবা ঠাকুরদাসের আশ্রয়দাতা জগদ্দুর্লভ সিংহের পরিচিত কিছু মানুষ কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে শুনে বালক ঈশ্বরচন্দ্র বাবা ও দুই ভাই এর ভোজনের আয়োজন করে অসহায় পাঁচজন রোগীর কাছে গেলেন। ক্রমাগত বমি ও মলত্যাগে ক্লান্ত ও পিপাসার্ত মানুষগুলির জন্য স্থানীয় গৃহস্থ বাড়ি থেকে জল এনে খাওয়ালেন, ডাক্তার রূপচাঁদের বাড়ি থেকে বেদানা, মিছরি, এক কলসি পরিষ্কার জল এনে রোগীদের খাওয়ালেন, নিজের হাতে বমি-মলমূত্র পরিষ্কার করে ধোওয়া কাপড় পরালেন। ডাক্তারের জল চিকিৎসায় আর ঈশ্বরচন্দ্রের সেবায় ক্রমে রোগীরা সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল। (৮ক) ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষে, কলকাতার কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে উপোসী মানুষকে নিজে হাতে খাবার পরিবেশন করেছেন, বীরসিংহ গ্রামে অন্নসত্র খুলেছেন, বিদ্যাসাগরের করা হুকুম, যত টাকা খরচ হোক, কেউ যেন অভুক্ত না থাকে। ১৮৬৯-৭০ সালে বর্ধমানে এক ভয়ানক জ্বরে প্রচুর মানুষ মারা যায়। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সেই সব মানুষদের বিদ্যাসাগর সেবা, ঔষধ, পথ্য দিয়ে সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করেছেন। সে কথা বিস্তৃত ভাবে লিখেছেন তাঁর জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল সরকার (৬গ, ৭গ)। সেই জ্বর ছিল প্রকৃতপক্ষে ম্যালেরিয়া। বিদ্যাসাগর এ রোগের চিকিৎসার জন্য ডিস্পেন্সারি, ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থা করে ক্ষান্ত হন নি, কলকাতায় এসে সে কালের ছোটলাট গ্রে সাহেবের কাছে বিষয়ের গুরুত্ব বোঝান। এর ফলে সরকারী বদান্যতায় আরো অনেক ডিস্পেন্সারি খোলা হল। বিদ্যাসাগরের ডিস্পেন্সারি থেকে শুধু ওষুধ পথ্য নয়, পয়সা ও পরণের কাপড় পর্যন্ত পাওয়া যেত। এই ডিস্পেন্সারির কাজে বিদ্যাসাগরকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন প্যারিচাঁদ মিত্রের ভাইপো

ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ মিত্র। ম্যালেরিয়া রোগীকে সেখান থেকে কুইনাইন দেওয়া হোত, প্রয়োজনে তাদের বাড়ি গিয়েও বিদ্যাসাগর স্বয়ং ওষুধ পথ্য পৌঁছে দিয়ে আসতেন। (৮গ) বিদ্যাসাগরের এই অনন্য সাধারণ সেবার কথা স্মরণ করেছেন আরেক বিশিষ্ট মানুষ রজনীকান্ত গুপ্ত, ১৮৮৩ সালে, ''একদা তিনি (বিদ্যাসাগর মশাই) প্রাতঃকালে ভ্রমণ করিতে করিতে এই নগরের প্রান্তভাগ অতিক্রম করিয়া কিয়দ্দূর গিয়াছেন, সহসা দেখিলেন একটি বৃদ্ধা অতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া পথের পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিয়াই তিনি ওই মললিপ্ত বৃদ্ধাকে পরম যত্নে ক্রোড়ে করিয়া আনিলেন এবং তাহার যথোচিত চিকিৎসা করাইলেন। দরিদ্রা বৃদ্ধা তাহার যত্নে আরগ্য লাভ করিল''(১৩)।

আসলে বিদ্যাসাগর সারাজীবন যখন যে কাজে নেমেছেন, সেখানে তাঁর নিষ্ঠায় কোন খাদ রাখেন নি, ত্রুটিহীন কর্ম সম্পাদনকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ক্ষেত্রেও এর অন্যথা দেখা যায়নি। চিকিৎসকের ডিগ্রী না থাকলেও তাঁর ছিল তন্নিষ্ঠ চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, অপার ধৈর্য এবং সীমাহীন মমতা, যে গুণগুলি না থাকলে একজন ডিগ্রীধারি চিকিৎসকও ব্যর্থ হয়ে যেতে পারেন। কারমাটড়ে একদিন সকালে এক মেথর কাঁদতে কাঁদতে এসে তাঁকে বলল, আমার ঘরে মেথরানির কলেরা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলেন বিদ্যাসাগর, ওষুধের বাক্স আর মোড়া নিয়ে এক ভৃত্য তাঁর সাথী হল। সারাদিন রোগিনীর কাছে থেকে, প্রয়োজনীয় ওষুধ দিয়ে তাকে কিছুটা ভাল দেখে সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে স্নানাহার করলেন (৮গ)।

চিকিৎসক অগ্রজের আরও অন্তরংগ পরিচয় দিয়েছেন সহোদর শম্ভুচন্দ্র। ১৮৭৫ সালে তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছিল, ''দাদা প্রাতঃকাল হইতে বেলা দশ ঘটিকা পর্যন্ত সাঁওতাল স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অজস্র বই। শারীরবিদ্যায় প্রগাঢ় অনুরাগ ও যথোচিত জ্ঞান না থাকলে কি আর জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মেয়েদের সহবাস সম্মতি বিলে পূর্ব নির্দিষ্ট বারো বছর বয়সটিকে মান্যতা দিতে আপত্তি জানান! শুধু শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে নয়, তিনি জেনেছিলেন স্বদেশের মেয়েদের রজঃস্বলা হওয়ার বয়স বারো বছরে স্থির থাকেনা, তেরো চোদ্দ এমন কি পনেরোতেও পৌঁছতে পারে। এ ধারনা পেতে তাঁকে নিশ্চিত ভাবে সাহায্য করেছিল বাঙ্গলায় প্রথম শব

ব্যবচ্ছেদকারী, সংস্কৃত কলেজে একদা বৈদ্যক শ্রেণির ছাত্র, পরবর্তীতে পাশ্চাত্য চিকিৎসায় শিক্ষিত চিকিৎসক এবং তাঁর প্রিয়জন পণ্ডিত ও গবেষক মধুসূদন গুপ্ত (১৭)।

সবশেষে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উল্লেখ না করলেই নয়। পুরোনো হাঁপানির রোগী বিদ্যাসাগর শীতকালে বিশেষ ভাবে কষ্ট পেতেন। তখন তাঁর অভ্যাস ছিল সকাল-বিকেল দুবেলা গরম চা পান। একদিন চা পানের পর তাঁর মনে হল বেশ সুস্থ লাগছে, হাঁপানির টান যেন বেশ কিছুটা কম। গৃহভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন, সেদিনের চা সে নিজেই তৈরি করেছে। বিদ্যাসাগর প্রশ্ন করলেন, চায়ের মধ্যে কি আদার রস মেশানো হয়েছে? গৃহভৃত্য বলল, না সেরকম কিছু সে করেনি, তবে তাড়াহুড়োয় কেটলিটি না ধুয়েই জল চাপিয়ে দিয়েছি। কেটলি খুলে দেখে বিদ্যাসাগর যুগপৎ বিস্ময় এবং ঘৃণা অনুভব করলেন। কেটলির মধ্যে দুটি আরশোলা পড়ে আছে। বিদ্যাসাগরের অনুসন্ধিৎসু মন বলল, এক কেটলি জলে যদি বেশ কিছু আরশোলা ফুটিয়ে, পরে সেই নির্যাস অ্যালকোহলে ফেলে, ছেঁকে ও পরে লঘু দ্রবণ করে হোমিওপ্যাথি ওষুধ বানান যায়। ভুবনকৃষ্ণ মিত্র (১৪) লিখেছেন, এ ভাবে হোমিওপ্যাথি মতে ওষুধ তৈরি করে তিনি বহু রোগীকে না জানিয়ে এই ওষুধ সেবন করান, এবং বিনা ব্যয়ে বহু লোকের রোগের উপশম ঘটান। যে কোন যুক্তিনিষ্ঠ মন অপ্রাকৃত কিছু দেখলে অনুসন্ধানে ব্যস্ত হবেই। বিদ্যাসাগরও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। প্রাচীন চীনা চিকিৎসা বিদ্যায় এই প্রাণিটির হাঁপানি সারানোর ভূমিকা কিন্তু স্বীকৃত। আর বর্তমানে হাঁপানির নিরাময়ে হোমিওপ্যাথি ওষুধে এই প্রাচ্যদেশীয় তথা ভারতবর্ষীয় আরশোলা থেরাপির কথাও কিন্তু মান্যতা পেয়েছে।(৯)

কিন্তু এই গবেষণার ইতিহাসে সেই সুপ্রাচীন সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত, সমাজসেবী এবং স্বশিক্ষায় শিক্ষিত ডিগ্রীহীন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক বিদ্যাসাগরের আদি পরীক্ষাটির কথা হয়ত বা একালের হোমিওপ্যাথি গবেষকেরা কেউই জানেন না।

তথ্য সহায়তা ঃ

১। ক) শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, *বিদ্যাসাগর জীবন চরিত ও ভ্রম নিরাস,* চিরায়ত প্রকাশন মার্চ ২০১৯, পৃঃ ৯৫

খ) ঐ পৃঃ ৯৬

২। উইকিপেডিয়া ঃ *স্যামুয়েল হ্যানিম্যান*

৩। ডঃ জি এম ফারুক, *আধুনিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা*, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ৩রা জুলাই ২০১২।

৪। Dilli Homeopathic Anusandhan Parishad; Origin and Growth of Homeopathy in India (http://www,delhihomeo.com)

৫। ক) শঙ্কর কুমার নাথ ঃ ''চিকিৎসা বিজ্ঞানে আত্মমগ্ন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর''; *অজানা বিদ্যাসাগর ঃ অনন্য দিশারি* (গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত), বিদ্যাসাগর চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্র, কলকাতা ২০১৯, পৃঃ ৭১-৭২

খ) ঐ পৃঃ ৭৩

গ) ঐ পৃঃ ৭৭-৭৮

৬। ক) বিহারীলাল সরকার, *বিদ্যাসাগর,* ১৮৯৫, পৃঃ ৪৮৯

খ) ঐ পৃঃ ৪৯১

গ) ঐ পৃঃ ৫০০-৫০১

৭। ক) চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিদ্যাসাগর,* ১৯০৯, পৃঃ

খ) ঐ পৃঃ ৫০৩

গ) ঐ পৃঃ ৪৯৭

৮। ক) ইন্দ্র মিত্র, *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর,* আনন্দ, কলকাতা, ২০১২, পৃ ১০২-১০৩

খ) ঐ পৃঃ ৩২-৩৬

গ) ঐ পৃঃ ৪২১

ঘ) ঐ পৃঃ ৪২৩

ঙ) ঐ পৃঃ ৪২৫

৯। Biswas B, Jhansi S, potu R, patel S et al Physicochemical study of homeopathic drug, Blatta orientalis. Indian J Res Homeopathy 2018:12:125-31

১০। ক) Brian A Hatcher, *Vidyasagar : The Life and after Life Of an eminent Indian*, Routledge, India 2019, p. 97

খ) Ibid, p. 99

গ) Ibid p. 100

ঘ) Ibid, p. 101

১১। Datta Gupta Mahua, *Negotiating the Trajectory of a Marginal Medical Discipline : Homeopathy in Colonial Bengal*, Ph. D Thesis submitted to the University Of Burdwan 2015

১২। ক্ষুদিরাম বসুঃ *বিদ্যাসাগর স্মৃতি*, পঞ্চ পুষ্প, আষাঢ় ১৩৬৬, পৃঃ ২৯৩

১৩। রজনীকান্ত গুপ্ত, *স্বর্গীয় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর*, ১৮৯৩, পৃঃ ১৭

১৪। ভুবনকৃষ্ণ মিত্র ঃ জীবতত্ত্ব, জন্মভূমি, ফাল্গুন ১৩০৮, পৃ ২৫০-২৫১

১৫। Hazra S, *Indian Renaissance Of Homeopathy.* (https://www.homeotimes.com)

১৬। Press information Bureau, Govt of India, President's Secretariat, 22.08.2016. (https://pib.gov.in)

১৭। ডঃ শঙ্কর কুমার নাথ, ''কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের গোরার কথাও পন্ডিত মধুসূদন গুপ্ত'', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৯, পৃ ২৫১-২৫৬

রসেবশে বিদ্যাসাগর

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভাষায় ''বিদ্যাসাগরের রোদনপ্রবণতা ছিল তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষ লক্ষণ। ...বাহিরটা বজ্রের মত কঠিন আর ভিতরটা পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল''।

এমন একজন দয়াশীল, দানশীল, মানবদরদী মানুষটিকে দয়ারসাগর বা করুণাসাগর রূপেই আমরা দেখে এসেছি। ইন্দ্র মিত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ ''করুণাসাগর বিদ্যাসাগর'' থেকেই ধার করে বলি, খর্বাকৃতি, চক্রাকারে মুণ্ডিত মস্তক, নিমজ্জিত তীক্ষ্ণ নেত্র, দৃঢ়প্রতিজ্ঞাব্যাঞ্জক অধরভঙ্গির এই মানুষটির মধ্যে যে সুপ্ত এক রসবোধ ছিল আর তা যে আভাসে ইঙ্গিতে, কথোপকথনে মাঝেমধ্যেই অবলীলাক্রমে উথলে উঠত তাই নিয়েই আজকের আলোচনা। যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ''আপনি নিজে পান সাজেন কেন?'' বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, ''আমি যে উড়ে রে, মেদনীপুরের উড়ে। দেখিস নি উড়েরা নিজের হাতে পান সেজে খায়?''

এমন অকপট, সরল আর সত্যভাষণ যে মানুষ করতে পারেন তাঁর কলমে রস উপচে পড়বে সেটাই স্বাভাবিক।

বিদ্যাসাগরের নিজের শিক্ষক শ্রীযুক্ত জয়গোপালের বাড়িতে ঘটা করে সরস্বতী পুজো হত। একবার পুজোর দিন ছাত্ররা দিনে-রাতে দুবেলাই তাঁর বাড়িতেই খাওয়াদাওয়া করতো। আর পুজোর আগের দিন ছাত্রদের জয়গোপাল সংস্কৃত শ্লোক লিখতে দিতেন সরস্বতীর বর্ণনা করে। ঈশ্বরচন্দ্র নারাজ শ্লোক লিখতে। কিন্তু সেবার এড়াতে পারলেন না শিক্ষাগুরুকে। তাঁর অনুরোধে লিখে ফেললেন নীচের মজার শ্লোকটি

'লুচি কচুরী মতিচুর শোভিতং
জিলেপি সন্দেশ গজা বিরাজিতম্
যস্যা প্রসাদেন ফলারমাপ্লুমঃ
সরস্বতী সা জয়তান্নিরন্তরম'

ছাত্রের লেখা এই শ্লোক জনে জনে ডেকে ডেকে শুনিয়েছিলেন শিক্ষক জয়গোপাল। এমন রসাল শ্লোক যিনি অনায়াসে লিখতে পারেন তিনি যে কেন আর্য্য রম্য রচনা করেন নি সেটাই ভাবায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত পজিটিভিস্ট লেখক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ছিলেন বিদ্যাসাগরের পরম স্নেহধন্য। তাঁর স্মৃতি চারণায় অনেক মজার কথা উঠে আসে। এযাবৎ বহু বিদ্বজনের লেখায় বিদ্যাসাগর কে আমরা জেনেছি সমাজ সংস্কারক, পণ্ডিত প্রবর, সংস্কৃতভাষায় চঞ্চু, বজ্রকঠিন চরিত্রের অধিকারী এবং মাতৃভক্ত রূপে। এ বিষয়গুলি বহু চর্চিত। তাঁর মত সিরিয়াস লেখক সত্ত্বায় কখনও কখনও রম্যরসেরও যে সঞ্চার হতে পারে তা খোঁজার চেষ্টায় কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য-এর লেখা পড়তে শুরু করি। যিনি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন বিদ্যাসাগরকে।

কৃষ্ণকমল বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের সুবিখ্যাত ডাক্তার জনসনের সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষা ব্যবহার প্রসঙ্গে এই অনুচ্ছেদটি খুব উল্লেখযোগ্য।

'যিনি লিখিবার সময় গমগমে Johnsonese ও Latinisims ছাড়া আর কিছুই লিখিতে পারিতেন না, তিনি কিন্তু সাধারণ কথাবার্তায় একটিও ল্যাটিন কথা ব্যবহার করিতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সাধারণ কথাবার্তায় সংস্কৃত শব্দ আদৌ ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার লেখা পড়িলে মনে হয় যে, যেন তিনি সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না; কিন্তু লোকের সঙ্গে মজ্‌লিশে কথা কহিবার সময় এমনকি বাঙ্গালা slang শব্দ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না—। ফ্যাপাতূড়ো খাওয়া (to be confounded) 'দহরম মহরম', 'বনিবনাও', 'বিধঘুটে', 'বাহবা লওয়া' — এই রকমের ভাষা প্রায়ই তাঁহার মুখে শোনা যাইত।'

সাঁওতালদের নিয়ে তাঁর সহজ কথোপকথন বেশ মজার। 'মোকদ্দমার সময়ে যখন হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সাঁওতাল প্রথমে মিথ্যা কথা বলিল — অমুক শিমূল গাছটা বটে, পরক্ষণেই আসল কথাটি আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না;

আপনা হইতে বলিয়া উঠিল, কিন্তু ঐ গাছটি বটে, বলিয়া আর একটি গাছ দেখাইয়া দিল। এই গল্পটি বিদ্যাসাগর মহাশয় এই গল্পটি করিতেন আর হাসিতেন; বলিতেন, 'দেখ ইহারা এখনও কেমন সাদাসিধে আছে; সত্যটা কোনও রকমেই গোপন রাখিতে পারে না'।

বিদ্যাসাগরের আরেকজন প্রিয়পাত্র ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর আরেক নামকরা পণ্ডিত শিক্ষক-অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর।

তাঁর কাঁপড় চেনার দক্ষতার কথা উল্লেখ করেছেন এই পূর্ণচন্দ্র। জোড়াসাঁকোর ন্যায়রত্ন কোম্পানীর দোকানে বিদ্যাসাগর কাপড়-চোপড় কিনতেন। দুর্গাপুজোর আগে পূর্ণচন্দ্র আর তাঁর শ্বশুর সেই দোকানে গিয়ে দেখেন স্তূপাকার কাপড় থেকে তিনি কাপড় বাছাই করছেন। পাশাপাশি একটি অপরিচিত গরিব কৃষকের বৌ-এর জন্য কাপড় কিনতে এসে দাম শুনে পিছিয়ে যাওয়া দেখে করুণাপরবশ হয়ে নিজেই তাকে কাপড়টি কিনে বলছেন, 'এই কাপড়খানি তোর বৌকে দিলাম'। দুই বড় গাঁটরি কাপড় কিনে পুজোর বার্ষিক দেওয়ার জন্য কিনলেন — আবার পূর্ণচন্দ্রের শ্বশুরের অনুরোধে তাঁর জন্য কাপড় বেছেও দিলেন। যেকানে থাকবেন সকলকে ভালোবেসে — কাছে টেনে একটি অপূর্ব জগৎ তৈরি করতে পারতেন। হুঁকো হাতে করে জোড়াসাঁকোর দোকানে তিনি জমিয়ে বসে কাপড় কিনছেন, আড্ডাও দিচ্ছেন — এই ছবিটি ভোলা যায় না। পূর্ণচন্দ্রের শ্বশুর তাঁকে দেখে বলেছিলেন, 'অদ্য সাক্ষাৎ সরস্বতী দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিলাম'। বিদ্যাসাগর সপাটে উত্তর দিয়েছিলেন, 'এ যে বাবা-সরস্বতী হে!' এমন অকপট রসবোধ ছিল তাঁর সহজাত।

কৃষ্ণকমল বিদ্যাসাগরের এহেন উৎকৃষ্ট রসবোধের অনন্যতা স্মরণ করে বলেছেন, 'এই রসিকতা সে কালের ঈশ্বরগুপ্ত বা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্যের মত গ্রাম্যতাদোষে দূষিত নহে, ইহা ভদ্রলোকের, সুসভ্য সমাজের যোগ্য। এরূপ উচ্চ অঙ্গের রসিকতা বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই আছে।' 'ব্রজবিলাস', 'রত্নপরীক্ষা', 'কস্যচিত ভাইপোস্য' গ্রন্থগুলিতে কৃষ্ণকমল ভলতেয়ারের রসবোধের অনুরণন শুনেছেন। আপাত বাঙালী তাঁর চরিত্রের এই দিকটায় বিশেষ আলোকপাত করেনি। বাঙালি পাঠক বোধহয় এই রসবোধের কদর করতে পারেনি।

কৃষ্ণকমল লিখেছেন, 'যদি য়ুরোপে হইত, তাহা হইলে এ প্রকারের গ্রন্থপাঠ করিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা হাস্যপরিহাসের তরঙ্গ বহিয়া যাইত, এবং বিদ্যাসাগরের নাম এক্ষণে বিদ্যাধতার জন্য যে প্রকার উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে, রসিকতার জন্যও তদ্রূপ উচ্চস্থান অধিকার করিত, সন্দেহ নাই।'

শুধু লেখার নয়, বলাবাহুল্য তাঁর কথাবার্তায় এই রসবোধ উচ্ছলিত হত। বাঙালি হয়ত বিদ্যাসাগরের রসিকতার মূল্যায়ন সেভাবে করতে পারেনি। কৃষ্ণকমল আরও দু একটি ঘটনা তাঁর লেখার মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

তখন বেথুন স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন ফিরিঙ্গী যার স্কুলের একজন পণ্ডিতের ওপর অকারণ আক্রোশ ছিল। তাঁকে পদচ্যুত করার জন্য তিনি উঠে পড়ে লেগেছিলেন। তদন্তের ভার ছিল বিদ্যাসাগরের ওপর। তিনি পণ্ডিতের দোষ কিছুই পেলেন না। কমিটি মেম্বাররা পড়লেন বিপদে, তাঁরাও শ্বেতাঙ্গ, প্রধানা শিক্ষয়িত্রীও তাই। এদিকে পণ্ডিতকে একেবারে ছেড়ে দিলে হেড্ মিস্ট্রেসকে অপমান করার মতো ব্যাপার দাঁড়ায়। তাঁরা বলাবলি করলেন 'তবে দুএকমাসের জন্য পণ্ডিতকে সাসপেন্ড করা যাক।' বিদ্যাসাগর যেন আপাত উদাসীন ভাবে ''শ্যাম রাখি না কুল রাখি'' করে বললেন, 'Yes do it, if you think some sacrifice is necessary to appease her.' দেবী কিছু বলিদান না হলেও যখন সন্তুষ্ট হবেন না — ভাবটা এমন। সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন। পণ্ডিতও সে যাত্রায় বেঁচে গেলেন।

আরও একটি ঘটনা। একবার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সভা গভমেন্টের কাছে কোনও এক বিষয়ে দরখাস্ত করে বিলক্ষণ অপমানিত হয়। বিদ্যাসাগর তাদের বিমর্ষভাব দেখে ফিরে এসে বললেন, 'ওহে, আজকে political world-এ যে বড়ই gloom দেখে এলুম।' এই gloom কথাটা তিনি এমন মুখভঙ্গী করে বললেন যারা শুনছেন সবাই হেসে ফেলল।

অনেক শিক্ষিত বাঙালিই এখনও জানেন না কোন শব্দটি আসলে ঠিক। দুরবস্থা না কি দুরাবস্থা। সে যুগে বিদ্যাসাগর তা নিয়েও মশকরা করেছিলেন। এক পণ্ডিত এসে তাঁকে বলে 'আমার বড়ই দুরাবস্থা।' বিদ্যাসাগরের উত্তর ছিল 'সে ত আকারেই বুঝতে পারছি।' স্বভাবতই 'আকার' শব্দটি এখানে দ্ব্যর্থব্যঞ্জক। যদিও পণ্ডিতটির

রোজগারের একটা ব্যবস্থা করতে তাঁর ভুল হয়নি। তবুও তাঁর এই মজা করে বলাটাও মনে দাগ কাটে।

বিদ্যাসাগর মশাই বোলপুর-রায়পুরের এক ধনী জমিদার সিংহমশাইদের প্রায়ই বাড়িতে বেড়াতে যেতেন। সেই বাড়ির ব্রাহ্মণ পাচকের নাম ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী। বাড়ির সকলে তাঁকে ঠাট্টা করে 'বিদ্যাসাগর' বলেই ডাকতেন। একদিন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সে বাড়িতে নিমন্ত্রিত। কর্তামশাই ছেলেদের সাবধান করে দিলেন আজ যেন কিছুতেই পাচককে 'বিদ্যাসাগর' বলে ডাকা না হয়। তবুও ভুল হল। ছেলেরা যেই ডেকে ফেলেছে 'বিদ্যাসাগর, ঝোল দিয়ে যাও' অমনি ব্যাপারটা অনুধাবন করতে বিদ্যাসাগর মহাশয় রান্নাঘরের সামনে গেলেন। তখন তাঁকে সব খুলে বলতেই হল। বিদ্যাসাগর না করলেন রাগ না হাসলেন। বরং সেই পাচককে বললেন, 'ভাই ঈশ্বর। তুমি আজ থেকে আমার 'মিতে' হলে। কাল তুমি রাঁধবেনা। আমি নিজে হাতে সবাইকে রেঁধে খাওয়াবো। কাল তোমায় ছুটি দিলাম'। তারপর যতবার তিনি ঐ বাড়ি গিয়েছেন তখনি 'মিতে'র খোঁজ নিয়েছেন। এই গল্পটি আমাদের শেখায়, ভাবায়। শুধু হাসি নয়, এর মধ্যে সহমর্মিতা সমবেদনার প্রমাণ প্রতি ছত্রে ছত্রে।

ঘোর নাস্তিক বিদ্যাসাগরের ঈশ্বর নিয়ে মাথাব্যাথা না থাকলেও মানুষের প্রতি অবজ্ঞা বা অপমান কোনটাই তিনি সহ্য করতেন না।

এই আপাত গম্ভীর মানুষটি যে এত রসিক মনের অধিকারী ছিলেন তার আরও প্রমাণ আছে। তাঁর লেখায় শ্লেষাত্মক কৌতুক কীভাবে যে খরশান হয়ে উঠত তার সামান্য নিদর্শন হিসেবে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন কৃষ্ণকমল। প্রথমটি 'ব্রজবিলাস' থেকে। বিধবা বিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন। তাঁর উদ্দেশ্যে 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' ছদ্মনামে বিদ্যাসাগরের উত্তর রম্যরসের সঙ্গে স্যাটায়ার মিলেমিশে একাকার সেখানে।

কেমন ছিল সেই রম্যরস তা দেখা যাক এবার।

'এই প্রশংসনীয় দেশের অতি প্রশংসনীয় সাধুসমাজের অভিমত, নিরতিশয় প্রশংসনীয়, নির্মল, সনাতন ধর্মের অপার মহিমা!!! বোধ করি, এমন নিরেট, টনটনিয়া, নিখিরকিচ ধর্ম ভূমণ্ডলে আর নাই। ইঁহার ক্ষমাগুণ ও হজমশক্তি অতি

অদ্ভুত। ইনি অপেয়মান, অভক্ষ্যভক্ষণ, অগম্যগমন প্রভৃতি অনায়াসে ক্ষমা করিতেছেন হজম করিতেছেন। এইরূপ অদ্ভুদ ক্ষমতাশালী হইয়াও কি কারণে ঠিক বলিতে পারিনা, কেবল একটি অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে, অর্থাৎ বিধবাবিবাহে, ইনি কিঞ্চিৎ অংশে দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখাইতেছেন। ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন, সাধুসমাজের অভিমত নির্মল সনাতন ধর্ম লোক ভাল, তার সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি বড় পক্ষপাতী; পুরুষজাতির উপর, তিনি যত সদয়, স্ত্রীজাতির উপর, তিনি তত সদয় নহেন। আমার বিবেচনায় কিন্তু, তাঁহার উপর, এ অপবাদ প্রবর্তিত হইতে পারেনা। কারণ, তিনি স্ত্রীজাতির উপরেও বেয়াড়া সদয়। দিব্য চক্ষে ঘর ঘর দেখিয়ে লও, তিনি স্ত্রীজাতির ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন প্রভৃতি, অকাতরে, বিনা ওজরে, ক্ষমা করিতেছেন, হজম করিতেছেন। তবে, তাহাদের পুনর্বার বিবাহে যে যৎকিঞ্চিৎ গোলযোগ করিতেছেন, তাহা, ধরাধরি করিতে গেলে, একপ্রকার দোষের কথা বটে।'

'বহুবিবাহ' গ্রন্থ থেকে গৃহীত দ্বিতীয়টি আরো মারাত্মক। হিন্দু পুরুষের বহু বিবাহ রোধ করার জন্য তাঁর প্রাণপণ চেষ্টা তখন বিফল হলেও বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে এই বিষয়ে আইন পাস হয়েছিল। বিদ্যাসাগরমশাই যে সময়ের থেকে বহু অগ্রবর্তী ছিলেন তা না বললেও চলে। এই বিষয়ে তবু একশোবছর পরে তাঁর দেখানো পথে পদক্ষেপ করা সম্ভব হয়েছে। বহুবিবাহের বিপক্ষে যুক্তি সাজাতে গিয়ে বিদ্যাসাগর স্বভাবতই কৌলীন্যপ্রথাকে আক্রমণ করেছেন। এই কদর্য প্রথা যে বঙ্গসমাজে কীভাবে রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, চরিত্রভ্রষ্টতা, অসদাচরণ, অর্থলালসা বাড়িয়ে তুলছিল তার তথ্যভিত্তিক বিবরণ তাঁর থেকে ভালোভাবে আর কেউ দেননি।

'যে সকল হতভাগা কন্যা স্বকৃতভঙ্গ অথবা দুপুরুষিয়া পাত্রে অর্পিতা হয়েন, তাঁহারা যাবজ্জীবন পিত্রালয়ে বাস করেন। বিবাহকর্তা মহাপুরুষেরা, কিঞ্চিৎ দক্ষিণা পাইয়া, কন্যাকর্তার কুলরক্ষা অথবা বংশের গৌরববৃদ্ধি করেন, এইমাত্র। সিদ্ধান্ত করা আছে, বিবাহকর্তাকে বিবাহিতা স্ত্রীর তত্ত্বাবধানের, অথবা ভরণপোষণের ভারবহন করিতে হইবেক না। সুতরাং কুলীন মহিলারা, নামমাত্রে বিবাহিতা হইয়া, বিধবা কন্যার ন্যায়, যাবজ্জীবন পিত্রালয়ে কাল যাপন করেন।

স্বামিসহবাস-সৌভাগ্য বিধাতা তাঁদের অদৃষ্টে লেখে নাই, এবং তাঁহারাও সে প্রত্যাশা করেন না। কন্যাপক্ষীয়েরা সবিশেষ চেষ্টা পাইলে, কুলনীজামাতা শ্বশুরালয়ে আসিয়া দুই চারিদিন অবস্থান করেন। কিন্তু সেবা ও বিদায়ের ত্রুটি হইলে, এ জন্মে আর শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করেন না।

কোনও কারণে কুলীনমহিলার গর্ভসঞ্চার হইলে, তাহার পরিপাকার্থে কন্যাপক্ষীয়দিগকে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। প্রথম, সবিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া জামাতার আনয়ন। তিনি আসিয়া, দুই একদিন শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিয়া, প্রস্থান করেন। ঐ গর্ভ তৎসহযোগসম্ভূত বলিয়া পরিগণিত হয়। দ্বিতীয়, জামাতার আনয়নে কৃতকার্য হইতে না পারিলে, ব্যভিচারসহচরী ভ্রূণহত্যাদেবীর আরাধনা। এ অবস্থায়, এতদ্ব্যতিরিক্ত নিস্তারের আর পথ নাই। তৃতীয় উপায় অতি সহজ, অতি নির্দোষ ও সাতিশয় কৌতুকজনক। তাহাতে অর্থব্যয়ও নাই এবং ভ্রূণহত্যাদেবীর উপাসনাও করিতে হয় না। কন্যার জননী, অথবা বাটীর অপর গৃহিণী, একটি ছেলে কোলে করিয়া, পাড়ায় বেড়াইতে যান এবং একে একে প্রতিবেশীদিগের বাটীতে গিয়া, দেখ মা, দেখ বোন, অথবা দেখ বাছা, এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া, কথাপ্রসঙ্গে বলিতে আরম্ভ করেন, অনেকদিনের পর কাল রাত্রিতে জামাই আসিয়াছিলেন; হঠাৎ আসিলেন, রাত্রিকাল, কোথায় কি পাব, ভাল করিয়া খাওয়াইতে পারি নাই; অনেক বলিলাম, একবেলা থাকিয়া, খাওয়াদাওয়া করিয়া যাও, তিনি কিছুতেই রহিলেন না; বলিলেন, আজ কোনও মতে থাকিতে পারিব না; সন্ধ্যার পরেই অমুক গ্রামের মজুমদারদের বাটীতে একটা বিবাহ করিতে হইবেক; পরে অমুকদিন, অমুক গ্রামের হালদারদের বাটীতেও বিবাহের কথা আছে। সেখানেও যাইতে হইবেক। এই বলিয়া ভোর ভোর চলিয়া গেলেন। স্বর্ণকে বলিয়াছিলাম, ত্রিপুরা ও কামিনীকে ডাকিয়া আন্ তারা জামায়ের সঙ্গে খানিক আমোদ আহ্লাদ করিবেক। একলা যেতে পারিব না বলিয়া ছুঁড়ী কোনমতেই এল না। এই বলিয়া, সেই দুই কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, এবার জামাই এলে, মা তোরা যাস ইত্যাদি। এইরূপে পাড়ার বাড়ী বাড়ী বেড়াইয়া জামাতার আগমনবার্তা কীর্তন করেন। পরে স্বর্ণমঞ্জরীর গর্ভসঞ্চার প্রচার হইলে, ঐ গর্ভ জামাতাকৃত পরিপাক পায়’।

ব্রজবিলাস তাঁর স্বল্প পরিচিত রচনা। রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৮৭৬ সাল। সংরক্ষণের অভাবে এর প্রথম সংস্করণ কবে প্রকাশিত হয়েছিল জানা যায় না। তবে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৪ সালে। ''কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত'' এমন ছদ্মনামে রচিত ও প্রকাশিত। এই বইটিতে বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে তীর্যক গল্পচ্ছলে যে সমস্ত বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন আজকের দিনে তা বেশ আলোচনার বিষয়বস্তু বটে। এমনকি বর্তমান সময়ে মৌলবাদের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদের হাতিয়ার হিসাবে তা বিশেষ উপকারীও।

''ব্রজবিলাস'' নামকরণেও বেশ রসের ছোঁয়া। বিষয়বস্তুটিতে নবদ্বীপের এক বিশিষ্ট নৈয়ায়িক ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য সেই যুগে যশোরের এক সভায় বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে শাস্ত্র বচন তুলে তুলে সংস্কৃত ভাষায় এক ভয়ানক ভাষণ দিয়েছিলেন। ''সমাচারচন্দ্রিকা'' পত্রিকায় তা বেশ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর সেই বক্তব্যের জবাব স্বরূপ এই রম্য রচনাটি লেখেন। নামকরণের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু কায়দা করে লুকিয়ে রাখা আছে।

''ব্রজবিলাস''-এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কাহিনি আধুনিককালের ভাষায় যেমন ছিলঃ

''সাতক্ষীরার জমিদারবাবুর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর দুই স্ত্রী ও চার পৌত্র বিদ্যমান। এক একজন স্ত্রীর একটি করে দুই পুত্র আগেই মারা যাওয়ায় নাতিরাই শ্রাদ্ধশান্তির দায়িত্বপ্রাপ্ত। ঔরস নাতিদের পৈতে হয়নি, দত্তক নাতিদের হয়ে গেছে। বিতর্ক উঠল, শ্রাদ্ধ কে করতে পারে। তাদের গুরুদেব প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জানকীজীবন ন্যায়রত্ন বিধান দিলেন, দত্তক নাতিই পৈতের জোরে শ্রাদ্ধের অধিকারী। সেই অনুযায়ী মৃত্যুর চার দিন পর দত্তক নাতিদের উদ্যোগে শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে গেল। অনেক বড় বড় বিদ্যাবাগীশ শ্রাদ্ধসভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁরা ''এই শ্রাদ্ধ শাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইল'' — এই মর্মে এক বিবৃতিতে নাম স্বাক্ষর করে গেলেন।

তখন অপর (ঔরস) পক্ষও ঠিক করল, তারাও আর একটা শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করবে। তার জন্য বিধান প্রার্থনা করে তারাও কয়েকজন বড় বড় বিদ্যাবাগীশকে অনুরোধ জানাল। ''ইহা কাহারও অবিদিত নাই, বিদ্যাবাগীশ খুড় মহাশয়েরা ব্যবস্থাবিষয়ে

কল্পতরু। কল্পতরুর নিকটে যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ, বিদ্যাবাগীশ খুড়দের নিকটে যে যেরূপ ব্যবস্থা চায়, সে তাহা পায়, কেহ কখনও বঞ্চিত হয় না। তবে একটু বিশেষ এই, কল্পতরুর নিকট তৈলবট দাখিল করিতে হয় না; বিদ্যাবাগীশ খুড়রা, বিনা তৈলবটে, কাহারও উপর নেক নজর করেন না।" যাই হোক, তাদের দয়ায় এবং উপদেশ অনুসারে এগার দিন পরে আর একবার শ্রাদ্ধ হল। এই সভাতেও বড় বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা উপস্থিত থেকে সব কিছু সুসম্পন্ন হতে সাহায্য করলেন।

শ্রাদ্ধের পরেই জমিদারের সমস্ত সম্পত্তি ২৪ পরগণার কালেক্টরের হাতে গেল। উভয় পক্ষই দেনা করে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করায় টাকার জন্য কালেক্টরের কাছে যেতে হবে। অনেকের একবার শ্রাদ্ধই ভালো করে করা যায় না, এক ব্যক্তির মৃত্যুতে দুবার করে শ্রাদ্ধ কেন করা হল, সাহেব তা জানতে চাইলেন। দত্তক পক্ষের তরফে জানকীজীবন ন্যায়রত্নের বিধানের কথা জানানো হল। তখন বাধ্য হয়ে ঔরস পক্ষ অন্য পণ্ডিতদের বিধান সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে প্রথম শ্রাদ্ধ শাস্ত্রবিধি অনুসারে হয়নি। তারা "অধমতাড়ণ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন" পণ্ডিতের শরণাপন্ন হল। তিনি বললেন, কোনো অসুবিধা নেই, আমি এমন এক ব্যবস্থার কথা বলব, যাতে দ্বিতীয় শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি এমন এক শাস্ত্রীয় বচন উল্লেখ করলেন, যার দ্বারা "প্রথম শ্রাদ্ধ অসিদ্ধ ও দ্বিতীয় শ্রাদ্ধ শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতে পারে"।

একজন তখন প্রশ্ন করলেন, ও পক্ষের ব্যাপারে আপনার কী বক্তব্য?

ব্রজনাথ বললেন, কী আর বলব? আমি তো ও পক্ষের শ্রাদ্ধ ব্যবস্থায় নাম সই দিয়ে এসেছি।

সেই ব্যক্তি আবার বললেন, আপনি তো বেশ লোক। আগে যে ব্যবস্থায় সম্মতি জানিয়ে এলেন, এখন আবার তাকেই শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলে বিচার করছেন? যখন ওখানে নাম সই দিচ্ছিলেন, তখন এই শাস্ত্রীয় বচনটি আপনার মনে পড়েনি?

"বিদ্যারত্ন সহাস্য বদনে উত্তর করিলেন, ব্যবস্থা দিবার সময় কি অত বচন ফচন দেখা যায়?"

গল্পটি বিবৃত করার পর বিদ্যাসাগর আপন বয়ানে বললেন, ‘‘নবদ্বীপ এদেশের সর্বপ্রধান সমাজ; বিদ্যারত্ন সেই সমাজের সর্বপ্রধান স্মার্ত বলিয়া গণ্য ও মান্য; তাঁহার চাঁদমুখে স্বকর্ণে শুনিলাম, ব্যবস্থা দিবার সময় বচন ফচন দেখা যায় না। জানকীজীবন ন্যায়রত্ন যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। বিদ্যারত্ন খুড় পূর্বে ঐ ব্যবস্থায় নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন; কিন্তু অপর পক্ষের নিকট হইতে পছন্দসই তৈলবট হস্তগত করিয়া আজ আবার ঐ ব্যবস্থা অব্যবস্থা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত। এ দেশের মুখে ছাই; এদেশের সর্বপ্রধান সমাজের মুখে ছাই; এদেশের সর্বপ্রধান সমাজের সর্বপ্রধান স্মার্তের মুখে ফুলচন্দন। যাঁহাদের এরূপ ব্যবহার, তাঁহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত ও আবশ্যক, এ হতভাগা দেশের হতভাগা লোকের সে বোধও নাই, সে বিবেচনাও নাই।’’ আর সেই সঙ্গেই ঘোষণা করলেন, ‘‘যদি কেহ আমাকে ব্রাহ্মণ ভাবে, তাহাতে আমার যৎপরোনাস্তি অপমান বোধ হয়।’’

তথ্যসূত্র

পরবাস, সংখ্যা-৭৩, *“ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্মরণের পুণ্যলগ্ন’’*, গোপা দত্ত ভৌমিক
করুণাসাগর বিদ্যাসাগর - ইন্দ্র মিত্র
বঙ্গদর্শণ, অনঙ্গ পাখিরা
ব্রজবিলাস, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
www.groundxero.in
‘‘প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর ঃ কিছু উচ্চকিত স্বগতোক্তি’’
—bn.wikisource.org

ঈশ্বরের ধর্ম

তৃষ্ণা বসাক

অক্ষরজীবনের প্রথমে বর্ণপরিচয়, সমস্ত অস্তিত্ব আচ্ছন্ন করে জল পড়া, পাতা নড়ার শুরু। ঐক্য বাক্য মাণিক্য জমাতে গিয়ে যাবত অখ্যাতির শুরু। তারপর সহজ পাঠ, তার সরল লিনোকাট নিয়ে। 'চুপ করে বসে বসে ঘুম পায়।' বস্তুত অনেক অনেক দিন পর্যন্ত, বাঙালি শিশু প্রথম যে দুটি বাংলা বইয়ের সংস্পর্শে আসত, সে দুটি এই 'বর্ণপরিচয়' এবং 'সহজপাঠ'। এই দুটি বইয়ের প্রণীতার মধ্যে ব্যবধান ৪১ বছর। বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথের ৪১ বছর আগে জন্মেছিলেন, এবং প্রত্যন্ত গ্রামে জন্মেছিলেন। হিন্দু পরিবারে। যদিও গোঁড়া হিন্দু বলতে যা বোঝায়, ঠিক তা নয়। মাতা বা পিতা কেউই ধর্ম নিয়ে অতি উৎসাহী ছিলেন না। বিশেষ করে মা ভগবতী দেবী শাস্ত্রের চেয়ে হৃদয়ের নির্দেশ শুনতেই পছন্দ করতেন। কিন্তু তা বলে, লৌকিক ধর্মকে কেউ অস্বীকারও করেননি।

তাঁর কলকাতায় আসার গল্প আর মাইলফলক দেখে ইংরেজি অক্ষর চেনার গল্প এক হয়ে গেছে। সেই বঙ্গ রবীন্দ্রনাথের বঙ্গ থেকে আরও অন্ধকারে নিমজ্জমান। এদের শিশু কথা বলতে শেখার পর যেখানে অধিকাংশ বাবা মা তাকে শেখান, ঠাকুর নম করো, সেখানে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি, ১৮৫৫ সালে (রবীন্দ্রনাথের জন্মের ছ বছর আগে) প্রকাশিত বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগে বা দ্বিতীয় ভাগে কোন ধর্মীয় প্রসঙ্গ নেই।

বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগে অনেক খুঁজে, পেলাম 'উপাসনা' শব্দটি, যাকে আমরা বিশেষ কোন ধর্মের গণ্ডিতে বাঁধতে পারি না। দ্বিতীয় ভাগে যুক্তাক্ষরের উদাহরণ হিসেবে আছে আরাধ্য, ভক্তি, মন্দির, লক্ষ্মী, সন্ন্যাসী। কিন্তু যেসব ছোট ছোট পাঠ আছে, তাতে পূজা প্রভৃতির কোন লেশ মাত্র নেই, তাতে কেবলই পড়া আর খেলার কথা, বস্তু হিসেবে শাঁক বা পইতের কথা নেই, আছে কাগজকলম। রাম, ভুবন

এইসব বালকদের উদাহরণ দিয়ে আসলে নীতিশিক্ষা দেওয়া, যা এখানকার ভ্যালু এডুকেশনের তুল্য। এর মূল কথাগুলি হল চুরি করা কদাচ উচিত নয়, পিতামাতার কথা সর্বদা শোনা উচিত, কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলতে নেই, পাখি মারতে নেই এইসব।

অন্যদিকে অসম্ভব সুন্দর লিনোকাটের সহজ পাঠে অনেকবার পূজার প্রসঙ্গ। শাঁক, কাঁসি, ঠাকুর ঘর, ফুল তোলা, পূজা — একটি হিন্দু আবহ তৈরি করে।

'দূরে ঠাকুর ঘরে শাঁক বাজে, কাঁসি বাজে।'

'শৈল এল কই ? ... ওর আজ পৈতে। পৈতে হবে চিঠি পেয়ে মৈনিমাসি আজ এল।'

'ফুল তুলে রাম বাড়ি চলে। তার বাড়ি আজ পূজা। পূজা হবে রাতে। তাই রাম ফুল আনে। তাই তার ঘরে খুব ঘটা। ঢাক বাজে, ঢোল বাজে। ঘরে ঘরে ধূপ ধুনা।'

এই পূজা কি দুর্গাপূজা ? বলা হচ্ছে 'রাতে হবে আলো। লাল বাতি। নীল বাতি। কত লোক খাবে। কত লোক গান গাবে। সাতদিন ছুটি।'

ধন্দ জাগে। দুর্গা পুজো তো রাতে হয় না। রাতে হয় কালীপূজা। তাহলে কি কালীপূজার কথা বলা হল ? ওই যে বলা হচ্ছে 'রাতে হবে আলো। লাল বাতি, নীল বাতি।' রাতে পূজো হওয়া আর এত আলোর উল্লেখ তো দীপাবলি শ্যামা পূজার দিকে নির্দেশ করে। সেখানেই ধন্দ। এই রক্তলোলুপা দেবীটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনীহা বিভিন্ন জায়গায় ফুটে উঠেছে। তাহলে কি বাংলায় প্রাইমার লিখতে বসে রবীন্দ্রনাথ সংখ্যাগুরুর ধর্মকে উপেক্ষা করতে পারেনি ? অথচ তাঁর চার দশক আগে জন্মানো বিদ্যাসাগরের সেই বাধ্যবাধকতা থাকা আরও স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু বর্ণপরিচয়ে কোন ধর্মেরই কোন লেশমাত্র নেই। উপাসনা, আরাধ্য, ভক্তি, মন্দির,লক্ষী, সন্ন্যাসী শব্দগুলি ছাড়া।

নিজের সমস্ত কাজকর্ম থেকে তিনি ধর্মকে খুব সচেতনভাবেই বিযুক্ত রেখেছিলেন। তার উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বেশ কয়েক বছর তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক থাকার পর পত্রিকা পরিচালন সমিতি থেকে তখনি সরে আসেন যখন পত্রিকাটিকে নব্য-ব্রাহ্ম ধর্ম ও ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র করে তোলার চেষ্টা শুরু হয়।

বিদ্যাসাগর বলছেন 'নানাপ্রকার মতভেদ নিবন্ধন যখন অপ্রিয় সংঘটন হইতে লাগিল। তখন আর সেইসকল গোলযোগের মধ্যে থাকিয়া, অশান্তি বৃদ্ধি করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। ব্যক্তিগত মতবিভিন্নতার অত্যধিক প্রবলতা দেখিয়া আস্তে আস্তে বিদায় হইলাম' ('বিদ্যাসাগর', চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

ঈশ্বরচন্দ্রের আর এক জীবনীকার বিহারীলাল সরকার লিখেছেন 'অধ্যাপকের বংশে জন্ম লইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান হইয়া হৃদয়ে অসাধারণ দয়া, পরদুঃখকাতরতা প্রবৃত্তি পোষণ করিয়া হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি, হিন্দু ধর্মের প্রতি তিনি আন্তরিক দৃষ্টি রাখিলেন না কেন? নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের বংশধর বিদ্যাসাগর উপনয়নের পর অভ্যাস করিয়াও ব্রাহ্মণের জীবনসর্বস্ব গায়ত্রী পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন'

'Ishwarchandra Vidyasagar - story of his life and works' গ্রন্থের ২৭৫ পৃষ্ঠায় একথা বলেছেন সুবলচন্দ্র মিত্র —

'Vidyasagar was a man of the age, he followed the course indicated by it. No doubt this course has brought on a greater mischief to the real Hindu, has materially injured Hindu religion, has propelled the Hindu Society with great force in the direction of disorganization, but Vidyasagar ought not to be blamed for it. God alone, who made him with such materials'.

সুবলচন্দ্র মিত্র কি বিদ্যাসাগরকে ধর্মদ্রোহী প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন? হয়তো তাই নয়। কিন্তু সেইসময় হিন্দুসমাজপতিরা বিদ্যাসাগরকে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন, একটা গেল গেল রব উঠেছিল। যার জন্যে বিদ্যাসাগরের প্রাণনাশের চেষ্টা পর্যন্ত হয়।

আসলে বিদ্যাসাগর যাকে বলে নাস্তিক, তা ঠিক ছিলেন না, তাঁর আস্তিক্য ছিল মানুষের কল্যাণে, ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাতে তিনি মোটেই রাজি ছিলেন না। তাঁর একদিকে ছিল উচ্চবর্ণের বাঙালির নব্য ন্যায়ের লজিক্যাল মন অন্যদিকে ফরাসী চিন্তার প্রভাব। আমরা সবাই জানি ব্রিটিশরা এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন করেছিল তাদের কাজের সুবিধের জন্য, অর্থাৎ ইংরেজি লিখতে পড়তে বলতে পারা অনুগত কেরানী কুল তৈরির জন্য।

আর সেটাই তাদের জন্যে ব্যুমেরাং হয়েছিল। কারণ ইংরেজি শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে

পাশ্চাত্যের মুক্তচিন্তার ঢেউ নিয়ে এসেছিল, যা আছড়ে পড়েছিল উনিশ শতকের প্রারম্ভে, পরাধীন ভারতবাসীর মনের বদ্ধ জলাশয়ে। কিন্তু এই ঢেউ কিন্তু ইংরেজির নয়, মুখ্যত ফরাসি চিন্তার ঢেউ। বাংলার নবজাগরণের যে মুখগুলো আমরা দেখি, তাঁরা কিন্তু এই ফরাসি মুক্তচিন্তার ফসল, যার মূলে আছে Reason।

প্রমথনাথ বিশী লিখছেন 'এদেশের প্রথম আমলের ইংরেজি শিক্ষার গুরুগণ- হেয়ার, ডিরোজিও, রিচার্ডসন, সকলেই Reason পন্থী, তাঁহারা ফরাসি ফিলজফারদের মতো নাস্তিক অর্থাৎ রিজন এর আস্তিক। ইঁহাদের কৃতী ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই নিরীশ্বরবাদী। বাঙ্গালীর ইংরাজি শিক্ষার সেই সত্যযুগে ফরাসি নাস্তিক্যবাদের পরোক্ষ প্রভাব সম্বন্ধে আমরা সম্যক সচেতন নই, ফলে উনবিংশ শতকের বাঙ্গালীর মনের পূর্ণ চেহারাটা দেখিতে পাই না। একে উচ্চবর্ণের বাঙ্গালী স্বভাবত নৈয়ায়িক, তার উপরে লাগিল রিজনের ছোঁয়াচ, অর্থাৎ নবদ্বীপ ও প্যারিস দুয়ের স্পর্শে তৎকালীন শিক্ষিত বাঙ্গালী একান্ত লজিক্যাল হইয়া উঠিল।'

বিদ্যাসাগরের জীবনে প্রভাব ফেলেছিল ফরাসি দার্শনিক কোঁতের পজিটিভিজম। তাই তিনি বিশ্বাস করতেন জীবনভিত্তিক বস্তুগত জ্ঞান বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য, ঈশ্বরতত্ত্ব ছিল গৌণ। বেন্থাম প্রবর্তিত উপযোগবাদ তাঁকে প্রভাবিত করেছিল অর্থাৎ কল্যাণকারী রাষ্ট্রের আদর্শরূপে সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ।

তবে পাশ্চাত্য প্রভাব সত্ত্বেও তাঁর মনের ছাঁচ তৈরি নব্য ন্যায়ের লজিক্যাল গঠনে। ব্যক্তিগতভাবে একটি নৈয়ায়িক পরিবারের ঐতিহ্য বহন করি বলে দেখেছি প্রচলিত ধর্মের আচার অনুষ্ঠান আমাদের পরিবারে অনেকখানিই ব্রাত্য ছিল। একটি আধ্যাত্মিক আবহ কাজ করত। অর্থাৎ রিলিজিয়াস নয় স্পিরিচুয়াল। এই নৈয়ায়িকদের একটা বৈশিষ্ট্যই পৌত্তলিকতা সম্পর্কে খানিকটা ঔদাসীন্য। এটা নাস্তিকতা নয়, কিন্তু তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া। বিদ্যাসাগরের আগেও আমরা এমন নৈয়ায়িক পণ্ডিতদের পেয়েছি। উদাহরণ হিসেবে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কথা বলা যেতে পারে। ত্রিবেণী নিবাসী এই অসাধারণ পণ্ডিত তিন বছরের পরিশ্রমে আটশ পাতার হিন্দু আইন সংকলন করেন। অসামান্য শ্রুতিধর এই পণ্ডিত ১০৪ বছর বেঁচেছিলেন। মৃত্যু আসন্ন দেখে তাঁকে গঙ্গাতীরে আনা হলে তাঁর প্রধান এক নৈয়ায়িক ছাত্র বলেন 'গুরুদেব! নানা শাস্ত্র পড়াইয়া বুঝাইয়া

দিয়াছেন, কিন্তু ঈশ্বর কী বস্তু তাহা এক কথায় বুঝাইয়া দেন নাই' সেই সময়ও তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও রসবোধ অক্ষুণ্ণ ছিল। অন্তর্জলি অবস্থায় তর্কপঞ্চানন একটু হেসে তাৎক্ষণিক একটি শ্লোক রচনা করে ছাত্রকে বলেন —

নরাকারং বদন্ত্যেক নিরাকারাঞ্চ কেচন।
বয়ন্তু দীর্ঘসম্বন্ধাত নারাকারাম (নীরাকারাম) উপাস্মহে।।

যার অর্থ - এক দল ঈশ্বরকে নরাকার বলেন, কেউ বা নিরাকারও বলেন। কিন্তু আমরা দীর্ঘ সম্বন্ধের জন্য (অর্থাৎ বহুকাল গঙ্গাতীরে বাস করার জন্যে) নারাকারাকে অর্থাৎ নীরাকারাকে মানে জলকে উপাসনা করি, মানে এই নদীটিকে ঈশ্বর ভাবি।

একজন শতবর্ষ অতিক্রান্ত মৃত্যুপথযাত্রীর মেধার দীপ্তি আমাদের অবাক করে দ্যায়। বেগুন কোন তিথিতে খেতে হবে এমন চালকলাবাঁধা বামুনের পাশাপাশি কিন্তু এমন উজ্জ্বল পণ্ডিতরাও ছিলেন, বিদ্যাসাগর যাঁদের উত্তরাধিকার বহন করছেন। ঈশ্বর তাঁদের কাছে এই জগতের মধ্যেই।

কথামৃতে বিদ্যাসাগর ও রামকৃষ্ণের সাক্ষাতকারে দেখি বিদ্যাসাগর প্রায় শ্রোতার ভূমিকায়। গৃহে অতিথি এলে গৃহকর্তা যতটুকু সৌজন্য দেখান, তিনি ততটুকু দেখিয়েছেন, রামকৃষ্ণের অসাধারণ কথামালার মধ্যে সামান্য দু একটি কথা বলেছেন। সেগুলি বেশিরভাগই কৌতূকরসের। যেমন —

'নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান'

'কলাই বাটা সিদ্ধ তো শক্তই হয়'

রামকৃষ্ণের যে কথাটি তাঁর মনোমত হয়েছিল তা হচ্ছে — 'কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হন নাই, সে জিনিসটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কী, আজ পর্যন্ত কেহ মুখে বলতে পারে নাই'। এটি শুনে বিদ্যাসাগর (বন্ধুদের প্রতি) — বা! এটি তো বেশ কথা! আজ একটি নতুন কথা শিখলাম! ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই।

নিজের থেকে একটি প্রশ্ন তিনি করেছিলেন। রামকৃষ্ণ যখন বলছিলেন — 'দেখ না, এই জগত কি চমৎকার। কতরকম জিনিস-চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র। কত রকম জীব। বড় ছোট, ভালো, মন্দ, কারু বেশি শক্তি, কারু কম শক্তি।'

তখন বিদ্যাসাগর প্রশ্ন করেন — 'তিনি কি কারুকে বেশি শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন?'

রামকৃষ্ণ হয়তো তাঁর এত কর্মকাণ্ড দেখে যাতে তিনি বেশি জড়িয়ে পড়ে দুঃখ না পান, তাই নিষ্কাম কর্মের কথা বলেছেন — 'তুমি যে সব কর্ম করছ, সে সব সৎকর্ম। যদি 'আমি কর্তা' এই অহংকার ত্যাগ করে নিষ্কাম ভাবে করতে পারো, তাহলে খুব ভাল' রামকৃষ্ণ যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন — 'তোমার কী ভাব?' বিদ্যাসাগর মৃদু হেসে বলেছিলেন — 'আচ্ছা সে কথা আপনাকে একলা একলা একদিন বলব'। আসলে বিদ্যাসাগর, আমার ধারণায়, এইদেশের প্রথম সেকুলার মানুষ। যিনি কোনভাবেই ধর্ম নিয়ে ব্যক্তি পরিসরেও কোন আলোচনা করেন নি, বাইরে ধর্মাচরণ তো দূরের কথা।

শ্রীম বিদ্যাসাগরের স্কুলে পড়াতেন। তিনি বলেছেন — 'ধর্ম বিষয়ে বিদ্যাসাগর কাহাকেও শিক্ষা দিতেন না। তিনি দর্শানাদি গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন।' একদিন শ্রীম তাঁকে প্রশ্ন করেন — 'আপনার হিন্দু দর্শন কেমন লাগে? উত্তরে তিনি বলেছিলেন — 'আমার তো বোধ হয়, ওরা যা বুঝতে গেছে, বুঝতে পারে নাই'। শ্রীম বলছেন — 'তিনি হিন্দুদের ন্যায় শ্রাদ্ধাদি ধর্ম কর্ম সমস্ত করিতেন, গলায় উপবীত ধারণ করিতেন, বাঙ্গালায় যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহাতে 'শ্রীশ্রীহরি শরণম' ভগবানের এই বন্দনা আগে করিতেন মাস্টার আর একদিন তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলেন, তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে কিরূপ ভাবেন। বিদ্যাসাগর বলিয়াছিলেন 'তাঁকে তো জানবার যো নেই। এখন কর্তব্য কি? আমার মতে কর্তব্য, আমাদের নিজের এরূপ হওয়া উচিত যে সকলে যদি সেরূপ হয়, পৃথিবী স্বর্গ হয়ে পড়বে। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত যাতে জগতের মঙ্গল হয়।'

তাঁর এই উত্তরেই তাঁর জীবনদর্শন নিহিত। ধর্ম এসে কখনও তাঁর মানবসেবার হাত চেপে ধরেনি। তাঁর ঈশ্বর ছিলেন তাঁর বাবা, মা, অগণিত বালবিধবা, বাংলার নিরন্ন, নিরক্ষর মানুষ। তাই কাশী গিয়েও তিনি বিশ্বনাথ দর্শন করেননি। বনফুলের 'বিদ্যাসাগর' নাটকে যখন তিনি বিধবাবিবাহে বাবার মত চাইছিলেন তখন বাবা বলেন, 'আমি যদি মত না দি' তখন বিদ্যাসাগরের কথা ছিল — 'তাহলে আপনার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করব'। বাবা শুনে বলেন 'তাহলে তুমি আত্মা মান না?'

বিদ্যাসাগর নিরুত্তর।

তিনি চিরকাল ধর্ম আর জিরাফের মধ্যে জিরাফকেই বেছে নিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষেই জিরাফের মতো বহু উঁচু থেকে এই পিগমি সমাজকে দেখেছেন। আজীবন গণ্ডারের মতো নিঃসঙ্গ বিচরণ তাঁর, যা বঙ্গজীবনের দুটি রহস্য ভেদ করে।

এক — কেন বাঙ্গালির গড় পরিবারে রামকৃষ্ণ বা রবীন্দ্রনাথের ছবি দেওয়ালে থাকলেও বিদ্যাসাগর প্রায় বিরল।

দুই — কেন নকশাল থেকে লুম্পেন সবাই বিদ্যাসাগরের মূর্তিই বারবার ভাঙ্গে। অথচ 'বাংলাদেশে প্রথম পিপলস ম্যান বা জনাধিনায়ক' তিনিই। কাশীদাসী মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের মতো তাঁর মুদির দোকান থেকে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত অবাধ গতি। অনেকেই জানত না বিদ্যাসাগর নাম না পদবী। বিদ্যাসাগরবাবু বলেও উল্লেখের দৃষ্টান্ত আছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে ছেড়ে দিলে জীবিতকালেই এমন কিংবদন্তী আর দ্বিতীয় বাঙালি নেই। তবুও তাঁর ছবি ঘরে ঘরে টাঙ্গানো থাকে না।

কারণ বিদ্যাসাগর গুরু হতে চাননি, কাজ করতে চেয়েছিলেন। নিজের মূর্তি তিনি নিজেই ভেঙে গেছেন, মূর্তিপূজায় তিনি বিশ্বাস করতেন না। এ দেশের নিরন্ন, নিরক্ষর নর নারী ছিল তাঁর জীবন্ত বিগ্রহ। প্রমথনাথ বিশী যথার্থই বলেছেন — 'গোলদিঘীতে তাঁহার যে মূর্তিটি আছে তাহা বিদ্যাসাগরের ব্যঙ্গ। কৃতজ্ঞ বঙ্গবাসীর কৃতঘ্ন দান। ওই পাথরের পিণ্ডটি যত শীঘ্র অপসারিত হয়, ততই মঙ্গল। জীবিতকালে বাঙ্গালী তাঁহাকে যথেষ্ট লাঞ্ছিত করিয়াছে, মৃত্যুর পরে তাঁহার জের টানিয়া লইবার কোন আবশ্যক ছিল না।'

তথ্যসূত্র

১. *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড

২. একুশ শতাব্দী পত্রিকা, জুলাই ডিসেম্বর, ২০১৯

৩. *বর্ণপরিচয়*, প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ

৪. *সহজ পাঠ*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫. *কলিকাতায় বিদ্যাসাগর*, রাধারমণ মিত্র

৬. *বিদ্যাসাগর* (নাটক), বনফুল

৭. *রামকৃষ্ণ কথামৃত*, শ্রীম

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সামাজিক উন্নয়নের প্রেক্ষিতে

কুমকুম চট্টোপাধ্যায়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলার দুই যুগন্ধর পুরুষ। সমস্ত জীবনের কর্মসাধনা দিয়ে তাঁরা বাংলা ও বাঙালিকে বর্তমান অবস্থানে এগিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ দু'জনেরই মূল উদ্দেশ্য ছিল মানবকল্যাণ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই উদ্দেশ্যসাধনের পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। কিন্তু দু'জনেরই চিন্তা-ভাবনা ও কার্যাবলী সমাজের অগ্রগতিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তবে এ কথা মানতে হবে যে তাঁদের ভূমিকার মূল্যায়নের নিরিখে সময়ের ব্যবধান একটি বিশিষ্ট নির্ধারক। সেই কথা মাথায় রেখে আমরা এই দুই মহামানবের চিন্তা ও কর্মের সাদৃশ্য ও ভিন্নতার আলোচনায় আগ্রহী হতে পারি। এই স্বল্প পরিসরে তার খুব সামান্য আভাস দেওয়া গেল।

মানবকল্যাণ

বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ — দু'জনেরই উদ্দেশ্য ছিল সমাজের অগ্রগতি ও মানবকল্যাণ। তাঁরা চেয়েছিলেন যে সামাজিক অগ্রগতির সুফল মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে যেন সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন করে। সেই লক্ষ্যপূরণের জন্য বিদ্যাসাগর প্রাথমিকভাবে সমাজ-সংস্কারের উদ্যোগ নিলেন। তিনি নিজেই বলেছিলেন যে বিধবাবিবাহের পথ প্রদর্শন তাঁর জীবনের সর্ব প্রধান সৎ কর্ম। তাঁর প্রাণপণ চেষ্টায় ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়। আইনটির নাম Act XV of 1856, being an, Act to remove all legal obstacles to the Marriage of Hindu Widows।[১] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মাননীয় জে.পি.গ্রান্ট মহাশয়ের সবিশেষ আগ্রহ ও পরিশ্রমেই বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ হয়েছিল। বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সমবেত হয়ে গ্রান্ট সাহেবকে কৃতজ্ঞতা সূচক একটি অভিনন্দনপত্র

প্রদান করেন।[২] ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর। যতদূর জানা যায় যে সেইদিনই একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু সন্তান প্রথম আইন সম্মত বিধবাবিবাহ করেন। পাত্রের নাম শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। পাত্রীর নাম কালীমতী দেবী।[৩] বাংলার সমাজ সংস্কারের ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় দিন। আবার বিধবা-বিবাহ প্রচলনের পাশাপাশি বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্য তাঁর সক্রিয় উদ্যোগ অবশ্যই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্‌বিষয়ক প্রস্তাব-পুস্তকটির সূচনাতেই বঙ্গদেশের পুরুষজাতির উপর তাঁর সুতীব্র কশাঘাত — ''স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সামাজিক নিয়মদোষে পুরুষজাতির নিতান্ত অধীন।''[৪] স্ত্রীজাতির এই অধীনতা হল সামাজিক নির্মাণ এই বিষয়টি তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এবং সমাজে নারীদের বঞ্চনার কারণগুলিকে শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। তাই বিধবাবিবাহ প্রচলন করা তাঁর কোনো বিচ্ছিন্ন সংগ্রাম নয়। সামগ্রিকভাবে পুরুষতন্ত্রের শোষণের বিরুদ্ধে বঞ্চিত নারীসমাজের পক্ষ নিয়ে তাঁর জেহাদ। বিধবাবিবাহ প্রচলনের প্রচেষ্টা সেই পথেই তাঁর বলিষ্ঠ ও দৃঢ় পদক্ষেপ। সেই সঙ্গে বিদ্যাসাগর অনুভব করতেন যে নারীজাতির অগ্রগতি না হলে সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয় কারণ নারীরা সমাজের অর্ধেক শক্তি।

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের মানব উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর পল্লীপুনর্গঠন প্রকল্প। তিনি অনুভব করেছিলেন যে দেশীয় সমাজকে তার অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কে সচেতন এবং গ্রামগুলিকে সংগঠিত করে তাদের আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তখনকার আশু কর্তব্য। এই উদ্যোগের নাম তিনি দিয়েছিলেন পল্লীপুনর্গঠন প্রকল্প। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে তিনি গ্রামের বৌদ্ধিক সম্পদ ও জ্ঞানভাণ্ডারকে যুক্ত করতে চেষ্টা করলেন। এইভাবে সমাজের বিরাট সংখ্যক প্রান্তিক মানুষকে তিনি তাঁর সমাজোন্নয়ন উদ্যোগে সামিল করতে চাইলেন কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে এরাই দেশের আসল শক্তি। পূর্ববঙ্গে জমিদার থাকাকালীন তিনি এই প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করা শুরু করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে মণ্ডলীপ্রথা তাঁর একটি অনন্য অবদান। পরবর্তীকালে শ্রীনিকেতনে তিনি লেনার্ড নাইট এলমহার্স্টের সহযোগিতায় তাঁর এই পল্লীপুনর্গঠন পরিকল্পনাকে আরও সার্থকভাবে প্রয়োগ করেন। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে ছাত্রস্বরাজ প্রবর্তন করে তিনি ছাত্রদের প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এইভাবে তিনি দেশের প্রান্তিক মানুষ ও ছাত্রদের নিয়ে সমাজের অগ্রগতির রাস্তায় পদার্পণ করার প্রয়াস নিয়েছিলেন।

শিক্ষাবিস্তার

যে কোনো সমাজকে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা বিস্তার করা একটি আবিশ্যক শর্ত এই কথা বিদ্যাসাগর মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল হার্ডিঞ্জকে অনুরোধ করে তিনি ১০১টি বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর নিজের জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে তিনি বালক-বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। বীরসিংহ ও তৎসংলগ্ন শ্রমজীবী রাখাল ও কৃষক বালকদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য তিনি নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই দরিদ্র বালকদের আহারের ব্যবস্থাও তিনি নিজের বাড়িতে পিতামাতার সাহায্যে আয়োজন করতেন।[৫]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নারীশিক্ষায় বিদ্যাসাগরের বিশেষ আগ্রহ ছিল। জন এলিয়ট ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুনের উৎসাহে বঙ্গদেশে নতুন করে নারীশিক্ষার সূচনা হয়। তাঁর উদ্যোগে সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বেথুন সাহেবের উদ্যোগে ১৮৪৯ সালের ৭ মে বাহির শিমুলিয়ায় ৫৬ সুকিয়া স্ট্রিটে রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির বৈঠকখানায় মাত্র ১১টি বালিকা নিয়ে বেথুন সাহেব তাঁর বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয়ের নামকরণ হয় Calcutta Female School। বেথুনের অকালমৃত্যুর পরে লোকমুখে বেথুন সাহেবের স্কুল নামটি সমধিক পরিচিতি লাভ করে এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্কুলের সম্পাদক হিসেবে ১৮৬২ সালের ১৬ ডিসেম্বর সরকারকে যে রিপোর্টটি পাঠান তাতে বেথুন স্কুল নামে স্কুলটিকে নামাঙ্কিত করেন। সেই থেকেই স্কুলটি বেথুন স্কুল নামে পরিচিত। বিদ্যাসাগর প্রথম থেকে দীর্ঘ আঠেরো বছর এই স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। তিনি এই বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য ছাত্রী সংগ্রহ করেছেন ও সেই সঙ্গে স্কুলের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য চেষ্টা করে গেছেন।[৬]

বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তারে রবীন্দ্রনাথের দানও অপরিসীম শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্বভারতী গড়ে ওঠার ইতিহাস তাঁর একান্ত নিজস্ব শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে লেখাপড়ার করা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ, শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আন্দলাভ করা, একটি পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে বেশ কয়েকটি রেফারেন্স বই পড়া ইত্যাদি

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার মূল কথা। সেই সঙ্গে প্রয়োজন যথার্থ শিক্ষক। ‘‘আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন।’’[৭] সেই সঙ্গে তিনি মনে করতেন যে শিক্ষকদের শুধুমাত্র ‘স্কুল মাস্টার’ হয়ে থাকলে চলবে না। প্রত্যেককেই নিজ নিজ সাধ্য ও রুচিমতো একটি করে বিষয় নির্বাচন করে সেই বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা করতে হবে।[৮] যোগ্য শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাই তিনি শিক্ষকদের জন্য একটি ট্রেনিং স্কুল বা নর্মাল স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা করেন।

বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ দু'জনের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের পদ্ধতিগত কিছু পার্থক্য থাকলেও মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, শিশুপাঠ্যরচনা, ছাত্রদের আহারের বন্দোবস্ত করার মতো বিষয়গুলি আমরা দু'জনের কর্মসূচিতেই দেখতে পাই।

বাংলাভাষা ও সাহিত্য

বাংলা গদ্যরীতি গড়ে তোলার দায়িত্ব যিনি নেবেন তিনি কেবল ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত হলেই চলবে না, সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলিতে দেশের যে প্রাচীন সাহিত্য বিধৃত হয়ে আছে তাতেও তাঁর বৈদগ্ধ্য হতে হবে সুগভীর। আর এর সঙ্গে যুক্ত হতে হবে নিজের মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ, যোগ্যতার পরিচয়ে অপরিহার্য এই তিনটি গুণের একত্র সমাবেশ আমরা বিদ্যাসাগরের মধ্যে পাই। সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের অন্তরঙ্গ পরিচয় এবং সেইসঙ্গে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি তাঁকে সেই সাহিত্যের অপরিমেয় সঞ্চয়ের ভাণ্ডার থেকে মুক্ত হস্তে ঋণ গ্রহণ করে বাংলা গদ্যকে সমৃদ্ধ করে তুলতে উদ্বুদ্ধ করল।[৯] বাংলায় গদ্যরীতি নির্মাণে বিদ্যাসাগরের দান অপরিসীম। তাছাড়া তিনিই প্রথম বাংলা গদ্যে সঠিক ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার করেন। তাঁর গদ্যরচনায় একদিকে যেমন প্রাঞ্জলতা অন্যদিকে তেমনই সরসতা বর্তমান। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ‘তাঁহার (বিদ্যাসাগরের) প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা।... বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন।’[১০] তবে এ কথা বলা যায় যে বিদ্যাসাগর পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা বলেই বেশি পরিচিত। কারণ তিনি বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন বেশি, সাহিত্যরচনা করেন নি।

রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে বাংলা ভাষা আধুনিকতার দরজা অতিক্রম করেছে। তাঁর

লেখনী বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছে। ছাত্রপাঠ্যরচনাতেও তিনি তাঁর অতুলনীয় স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর বিপুল সাহিত্যসৃষ্টি বাংলা ভাষার মূল্যবান সম্পদ। কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক — সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি অনায়াসে পদাচারণা করেছেন। তাঁর 'গীতাঞ্জলি' নোবেল পুরস্কার লাভ করে তাঁকে পৃথিবীর কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার হিসেবেও তিনি উজ্জ্বল স্থান লাভ করেছেন। তাঁর অবদান তাঁর নিজের কথায় — ''গদ্যের ভাষা গড়তে হয়েছে আমার গল্প প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে। মোপাসাঁর মতো যে-সব বিদেশী লেখকের কথা তোমরা প্রায়ই বলো, তাঁর তৈরি ভাষা পেয়েছিলেন। লিখতে লিখতে ভাষা গড়তে হলে তাঁদের কী দশা হত জানি নে।''[১১]

শেষের কথা

অতি শৈশবেই আমাদের পরিচয় হয় বর্ণপরিচয় ও সহজপাঠ-এর সঙ্গে। সেই পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে-আমাদের বাঙালি সত্তা তথা মানবসত্তা। রবীন্দ্রনাথের শৈশবেও বর্ণপরিচয় তাঁর চিন্তা-চেতনাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। বিদ্যাসাগরের চরিত্র মাহাত্ম্য তাঁকে বার বার অভিভূত করেছিল। তাই তিনি রচনা করেছিলেন 'বিদ্যাসাগরচরিত' যা তাঁর স্বদেশবাসীর দৃষ্টিপথে এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। সেখানে বিদ্যাসাগরকে দীপ্যমান করে তুলতে গিয়ে লেখক রবীন্দ্রনাথও তাঁর উজ্জ্বল মূর্তি নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন আমাদের মননে।

তথ্যসূত্র

১। ইন্দ্র মিত্র, ১৯৬৯, *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৩০০

২। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ, *বিদ্যাসাগর*, কলকাতা, দে বুক স্টোর, পৃ. ২২৩

৩। ইন্দ্র মিত্র, তদেব, পৃ. ৩১০

৪। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৮৭, 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব', *বিদ্যাসাগর রচনাবলী*, সম্পাদনা তীর্থপতি দত্ত,

কলকাতা, তুলি-কলম, পৃ. ৮৪৩

৫। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ৩০৩-৩০৫

৬। বেথুন স্কুল ও নারীশিক্ষার দেড়শো বছর-১৮৪৯-১৯৯৯, প্রথম পর্ব ২০০০ কলকাতা, বেথুন স্কুল প্রাক্তণী সমিতি, পৃ. ৩৪, ৩৯,৫০

৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৬১, *শিক্ষা,* রবীন্দ্র রচনাবলী-১১, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৬২৬

৮। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ, *শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃ ৯৪

৯। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৭, *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,* ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা, অনুবাদ-সুধীরকুমার রায়চৌধুরী, নিউ দিল্লী, সাহিত্য অকাদেমি, পৃ ৬৭

১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, *বিদ্যাসাগরচরিত,* রবীন্দ্র রচনাবলী-দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৃ ৭৬৭

১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, *গল্পগুচ্ছ*-অখণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৃ ৮৫১

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বাংলা ভাষা

ছন্দম চক্রবর্তী

বিদ্যাসাগরের ভাষাচর্চা ও ভাষাভাবনার পরিধি

উনিশ শতকের বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার বিচিত্রমুখী প্রকল্পে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বাংলা লেখ্য-গদ্যের নির্মাণ। গুরুত্বপূর্ণ, কারণ খণ্ডিত ও স্ববিরোধী হিসাবে অভিযুক্ত এই পরাক্রমী আধুনিকতা মূলত বাংলা গদ্যের লিখিত রূপকে ভিত্তি করেই বৃহত্তর বাঙালি জনতার সঙ্গে বিতর্ক, সংলাপ ও সমন্বয়ে নিয়োজিত। সেই জন্য আমরা দেখি, এই আধুনিকতার অধিনায়কদের অনেকেই নিজস্ব আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রকল্পের পাশাপাশি বাংলা লিখিত গদ্যের চর্চা ও সংস্কারে উদ্যোগী। নিজস্ব কর্মসূচির উপযোগী করে বাংলা গদ্যকে গড়েপিটে নেওয়ার কাজে মনোযোগী। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উদ্যোগের ধারাবাহিক ইতিহাসে তিনটি প্রধান মাইলফলক।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উনিশ শতকের সমগ্র দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে বাংলা ভাষা, মুখ্যত বাংলা লেখ্য-গদ্যের চর্চায় নিয়োজিত। এই চর্চার নিদর্শন তাঁর গদ্যরচনা ও প্রাইমার। গদ্যরচনা মূলত তিনটি গোত্রের — আখ্যান, সামাজিক প্রবন্ধ ও বিতর্কমূলক রচনা। আখ্যানের মধ্যে রয়েছে (কাল্পনিক) কাহিনি ছাড়াও স্মৃতিকথা ও আত্মজৈবনিক রচনা। কাহিনিগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠভাবে অনুবাদ, স্বল্প কয়েকটি ভাবানুবাদ। সামাজিক প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ সম্পর্কিত রচনাবলি। মূলত বহুবিবাহকে কেন্দ্র রচিত হয় বেনামে লেখা বিদ্যাসাগরের বিতর্কমূলক রচনা। বিভিন্ন গোত্রের এই রচনাবলির মধ্যে ধারাবাহিকভাবে ফুটে ওঠে বিদ্যাসাগরের রচনাশৈলী। অর্থাৎ তাঁর বাংলা গদ্যশৈলী। এমনকী প্রাইমারগুলির মধ্যে, বিশেষত বালকপাঠ্য অনুচ্ছেদগুলির মধ্যে প্রণোদিত সরলতা সত্ত্বেও লক্ষ করা যায় গদ্যশৈলীর বিশিষ্টতা। নির্বাচিত শব্দাবলির মধ্যেও থেকে

যায় বিশেষ ভাষাভঙ্গির প্রতি পক্ষপাত। অবশ্য প্রাইমারগুলির বিজ্ঞাপনের মধ্যে কদাচিৎ পাওয়া যায় ভাষাচিন্তার ভিন্নতর ঝলক। আর দেখি বিদ্যাসাগরের অভিধান রচনার অসমাপ্ত চেষ্টার মধ্যে ভাষাবিষয়ক মতাদর্শের স্পষ্টতর প্রকাশ। আসলে ভাষা সম্পর্কিত ভাবনাকে বিদ্যাসাগর প্রত্যক্ষত কোনও রচনায় প্রকাশ করেননি। বিভিন্ন উপলক্ষে লেখা তাঁর বিচিত্র রচনার ভাষাশরীরেই পরোক্ষে ধরা থাকে তাঁর ভাষাচিন্তার সূত্রগুলো। অবশ্য ঘনিষ্টজনেদের স্মৃতিও এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সাক্ষ্য বহন করে।

বিদ্যাসাগরের গদ্যশৈলী

বিদ্যাসাগর যখন বাংলা গদ্যরচনায় প্রয়াসী, তখন বাংলা লিখিত গদ্য প্রায় অর্ধ-শতকের চেষ্টায় একটা কাঠামো খুঁজে পেয়েছে। এই কাঠামো পুরোপুরি স্থিতিশীল নয়। কিন্তু বাংলা লিখিত গদ্যনির্মাণের একেবারে আদিপর্বে সুষ্ঠু আন্বয়িক আদর্শের যে অস্থির সন্ধান, ঔপভাষিক প্রক্ষেপ বা উপযুক্ত শব্দপ্রয়োগের যে অনিশ্চয়তা দেখি, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা অক্ষয়কুমার দত্তের গদ্য ইতিমধ্যে তাদের অতিক্রম করে এসেছে। ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত William Yates-এর *Introduction to the Bengali Language,* Vol. I-এ দেখি, ইয়েট্স দুধরনের বাংলা গদ্যশৈলীর কথা বলেন; 'vulgar' ও 'pedantic'। প্রাচীন অর্থানুযায়ী 'vulgar' মানে জনপ্রিয়-কথ্যধর্মী অর্থাৎ 'colloquial' এবং 'pedantic' মানে কৃত্রিমভাবে সংস্কৃতায়িত এক গদ্যশৈলী। সম্ভবত এই দুইয়ের মধ্যবর্তী শৈলী হিসাবে একধরনের 'book style'-এর উল্লেখও তিনি করেন। ইয়েটস বর্ণিত এই মধ্যবর্তী শৈলীটিকেই সাধারণভাবে সাহিত্যের গদ্য (literary prose) বলে চিহ্নিত করা হয়।[১] সুতরাং ১৮৪৭ সালে বাংলা গদ্যে *বেতালপঞ্চবিংশতি* রচনায় বৃত বিদ্যাসাগরের সামনে বাংলা লিখিত গদ্যের একাধিক আদর্শ ছিল। এমনকী সারস্বতচর্চার উপযোগী এক মান্যরূপও ক্রমশ গড়ে উঠছিল। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যচর্চায় এই মজ্‌ঝিম পথটিকেই বেছে নিলেন।

কিন্তু প্রশ্ন হল এই মধ্যবর্তী পথটা ঠিক কী। তা কথ্যধর্মী গদ্যশৈলী থেকে কতটা দূরবর্তী, কতটাই বা সংস্কৃত অনুশাসনের অনুবর্তী। সেই আলোচনায় যাবার আগে বিদ্যাসাগরের প্রতিনিধিত্বমূলক গদ্যরচনার কিছু অংশের দিকে নজর দেওয়া যাক। বাংলা ভাষায় বিদ্যাসাগরের প্রথম গদ্যরচনা, হিন্দি *বেতালপচ্চিসি*-র অনুবাদ,

বেতালপঞ্চবিংশতি প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ সালে। মূলত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সিভিলিয়ান ছাত্রদের প্রয়োজনে গ্রন্থটি রচিত। এই রচনার প্রথম অনুচ্ছেদটি দেখা যাক:

> উজ্জয়নী নগরে গন্ধর্বসেন নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার চারি মহিষী। তাঁহাদের গর্ভে রাজার ছয় পুত্র জন্মে। রাজকুমারেরা সকলেই সুপণ্ডিত ও সর্ব বিষয়ে বিচক্ষণ ছিলেন। কালক্রমে, নৃপতির লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে, সর্বজ্যেষ্ঠ শঙ্কু সিংহাসনে অধিরোহন করিলেন। তৎকনিষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বিদ্যানুরাগ, নীতিপরতা ও শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা সবিশেষ বিখ্যাত ছিলেন; তথাপি, রাজ্যভোগের লোভসংবরণে অসমর্থ হইয়া জ্যেষ্ঠের প্রাণসংহারপূর্বক, স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইলেন; এবং, ক্রমে ক্রমে, নিজ বাহুবলে, লক্ষ্যযোজনবিস্তীর্ণ জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর হইয়া, আপন নামে অব্দ প্রচলিত করিলেন।[২]

বেতালপঞ্চবিংশতি-র প্রায় সাতবছর পরে প্রকাশিত হয় বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে বিশ্রুত অনুবাদ শকুন্তলা (১৮৫৪)। রচনাটি শুধু কালিদাসের *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্*-এর বিশ্বস্ত অনুসরণ নয়, বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগরের অর্থপ্রকাশের অব্যর্থ নৈপুণ্য এবং সংগীতময়তাকে প্রকাশের যে সামর্থ্য তার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

> রাজা, নানা ছলে বিলম্ব করিয়া, শকুন্তলার হস্তে মৃণালবলয় পরাইয়া দিলেন এবং কহিলেন, সুন্দরি! দেখ দেখ, কেমন সুন্দর হইয়াছে। শকুন্তলা কহিলেন, দেখিব কি আমার নয়নে কর্ণোৎপলরেণু পতিত হইয়াছে, এ জন্য, দেখিতেছি না। রাজা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, যদি তোমার অনুমতি হয়, ফুৎকার দিয়া পরিষ্কার করিয়া দি। শকুন্তলা কহিলেন, তাহা হইলে অতিশয় উপকৃত হই বটে; কিন্তু তোমায় অতদূর বিশ্বাস হয় না।[৩]

শকুন্তলা প্রকাশের পরের বছর অর্থাৎ ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত হয় *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব*। এটি বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত আন্দোলন উপলক্ষে তৈরি বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত ম্যানিফেস্টো। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কেন, সে-বিষয়ে তাঁর সওয়াল-জবাব। চরিত্রের দিক থেকে রচনাটি *বেতালপঞ্চবিংশতি* বা *শকুন্তলা* থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। দেখা যাক রচনাটির গদ্যের নমুনা:

> বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে যে নানা অনিষ্ট ঘটিতেছে, ইহা এক্ষণে অনেকেরই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। অনেকেই স্ব স্ব বিধবা কন্যা ভগিনী প্রভৃতির পুনর্বার বিবাহ দিতে উদ্যত আছেন। অনেকে ততদূর পর্যন্ত যাইতে সাহস করিতে পারেন না; কিন্তু, এই ব্যবহার প্রচলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন।[৪]

বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত আন্দোলনের প্রায় দেড় দশক বাদে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন। এবার তিনি শুধু সামাজিক প্রবন্ধ লিখেই ক্ষান্ত হলেন না, একধরণের বিতর্কমূলক প্রবন্ধের (polemical essay) অবতারণা করলেন। যুক্তির ভিয়েনে চড়িয়ে দিলেন তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও তিক্ত পরিহাসের রস। দেখা যেতে পারে কেমন ছিল চরিত্রের দিক থেকে স্বতন্ত্র এই রচনাগুলির অন্যতম *আবার অতি অল্প হইল* (১৮৭১)-র গদ্য।

> খুড়, বুড় হয়ে বুদ্ধিহারা হয়েছেন। বুদ্ধিহারা না হইলে, দুর্বুদ্ধির অধীন হয়ে, আমার পুস্তকের উত্তরদানে অগ্রসর হইতেন না। আমার দর্শিত দোষ সকল যথার্থ দোষ নয়, ইহা প্রতিপন্ন করা খুড়র মনস্থ ছিল; কিন্তু, উত্তর লিখিয়া, ঐ সকল দোষের যথার্থতা সম্পূর্ণ সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। বুদ্ধি থাকিলে, অথবা বুদ্ধিমান বন্ধুলোকের পরামর্শ শুনিলে, খুড় এ পাগলামি করিতেন, এরূপ বোধ হয় না।[৫]

সংস্কৃত কলেজে চাকুরিরত অবস্থায় বন্ধু মদনমোহন তর্কলঙ্কারের সঙ্গে বিদ্যাসাগর সংস্কৃতযন্ত্র নামক একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। সেখান থেকে দুজনেরই বেশ কিছু বই ছাপা হয়। একসময় সম্পর্কের অবনতি হওয়ায় বিদ্যাসাগর উদ্যোগী হয়ে মদনমোহনের সম্মতিক্রমে এই ছাপাখানার সমস্তকিছুর স্বত্ব নিজেদের মধ্যে আইনসম্মত বিলিবন্টনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তর্কালঙ্কারের মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ অভিযোগ করেন যে, মদনমোহনের তিনটি পুস্তকের স্বত্ব বিদ্যাসাগর অন্যায়ভাবে ভোগ করছেন। তিনি শুধু বিদ্যাসাগরকে আইনজীবীর চিঠি পাঠান না, শহরময় বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে কুৎসা করে বেড়ান। শেষ পর্যন্ত তাঁর অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। বিদ্যাসাগর সমস্ত ঘটনা লোকসমক্ষে আনার জন্য মৃত্যুর তিন বছর আগে রচনা করেন নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস (১৮৮৮)। আটষট্টি বছর বয়সে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য রচিত এই দলিলের গদ্যশৈলীটিকে একবার দেখে নেওয়া যাক।

> আমি বলিলাম, তুমি কুন্দমালার নাম করিয়া প্রার্থনা করাতে, আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া, পুস্তক তিন খানি দিতে সম্মত হইয়াছিলাম। কিন্তু তৎপরে তোমরা যে ফেসাৎ উপস্থিত করিয়াছ, তাহাতে আর আমার দয়া করিবার ইচ্ছাও নাই, আবশ্যকতাও নাই। তোমরা উকীলের চিঠি দিয়াছ, নালিসের ভয় দেখাইয়াছ, এবং, আমি ফাঁকি দিয়া পরের সম্পত্তি ভোগ করিতেছি বলিয়া, নানা স্থানে আমার কুৎসা করিয়াছ। আমাদের দেশের লোক নিরতিশয় পরকুৎসাপ্রিয়; তোমার মুখে আমার কুৎসা শুনিয়া, সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন; এবং, তত্ত্বানুসন্ধানে বিমুখ হইয়া, আমার কুৎসাকীর্তন করিয়া, বিলক্ষণ আমোদ করিতেছেন।[৬]

শেষ নিদর্শনটি বিদ্যাসাগরের আত্মচরিতের গদ্য। *বিদ্যাসাগর চরিত রূপে* চিহ্নিত রচনাটি ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুকালে অসমাপ্ত। সুতরাং বলা যায়, এটি বিদ্যাসাগরের পরিণত গদ্যশৈলীর নিদর্শন। স্মৃতিধর্মী রচনা স্বভাবত মন্ময়। সেই মন্ময়তার মধ্যে বিদ্যাসাগরের গদ্যশৈলী কীভাবে প্রমুখিত হয়েছে দেখা যাক।

> আমার জন্মসময়ে পিতৃদেব বাটীতে ছিলেন না; কোমরগঞ্জে হাট করিতে গিয়াছিলেন। পিতামহদেব তাঁহাকে আমার জন্মসংবাদ দিতে যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বলিলেন, ''একটি এঁড়ে বাছুর হইয়াছে।'' এই সময়ে, আমাদের বাটীতে, একটি গাই গর্ভিণী ছিল; তাহারও, আজ কাল, প্রসব হইবার সম্ভাবনা। এজন্য, পিতামহাদেবের কথা শুনিয়া, পিতৃদেব মনে করিলেন, গাইটি প্রসব হইয়াছে। উভয়ে বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পিতৃদেব, এঁড়ে বাছুর দেখিবার জন্য, গোয়ালের দিকে চলিলেন। তখন পিতামহদেব হাস্যমুখে বলিলেন, ''ও দিকে নয়, এ দিকে এস; আমি তোমার এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিতেছি।'' এই বলিয়া, সূতিকাগৃহে লইয়া গিয়া, তিনি এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিলেন।[৭]

এই ছটিমাত্র ক্ষুদ্র গদ্যাংশের মধ্যে প্রায় পাঁচ দশকজুড়ে গড়ে ওঠা বিদ্যাসাগরের গদ্যশৈলীর বিবর্তনকে ধরা অসম্ভব। তবু ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে রচিত বিভিন্ন সংরূপের (genre) ছটি গদ্য-নিদর্শন এখানে কালানুক্রমে সজ্জিত। এগুলির মধ্যেকার পার্থক্যগুলো যেমন চিহ্নিত করা যায়, তেমনি এদের অন্তর্লীন সাধর্ম্যটুকুও খুঁজে বার করা সম্ভব।

বিদ্যাসাগরের গদ্যভাষা সমসত্ত্বভাবে না হলেও সংস্কৃতের গন্ধমাখা। বিশেষত তাঁর রচনার শব্দভাণ্ডারে তৎসম শব্দ নিশ্চিতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। রচনার উপলক্ষ ও সংরূপ অনুসারে অ-তৎসম শব্দ, বিশেষত আরবি-ফারসি শব্দের সংখ্যা বাড়লেও সার্বিকভাবে তৎসম শব্দের সংখ্যাধিক্য নিরঙ্কুশ। সমাসবদ্ধ পদের বহুল প্রয়োগ, মৌলিক ক্রিয়ার তুলনায় যৌগিক ক্রিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহার, ক্ষেত্রবিশেষে নামধাতুজ ক্রিয়ার প্রাচীনতর (archaic) প্রয়োগ প্রভৃতি ভাষার মধ্যে এক সংস্কৃতানুগ সুগম্ভীর পরিবেশ তৈরি করে। নিঃসন্দেহে এই সংস্কৃতায়িত লেখ্য-গদ্য একধরণের সচেতন নির্মাণ। বিদ্যাসাগর কিন্তু ধ্বনি ও রূপের স্তরে অপেক্ষাকৃত জাঁকালো এই ভাষাকাঠামোর মধ্যেই এমন এক নমনীয়তার সন্ধান করেন যার সূত্রে সহজ হবে সংজ্ঞাপন, অর্থপ্রকাশে কোথাও অনর্থক বিঘ্ন ঘটবে না। তাই তিনি নজর দিলেন অন্বয়ে। তাঁর বাক্যগুলির দিকে তাকালে দেখি, বেশিরভাগ সময় তাঁর বাক্যগুলো দৈর্ঘ্যে মধ্যম — না-খুব-দীর্ঘ না-খুব-হ্রস্ব। যতি চিহ্নের নিয়মে দীর্ঘ তাঁর বাক্যগুলির দিকে তাকালে দেখা যায়, বহুসময় আদতে বিরামচিহ্ন দিয়ে ছোটো-ছোটো বাক্যগুলিকে জোড়া হয়, শৈলীবিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে বলা হয় অসংযুক্ত বাক্যবিন্যাস। আবার দেখি, যোজক ব্যবহার করে অথবা সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকায় বদলে ফেলে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বাক্য তৈরি করেন বিদ্যাসাগর। আবার কখনও একইসঙ্গে ব্যবহার করেছেন দুটি প্রযুক্তি। বড়ো বাক্যগুলো আদতে ছোটো-ছোটো বাক্যের সমবায়রূপে নির্মিত হওয়ায় একদিকে যেমন রক্ষিত হয় বাক্যের ভারসাম্য, অন্যদিকে তেমনই বিঘ্নিত হয় না ভাষার গতি। বাক্যের আন্বয়িক জটিলতাকে বিদ্যাসাগর পরিহার করেন সাপেক্ষ শব্দজোড়গুলো কাছাকাছি বসিয়ে। বাক্যে মোটের উপর বজায় রাখেন কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার আদর্শ ক্রমটিকে। প্রসঙ্গত এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যাসাগরের অব্যবহিত পূর্বে এবং সমকালীন বিভিন্ন লেখকের রচনাতেও দেখা যায়, তবে বিচ্ছিন্নভাবে। সচেতন ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরই এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে বাংলা শিষ্ট গদ্যের লক্ষণ হিসাবে প্রতিষ্ঠা দেন। মনে রাখা দরকার, বাংলাদেশে *বর্ণপরিচয়* (১ম ও ২য় ভাগ - ১৮৫৫)-এর ক্ষুদে পাঠককুল প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাংলা লেখ্য-গদ্যের এই আদর্শকে আত্মস্থ করেই (অন্তত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে) বড় হয়ে ওঠে।[৮]

বাংলা গদ্যের এই সাধারণ আদর্শের পাশাপাশি ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় রয়েছে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য, যা তাঁর গদ্যে নিজস্বতার নির্মাণ ঘটায়। যেমন গদ্যে ধ্বনিমিলের

যথেচ্ছ ব্যবহার। তৎসম শব্দের সচেতন প্রয়োগের সঙ্গে ধ্বনিমিলের (rhyme) ব্যবহার তাঁর গদ্যকে দেয় লালিত্য এবং সংগীতময়তা। তাঁর গদ্যে বিশেষণ-বিশেষ্য অথবা বিশেষ্য-বিশেষ্য শব্দবন্ধের মধ্যেও মিলের সম্ভাবনাকে রেখে দেন বিদ্যাসাগর। মিল থাকে সমাসবদ্ধ পদগুলির মধ্যে। তাঁর গদ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বিশেষণের বহুল প্রয়োগ। বিশেষণের উপর্যুপুরি ব্যবহারে তিনি গদ্যের মধ্যে সঞ্চারিত করেন চিত্রধর্ম। তাঁর গদ্যের সংস্কৃত আবহে অন্তর্ঘাত ঘটায় বাংলা ইডিয়ামের অনায়াস প্রয়োগ যা শীলিত গদ্যের শরীরে বিগর্ভিত করে বাঙালি প্রাকৃত জীবনের সুর। আখ্যানকার হিসাবে তিনি অভূতপূর্ব দক্ষতা দেখান সংলাপনির্মাণে। কিন্তু গদ্য প্রসঙ্গে যে কথাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল, বাংলা গদ্যের অন্তর্লীন ছন্দটিকে ধরতে পারেন বিদ্যাসাগর। এই ছন্দ প্রকৃতপক্ষে বয়ানের অন্তর্গত বাক্য তথা বাক্যগুচ্ছের ভিতর নির্মীয়মান এমন এক ভারসাম্য যা ফুটে ওঠে গদ্যের ধ্বনি-রূপ-অর্থের স্তরে। লিখিত গদ্যের শরীরে আমরা এই ছন্দকে প্রকাশ করি যতি ও বিরামচিহ্নের দ্বারা। এই লোকশ্রুতি মিথ্যা যে বিদ্যাসাগরই প্রথম ইংরেজির অনুসরণে বাংলা গদ্যে বিভিন্ন প্রকার বিরামচিহ্নের প্রয়োগ ঘটান। বস্তুত *বেতালপঞ্চবিংশতি*-র প্রথম দুটি সংস্করণে পূর্ণচ্ছেদ ছাড়া প্রায় কোনও বিরাম চিহ্নই ব্যবহৃত হয়নি। যদি কালক্রমে বিদ্যাসাগরের গদ্যে কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি চিহ্নের উপর্যুপরি প্রয়োগ আজকের পাঠককে বিস্মিত করে। বস্তুত প্রয়োগের এই ঈষৎ অতিরেকে তিনি যেমন নিজে ধরতে চান, তেমনই যেন পাঠককে ধরিয়ে দিতে চান লেখ্য ভাষার শরীরে, সদ্য খুঁজে পাওয়া, বাংলা গদ্যের ছন্দস্পন্দ।

বিদ্যাসাগরের ভাষাভাবনা

আমরা আগেই দেখেছি বাংলা ভাষা নিয়ে বিদ্যাসাগর সরাসরি আলোচনা বিশেষ করেননি। কিন্তু ভাষা বিষয়ে তাঁর স্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টির পরোক্ষ পরিচয় তাঁর কোনও-কোনও রচনায় প্রচ্ছন্ন থাকে। যেমন, *বর্ণপরিচয়* (১ম ভাগ)-এর বিজ্ঞাপন। সংস্কৃতের অনুসরণে বাংলা বর্ণমালায় ১৬টি স্বর ও ৩৪টি ব্যঞ্জন মিলিয়ে মোট ৫০ বর্ণের যে বিন্যাস, তাকে পরিবর্তন করতে উদ্যোগী বিদ্যাসাগর। তিনি যে শুধু দীর্ঘ-ঋ ও দীর্ঘ-ঌ কে বাতিল করেন তাই নয়, অনুস্বর ও বিসর্গকে ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে স্থান দেন। চন্দ্রবিন্দুকে এক স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনবর্ণ রূপে চিহ্নিত করেন। ক্ষ সংযুক্ত ব্যঞ্জন বলে অসংযুক্ত ব্যঞ্জনের তালিকা থেকে বাদ দেন। সব কটি সিদ্ধান্তের সঙ্গে

আজ আমরা সম্পূর্ণভাবে সহমত নাও হতে পারি। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হল বাংলা ভাষার নিজস্বতার দিকে তাকিয়ে ভাষার নিজস্ব চিহ্নতন্ত্রের পুনর্বিন্যাসে উদ্যোগী হন বিদ্যাসাগর। এই প্রসঙ্গে তিনি ড়, ঢ়, য়-কে বাংলা ভাষায় স্বতন্ত্র বর্ণরূপে স্বীকৃতি দেন —

> ড, ঢ, য এই তিনটি ব্যঞ্জনবর্ণ, পদের মধ্যে অথবা পদের অন্তে থাকিলে, ড়, ঢ়, য় হয়; ইহারা অভিন্ন বর্ণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন আকারে ও উচ্চারণ উভয়ের পরস্পর ভেদ আছে তখন উহাদিগকে স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া উল্লেখ করাই উচিত; এই নিমিত্ত, উহারাও স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনবর্ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।[৯]

এই পর্যবেক্ষণটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোয় আমরা জানি সংস্কৃতে ড/ড়, ঢ/ঢ়, এবং য/য় আলাদা স্বনিম নয়, একই স্বনিমের উপধ্বনি। অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় এরা একে-অপরের জায়গায় বসতে পারে না। বাংলা ভাষাতেও সম্পর্কটা একই রকম ছিল। কিন্তু বাংলা শব্দভাণ্ডারে ইংরেজি শব্দ প্রবেশের ফলে এই সম্পর্কটি আর রইল না, অর্থাৎ ধ্বনিগুলি এখন শব্দের মধ্যে একে-অপরের জায়গায় বসতে পারে। বিদ্যাসাগর স্বনিমতত্ত্ব জানেন না, তাঁর পক্ষে জানা সম্ভবও নয়। কিন্তু তীক্ষ্ণ ভাষাজ্ঞান দ্বারা তিনি সঠিকভাবে বুঝতে পারেন যে, বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র ধ্বনির চিহ্ন হিসাবে ড়, ঢ়, য় বাংলা বর্ণমালায় প্রবেশের যোগ্য।

বাংলা ভাষার চরিত্র সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আছে তাঁর অসমাপ্ত শব্দ-সংগ্রহে। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র, *সাহিত্য* পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বিদ্যাসাগরের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে দান করেন। ১৯০১ সালে *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*-য় 'শব্দসংগ্রহ' শিরোনামে এই তালিকাটি প্রকাশ পায়। পত্রিকা-সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভাষায় —

> বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা রচনায় সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ প্রচলিত করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্কৃতভাবাপন্ন করিয়াছিলেন, এইরূপ একটা অনুযোগ প্রচলিত আছে। তৎসঙ্কলিত তালিকা হইতে প্রতিপন্ন হইবে, খাঁটি

> বাঙ্গালার প্রতি তাঁহারা অশ্রদ্ধা ছিল না। বরঞ্চ বৈজ্ঞানিকোচিত ধৈর্য্য সহকারে তিনি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ সংকলনের পরিশ্রম স্বীকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শুনা যায়, একখানি বৈজ্ঞানিক-প্রণালী-সম্মত বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।[১০]

লক্ষণীয় দীর্ঘ-ঈ/ঊ, ঋ প্রভৃতি আদ্যক্ষরযুক্ত কোনও শব্দ এই সংকলনে নেই। কাহিনি, বাঙালি, কেরানি, দরদি, সরকারি প্রভৃতি বানানে বাংলার নিজস্ব উচ্চারণরীতি স্বীকৃত। অতৎসম বিশেষ্য-বিশেষণ, জাতি-জীবিকাবাচক প্রায় সবরকম শব্দই এবং চাকরানি, ননদি, বাঘিনি, নাপিতানি প্রভৃতি স্ত্রীবাচক শব্দে হ্রস্ব-ইকার ব্যবহৃত। সাধারণত অন্তঃস্থ-য দিয়ে লেখা হয় এমন শব্দের বানান বিদ্যাসাগর বর্গীয়-জ দিয়ে লিখেছেন। যেমন জে, জেমন, জখন, জতন প্রভৃতি। অর্থাৎ এই বানানগুলিও বাংলা উচ্চারণ-অনুসারী। শব্দসংগ্রহটিতে সাড়ে-সাতহাজারের মতো শব্দ সংকলিত। শব্দ সংখ্যা খুব বেশি না হলেও প্রায় বৈজ্ঞানিকের মতো নৈর্ব্যক্তিকভাবে শব্দগুলিকে নির্বাচন করেন বিদ্যাসাগর। মাগি, খানকি, পোঁদ প্রভৃতির মতো অপশব্দ অনায়াসে তালিকাভুক্ত হয়। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য দেখান ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *কলিকাতা কমলালয়*-এ শহুরে ভদ্রলোক ব্যবহৃত যে ১৮২টি আরবি-ফারসি শব্দের ফর্দ ছিল, তাদের মধ্যে ১৪৩টিকে বিদ্যাসাগর তাঁর তালিকায় ঠাঁই দেন। 'যাবনিক' বলে ভাষার শুদ্ধতা রক্ষার খাতিরে বাতিল করে দেন না।[১১] প্রসঙ্গত, বিদ্যাসাগর ভারতচন্দ্রের ভক্ত পাঠক ছিলেন।[১২] সুতরাং ভাষা হিসাবে বাংলার বিমিশ্র চেহারা ও নিজস্ব প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি যে সচেতন ও ছুৎমার্গহীন হবেন সে কথা বলা বাহুল্য।

বিদ্যাসাগরের বাংলা ভাষাভাবনা ও গদ্যচর্চার বৈপরীত্য

তাহলে কি বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষাকে যেভাবে বুঝতেন আর বাংলা ভাষাকে যেভাবে লিখতেন তার মধ্যে অনুত্তীর্য কোনও খাদ ছিল। বিদ্যাসাগরের সম্পর্কে অভিযোগ রামেন্দ্রসুন্দরের জবানিতে পাই — '[তিনি] বাঙ্গালা রচনায় সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ প্রচলিত করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্কৃতভাবাপন্ন করিয়াছিলেন'। কিন্তু বাংলা ভাষার নিজস্বতা সম্পর্কে সচেতনতা শুধু বিদ্যাসাগরের শব্দসংগ্রহে নয়, তাঁর ব্যক্তিগত ভাষাব্যবহারেও লক্ষ করি আমরা। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর শিক্ষক ও অভিভাবক ঈশ্বরচন্দ্র সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে

গিয়ে বলেন —

> বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সাধারণ কথাবার্ত্তায় সংস্কৃত শব্দ আদৌ ব্যবহার করিতেন না। তাহার লেখা পড়িলে মনে হয় যে, যেন তিনি সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না; কিন্তু লোকের সঙ্গে মজলিসে কথা কহিবার সময় এমন কি বাঙ্গালা slang শব্দ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না — 'ফ্যাপাতুড়ো খাওয়া' (to be confounded), 'দহরম মহরম', 'বনিবনাও', 'বিদঘুটে', 'বাহবা লওয়া' — এই রকমের ভাষা প্রায়ই তাঁহার মুখে শোনা যাইত। যাহাকে সাধু ভাষা বলে তিনি সে দিকেই যাইতেন না।[১৩]

কৃষ্ণকমলের মতে 'সেই সময়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কথোপকথনে যে ভাষা ব্যবহার করিতেন সেই ভাষাই বিদ্যাসাগরের রচনার বনিয়াদ।'[১৪] যদিও কৃষ্ণকমলের সাক্ষ্য অনুসারে বিদ্যাসাগর কথোপকথনে প্রাকৃত বাংলাই ব্যবহার করতেন। সে যাই হোক একটি কথা স্পষ্ট যে, বিদ্যাসাগরের মুখের ভাষা ও লেখার ভাষার মধ্যে দৃশ্যত এবং সম্ভবত শ্রুতিগ্রাহ্য পার্থক্য ছিল। এই পার্থক্যের চরিত্রটি বুঝে নেওয়া দরকার।

প্রাচ্যতত্ত্ববিদ (orientalist) ইউরোপীয়দের সূত্র ধরে আঠারো শতক থেকেই এই ধারণা প্রবল ছিল যে, সংস্কৃতের সন্তান হিসাবে তৎসম শব্দাবলি বাংলার স্বাভাবিক উত্তরাধিকার। বরং মধ্যযুগজুড়ে বাংলা শব্দভাণ্ডারে যে সেমিটিক শব্দাবলির প্রাদুর্ভাব, তা প্রকৃতপক্ষে প্রক্ষেপ, সুতরাং বিশুদ্ধ লেখ্য বাংলার নির্মাণকল্পে পরিত্যাজ্য।[১৫] স্বাভাবিকভাবে প্রাচ্যতত্ত্ববিদ এবং তাঁদের অনুবর্তী সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি পণ্ডিত যাঁরা বাংলা গদ্যনির্মাণের প্রাথমিক পর্বে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেন, এমন এক গদ্যভাষার নির্মাণে মনোযোগী হলেন, যা সংস্কৃত শব্দকণ্টকিত এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের অধীন। এ-কথা ঠিক যে উচ্চ ভাব ও কল্পনাকে ধারণ করতে সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারের কাছে বাংলা ভাষা আন্তরিকভাবে অধমর্ণ। কিন্তু অ-তৎসম শব্দাবলিকে নির্বাসিত করে ভাষার রূপনির্মাণের প্রচেষ্টা শুধু রক্ষণশীলতা নয়, প্রকৃতপক্ষে ছিল একধরণের ভাষা-রাজনৈতিক উদ্যোগ। প্রসঙ্গত বাংলা ব্যাকরণ, বানান ও লেখ্য গদ্যের জগতে সংস্কৃতের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণই ছিল এই ভাষা-রাজনৈতিক প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য।

বিদ্যাসাগরের মতো গদ্যশিল্পী সম্ভবত এহেন রক্ষণশীল ভাষাদর্শ থেকেই তাঁর যাত্রা শুরু করেন। উনিশ শতকের প্রথম পর্বে, ইয়েটস্ যাকে বলেছেন

'pedantic', সেই ধরণের বাংলা গদ্যে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হত। *বেতালপঞ্চবিংশতি*-র প্রথম কয়েকটি সংস্করণে এই ধরণের শব্দপ্রয়োগ দেখা যায়। যেমন আস্যদেশ, বারযোষিৎ, প্রাড়্বিাক, উৎকলিকাকুল, পুংশ্চলী, ডিণ্ডিম, মলিম্লুচ প্রভৃতি। অবশ্য পরবর্তী সংস্করণে এই শব্দগুলো পরিত্যক্ত হয়। আবার কোনও-কোনও ক্ষেত্রে ১ম সংস্করণের ভাষাপ্রয়োগ পরবর্তী সংস্করণে সংস্কৃতগন্ধী হয়ে ওঠে। যেমন ১ম সংস্করণের 'কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না' ২য় সংস্করণে হয়েছে 'বাক্যনিঃসরণ করিতে পারিলেন না'। আবার ১ম সংস্করণের 'ফল দিয়া' ২য় সংস্করণে পরিণত হয়েছে 'শ্রীফল প্রদান পূর্ব্বক'। এছাড়া দেখি তদ্ভব ক্রিয়ার পরিবর্তে ভাববাচ্যে যৌগিক ক্রিয়াপদের (যেমন 'গেলেন'-এর পরিবর্তে 'গমন করিলেন') সুপ্রচুর প্রয়োগ। দেখি-ইয়া প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার পরিবর্তে 'প্রযুক্ত', 'পূর্ব্বক', 'পুরঃসর', 'অন্তর' প্রভৃতি যুক্ত ভাববচনের অত্যধিক ব্যবহার।[১৬] ভাষার এই প্রযুক্তিগুলো বাংলা লেখ্য-গদ্যকে কথ্য বাংলার সজীবতা থেকে সুদূর, অপেক্ষাকৃত সুদৃঢ়-গম্ভীর কিন্তু কৃত্রিম এক ভাষা-সংগঠন রূপে নির্মাণ করে। বিদ্যাসাগর হয়ত তাঁর গদ্যে শেষ পর্যন্ত এই রক্ষণশীলতাকে পুরোপুরি প্রশ্রয় দেন না। কিন্তু এই রক্ষণশীলতার প্রত্যক্ষ বিরোধিতাও করেন না। এমনকী তিনি যখন তাঁর গদ্যের মধ্যে বাংলার অন্বয়রীতিকে সার্থকভাবে গ্রহণ করেন এবং সেই সূত্রে গদ্যের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেন বাংলা গদ্যের নিজস্ব ছন্দস্পন্দ; যখন গদ্যের ভিতর ব্যবহার করেন বাংলা ইডিয়াম, তখনও রূপতত্ত্বের স্তরে, বিশেষত গদ্যের শব্দভাণ্ডারে যে রক্ষণশীলতাকে (ঐতিহ্যসূত্রে) বহন করে চলেন তিনি, তাকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে উদ্যোগী হন না। *আবার অতি অল্প হইল* অথবা *বিদ্যাসাগর চরিত*-এর মতো রচনায় এই রক্ষণশীলতা টাল খায় বটে, কিন্তু শেষ হয় না। বিদ্যাসাগরীয় গদ্য চিরকালের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে আলালী গদ্যের বিপরীতে — এক উচ্চকোটির শিষ্টতাগর্বী ভাষাভঙ্গির মেটাফর হয়ে। সুতরাং বাংলার ভাষার নিজস্ব প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন থেকেও এক সংস্কৃতায়িত লেখ্য-গদ্যের চর্চা হয়ত বিদ্যাসাগরের ভাষাভাবনার অন্তর্গত স্ববিরোধকেই প্রকট করে।[১৭] এই স্ববিরোধিতা সম্ভবত প্রাচ্যতত্ত্ব প্রাণিত বাংলা গদ্যচর্চার যে পরম্পরা, তার অনিবার্য ভবিতব্য। একে অতিক্রমের জন্য প্রয়োজন হবে নতুন এক প্রণোদনার — বাংলা গদ্যের বিবর্তনে প্রবল এক (বাঙালি) জাতীয়তাবাদী প্রেরণার। কিন্তু তা মূলত পরবর্তী শতকের আখ্যান।

তথ্যসূত্র

১। Das S. K., *Early Bengali Prose: Carey to Vidyasagar,* Calcutta, BookLand Pvt. Ltd. 1966, p. 241

২। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *বিদ্যাসাগর রচনাবলী,* কলকাতা, তুলিকলম, ১৯৮৭, পৃ. ৭

৩। তদেব, পৃ. ১৫১

৪। তদেব, পৃ. ৬৯৫

৫। তদেব, পৃ. ১০৯৫

৬। তদেব, পৃ. ৪২৮-২৯

৭। তদেব, পৃ. ৩৯৭

৮। কৌতূহলী পাঠক উপরে উদ্ধৃত বিদ্যাসাগরের গদ্যাংশগুলি সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে পারেন *বর্ণপরিচয়* (২য় ভাগ)-এর চিরপরিচিত এই অংশটুকু 'ভুবনের মাসী ঐ স্থানে আনীত হইলেন, এবং ভুবনকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে, তাহার নিকটে গেলেন। ভুবন কহিল, মাসী; এখন আর কাঁদিলে কি হইবে। নিকটে এস, কানে কানে তোমায় একটি কথা বলিব। মাসী নিকটে গেলে পর, ভুবন কাঁহার কানের নিকটে মুখ লইয়া গেল এবং জোরে কামড়াইয়া, দাঁত দিয়া তাঁহার একটি কান কাটিয়া লইল।' দ্র. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *বিদ্যাসাগর রচনাবলী,* কলকাতা, তুলিকলম, ১৯৮৭, পৃ. ১২৭৫। শিশুদের জন্য রচিত হলেও বিদ্যাসাগরের অন্যান্য রচনার সঙ্গে এই গদ্যের চরিত্রগত মিল আমাদের নজর এড়ায় না।

৯। তদেব, পৃ. ১২৪৯

১০। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* পত্রিকাধ্যক্ষ প্রভাতকুমার দাস, কলকাতা, ১১০ বর্ষ ৩ সংখ্যা, ১৪২০, পৃ. ১

১১। তদেব, পৃ. ৬২-৬৯

১২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের ভাষায় — 'বিদ্যাসাগর ভারতচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনা অতিশয় পছন্দ করিতেন।... আমি তাঁহাকে কোনও কোনও সময়ে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলের' কবিতা গদ্গদভাবে [য.] আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি। আমার বেশ মনে হইতেছে একদিন তিনি 'হেথায়

ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া' ইত্যাদি কবিতাটি বিশেষ আনন্দের সহিত পড়িতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, — 'দেখ দেখি, কেমন পরিষ্কার ঝর্‌ঝরে ভাষা।" দ্র. বিপিনবিহারী গুপ্ত, *পুরাতন প্রসঙ্গ,* সম্পা. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৯, পৃ. ৭১। ভারতচন্দ্রের ভাষা যে 'যাবনি মিশাল' বিমিশ্র সে-কথা বলা বাহুল্য।

১৩। তদেব, পৃ. ২৫

১৪। তদেব

১৫। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় বাংলা ব্যাকরণ রচনা কালে হ্যালহেডের ভাষা সংক্রান্ত প্রকল্পটি — 'The following work [A Grammar of the Bengal Language] presents the Bengali language merely as derived from its parent Sanskrit. In the course of my design I have avoided, with some care the admission of such words as are not natives of the country, and for that reason have selected all my instances from the most authentic and ancient composition.' দ্র. Halhed N.B., Prefece, *A Grammar of the Bengal Language,* Calcutta, Ananda Publishers Pvt. Ltd., 1980, p.xxi-xxii.

১৬। সুকুমার সেন *বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য,* ৩য় সং., কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৩৫৬, পৃ. ৬০.

১৭। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিদ্যাসাগরের সমকালীন সংস্কৃত কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক শ্যামাচরণ সরকার একটি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। এটি ছিল সংস্কৃতের অনুশাসনমুক্ত খাঁটি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনার প্রথম সফল উদ্যোগ। এই উদ্যোগ কিন্তু বিদ্যাসাগরের সমর্থন পায়নি। কৃষ্ণকমলের ভাষায় — '... যেমন পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল, অমনই বিদ্যাসাগর সে বইখানাকে (pooh pooh) করিলেন, আমরাও সকলে বিদ্যাসাগরের সহিত যোগ দিলাম। শ্যামাচরণবাবু মাথা তুলিতে পারিলেন না। দ্র. বিপিনবিহারী গুপ্ত, *পুরাতন প্রসঙ্গ,* সম্পা. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৯, পৃ. ২৭

নির্জন ঈশ্বর ঃ সভ্য ভদ্র নব্য সমাজ ও বিদ্যাসাগর

সুমন্ত মুখোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগরের কোনো ঈশ্বরবোধ ছিল কি না শেষ পর্যন্ত বলা খুব মুসকিল। কিন্তু, ঈশ্বরচন্দ্রের নিশ্চিত ভাবেই একটি নিজস্ব স্বর্গ ছিল। জীবনের শেষ উনিশ-কুড়ি বছর প্রায়শঃ তাঁকে দেখা যেত সেই নির্জন নন্দনে। কলকাতা থেকে ১৬৮ মাইল পশ্চিমে পূর্বরেলওয়ের লাইন বরাবর উজিয়ে গেলে মধুপুর আর জামতাড়ার মাঝামাঝি পড়বে ছোট্ট এক গঞ্জ — কার্মাটাঁড়। 'কার্মা' নামের কোন্ এক সাঁওতালের 'টাঁড়' বা উঁচু জমি। সেখানেই রেলস্টেশন আর পোস্ট অফিস নিয়ে গড়ে উঠেছে কয়েক ঘর কেজো মানুষের ছোট খাটো জনপদ। আর রয়েছে দীর্ঘদিনের অধিবাসী সাঁওতালরা। এইসব অঞ্চলের জঙ্গল-কৃষিভুমির আদিম নিবাসী, জনজাতির সেই উঁচু জমি, উঁচু মাথা, ততদিনে দুতরফের জাঁতাকলে পড়ে হেঁট হয়ে গেছে। ইংরেজ-রা তো আছেই। সঙ্গে আছে 'ভদ্র' 'সভ্য' 'নব্য' সমাজের লোকেরাও। কেউ বাঙালী, কেউ রাজপুত, কেউ বা অন্য নানাখানের। ওই জমি-জিরেত দখলে, অত্যাচারে, বিনি মাগনায় মুনিষ খাটাতে, ঋন জালে বেঁধে সব লুঠে নিতে, অথবা বন জঙ্গল কেটে সাফ করতে কেউ কম যায় না। কাজের সময় খাটায়। ঠকানোর সময় ঠকায়। অন্য সময় ঘেন্না করে। কার্মা-র নামটাই খামোকা উঁচু হয়ে আছে। বাকি সবই নীচু। রেল লাইনটা বাদে।

এইখানেই এক মেম সাহেবের কাছ থেকে খানিকটা জমি সহ ভাঙাচোরা বাড়ি কেনেন বিদ্যাসাগর। ১৮৬৬ সালের অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকেই মজবুত শরীরটা বার বার সমস্যায় ফেলছিলো। এই সময়ের চিঠিপত্রে দেখা যাচ্ছে নানা জায়গায় জল-হাওয়া বদলানোর জন্য যেতে হচ্ছে তাঁকে। কখনো বর্ধমান, কখনও বা দেওঘর। ওই দেওঘরেই একটা জায়গা দেখেছিলেন, বন্ধু রাজনারায়ণ বসুর বাড়ির কাছে। দামটা বড় বেশি। তাই কেনা হল না। ঠিক কবে ৫০০ টাকায় ওই কার্মাটাঁড়ের জমি-বাড়ি কিনেছিলেন বিদ্যাসাগর আকর গ্রন্থ গুলিতে তার হদিশ নেই। ১৮৭০

বা ৭১-এর কোনো সময়ে কি? ১৮৭২-এ ঠাকুরদাসকে লেখা একটি চিঠিতে পাচ্ছিঃ

> আমার উদরাময় হইয়াছি তজ্জন্য অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছি। আমি কল্য অথবা পরশ্বঃ কর্ম্মাটাড় নামক স্থানে যাইতেছি তথায় কিছুদিন থাকিব। সেখানকাল জলবায়ু বড় ভাল। তথায় কিছুদিন থাকিলে স্বচ্ছন্দ ও সবল হইতে পারিব। এই পত্রের পঁহুছ সংবাদ ঐ ঠিকানায় লিখিবেন। আমার নাম লিখিয়া ঠিকানার স্থলে —
>
> ''কর্ম্মাটাড় স্টেশন''
> এই মত লিখিলেই আমি পত্র পাইব।

১২৮০ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে লেখা এই চিঠি থেকে আন্দাজ করা যায় নতুন জায়গায় তিনি তখনো খুব একটা সড়গড় হয়ে উঠেছেন তা নয়। তবে ক'দিনের মধ্যেই সাঁওতাল জনজাতি অধ্যুষিত কর্মাটাড়েই তৈরী হবে তাঁর নিরালা বাসস্থান — 'নন্দন কানন'। এই নামটিই দিয়েছিলেন বাড়ির — স্বর্গের বাগান। আর সেই স্বর্গেও ব্যস্ততার কোনও কমতি ছিল না। পড়াশোনা প্রুফ সংশোধন ছাড়া সারাদিনই ব্যস্ত হয়ে ছুটে বেড়াতেন চিকিৎসার ওষুধ নিয়ে। ডিস্পেন্সারিও খুলেছিলেন একটা। হতদরিদ্র সাঁওতাল পরিবারের ছেলে মেয়েদের জন্য পরে এক অবৈতনিক বিদ্যালয়ও খুলবেন। মোটের ওপর কলকাতা শহর থেকে দূরে, সভ্য সমাজের লোকজনকে খানিক এড়িয়ে নিজের জন্য এক স্বর্গীয় উদ্যান বানালেন বিদ্যাসাগর। বাড়ির নাম করণে তাঁর অভিপ্রায়টুকু টের পাওয়া যায়। কম কথার মানুষটি এর চেয়ে আর বেশি বলেননি। তবে তাঁর উদ্যোগপর্ব খতিয়ে দেখলে বোঝা যায়, বিশ্রাম বা শরীর সাড়ানো নয় এখানে শুরু হল তাঁর জীবনের আর এক অধ্যায়। এই 'নন্দনকানন' ঠিক পশ্চিমে গজিয়ে ওঠা কলকাতার বাবুদের বাগান বাড়ির মত ছিল না। ফুল-এর শোভা-র পাশাপাশি নানা স্থান থেকে ভালো জাতের আমের চারাও লাগিয়ে ছিলেন। 'নন্দন' শব্দের মধ্যে আনন্দের উৎস আছে। এইখানে, কলকাতা, বীরসিংহের সমসমাজ থেকে সরে এসে বিদ্যাসাগর আনন্দ পেতেন। একেবারে মৃত্যুশয্যায়, তাঁকে কেউ কেউ পরামর্শ দিতেন, — চলে যান কার্মাটাঁড়। সেখানেই তো ভালো থাকেন আপনি। যেতে চাইলেও এক অসম্ভব নৈতিক তাড়নায় যেতে পারেননি ঈশ্বরচন্দ্র। তাঁর সাধের স্বর্গোদ্যানে। এমনি এক বর্ণনা আছে হাইকোর্টের উকিল শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের সাক্ষ্যে।

ইন্দ্রমিত্রের ভাষায়ঃ

> বিদ্যাসাগর তখন কলকাতায়। শরীর ভেঙে পড়েছে তাঁর। একদিন দুপুরবেলা বাড়িতে একলা বসে আছেন, এমন সময় হাইকোর্টের উকিল শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য দেখতে এলেন তাঁকে। প্রণাম করলেন। জিজ্ঞেস করলেন — আজ আপনি কেমন আছেন? — ভালো নয়। ক্রমেই অসুখ বেড়ে যাচ্ছে। তার উপর এখানে অনেক কাজ, সুস্থ হবার উপায় নেই। — আপনি কার্মাটাঁড়ে গেলে ভালো থাকেন। আর সেখানে আপনার বিশ্রামও হয়। কিছুদিন সেখানে গিয়ে থাকুন না। — আমার পক্ষে আজকাল সবই সমান। সেখানেও বড় ভালো থাকি না। — খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন বিদ্যাসাগর। তারপর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন — বাপু, সেখানে গেলে ভালো থাকি বটে। আমার যদি অতুল ঐশ্বর্য থাকত, তাহলে সেখানে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারতাম, শরীর-মন ভালো থাকত। কিন্তু, আমার সে-অদৃষ্ট কই? আমার সে-ক্ষমতা কই? দ্যাখো, কার্মাটাঁড়ে একসের চালের ভাত, আধসের অড়হর ডাল, আধসের আলু আর একসের মাংসে যে অনায়াসে খেতে পারে, তাকে আজকাল পোয়াটাক ভুট্টার ছাতু খেয়ে থাকতে হয়, তার বেশি আর জোটে না। আমি সেখানে গিয়ে দিব্যি খাওয়া-দাওয়া করব, আর আমার চারদিকে সাঁওতালেরা না খেয়ে মারা যাবে, দেখব — একি সইতে পারি?
> বিদ্যাসাগর আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

বিদ্যাসাগর আর কার্মাটাঁড় বিষয়ক লেখায় বার বার যে প্রসঙ্গ আসে সে হল ক্ষুধা আর খাদ্য। স্বাস্থ্য আর সেবা। কিন্তু সেটা নিজের জন্য নয়। একদল মানুষের জন্য। তাঁর চৈতন্যে নির্জনতার কোনো ফুরসৎ নেই। সবসময়েই সেখানে ভিড় করে আসে মানুষ। যারা পেঠ ভরে খেতেই পায় না দু-বেলা। ভাতে নুন পেলেই হল আর শাক পড়ে যদি, তবে তো জন্মদিন! এ কিন্তু দাতা গ্রহীতার গল্প নয়। এখানে আত্ম প্রসারের এক নান্দনিকতা আছে। মনে রাখা চাই বিদ্যাসাগর অনেক সময় নুন দিয়ে এক মুঠো ভাত মেখে খেতেন। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, যদি আবার তেমন দিন আসে? অভ্যেস তো রাখা দরকার।

নিজের 'আমি'কে সমবেদনার ভেতর দিয়ে সমানুভূতির পথে সমষ্টির সঙ্গে জুড়ে দিতে না পারলে এই কথা বলা যায় না। তখন তোমার খেতে না পাওয়া, হতে পারে আমারও ক্ষুধার মূল। তাই ঈশ্বর নিঃসঙ্গ হতে পারেন। কিন্তু খাঁটি মানুষের

জন্য নির্জনতার কোনো অবকাশ নেই। একই সঙ্গে এও বলা চলে খাদ্য, স্বাস্থ্য ছাড়াও আরও একটি দুটি বিষয় বিদ্যাসাগরের কার্মাটাঁড় পর্বে জুড়ে আছে। তার মধ্যে প্রধান হল চরিত্রের সন্ধান। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন ঃ

> ঐ অঞ্চলের দরিদ্র অধিবাসী সাঁওতাল। ইহারা অতি সরল প্রকৃতির লোক। স্নেহ মমতা, আদর যত্ন ও মিষ্ট কথার গোলাম, কিন্তু চরিত্র বিষয়ে স্ত্রী পুরুষ অধিকাংশই খুব খাঁটি লোক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মিষ্ট কথা ও দয়া মায়া দেখিয়া সেখানকার সমগ্র সাঁওতাল অধিবাসী তাঁহার আপনার লোক হইয়া পড়িল।

অথচ এই সময়েই বিদ্যাসাগরের আত্মীয় পরিজন, 'আপনার' লোক যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে দূরত্ব বেড়েই চলেছে। তিনি বীরসিংহ গ্রাম ত্যাগ করেছেন। পুত্র-কে ইচ্ছাপত্রে বঞ্চিত করেছেন তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে। 'পরিবার' নামক সামাজিক এককটি তাঁর কাছে কেবল দায়িত্ববোধে টিঁকে আছে মনে হয়। অথচ যদি ১৮৫১ সালে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীতিবোধ' গ্রন্থে বিদ্যাসাগর লিখিত সাতটি অংশের দিকে নজর করি, তবে 'পরিবারের প্রতি ব্যবহার' প্রস্তাবটির প্রথম লাইনেই দেখা যাবে ঃ

> আমাদিগের পিতা, মাতা, ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি পরিবারবর্গের প্রতি সদা সদয় ও অনুকূল হওয়া উচিত।

এই অনুকূল আচরণ বিদ্যাসাগরের উইল পড়লে আন্দাজ পাওয়া যায়। অর্থের ভাগ বাঁটোয়ারা ছাড়া সেখানে আবেগের লেশ মাত্র নেই। আর ঐ একই সময়ে লেখা ১১টি চিঠিতে আছে তাঁর নিষ্ক্রমণের সংকল্প। পরিবার, সংসার ছেড়ে তিনি চলে যেতে চান। যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁর এই সংকল্পটি কাজে পরিণত করেননি। বাবা ও মায়ের-সঙ্গে দেখা করতে কাশী গেছেন। বাদুড়বাগানে, কলকাতায় বানিয়েছেন স্থায়ী বসত বাড়ি ১৮৭৬ সালে। আশ্চর্যের হল বাদুড়ের বিশ্রাম-ভঙ্গিটি। বিদ্যাসাগরের 'নন্দনকানন' আর বাদুড়বাগানের বাসগৃহ ঠিক যেন এক আশ্চর্য প্রতিমুখী দুই শব্দ-প্রতীক হয়ে দেখা দিল। অস্বাভাবিক এক নব্য সমাজ একদিকে, অন্যপ্রান্তে আদিম এক জনজাতির সংস্রব — কোনটি তিনি গ্রহণ করলেন আর ছাড়লেনই বা কোনটি?

নিজের সমাজ, সভ্য ভব্য নব্য প্রাণী গুলিকে বিদ্যাসাগর যে দিনে দিনে এড়িয়ে চলছিলেন সে প্রমাণ তাঁর রচনাংশে খুব কম থাকলেও চিঠি পত্রে এবং ব্যক্তিগত বিনিময়ে অজস্র। পরিবার শুধু নয়, সমাজের প্রতিও একরকম বিতৃষ্ণা তাঁর জন্মেছিল। আর সেই বীতস্পৃহার মূল কারণগুলি খতিয়ে দেখলে, দেখা যাবে নিজের শ্রেণীটির মূল্যবোধের অধঃপাত তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠছিলো। বিদ্যাসাগরের নৈতিক অবস্থান অত্যন্ত জটিল এক গবেষণার বিষয়। 'নীতিবোধ'-এর কয়েকটি লেখা, বোধোদয়, বর্ণপরিচয় বা শিশুপাঠ্য বইগুলি থেকে তাঁর এথিক্স এর আন্দাজ পাওয়া শক্ত। তবে একথা ঠিক তাঁর শিক্ষাচিন্তার মস্ত জায়গা যে নৈতিকতা দখল করে আছে সে বিষয়ে সন্দেহ করার কোনো অবকাশ নেই।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আভাসে উল্লেখ করলেও বিদ্যাসাগরের কথা বলতে গিয়ে প্রথম, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য একটি আশ্চর্য উক্তি করেন ঃ

> শেষাশেষি বিদ্যাসাগর কতকটা misanthrope নরজাতি বিদ্বেষী হইয়াছিলেন। বিস্তর লোকের ব্যবহার তাঁহার প্রতি এরূপ কদর্য হইয়াছিল যে অনেক সহ্য করিয়া শেষটা তিনি অসংযত-বাক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, অধিকাংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এরূপ অসার যে অর্থলোভে তাহারা না পারে এমন কাজ নাই। আবার ইংরাজি শিক্ষিতাভিমানীকেও তিনি যেন ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন।...
>
> এইরূপ মনের ভাব লইয়া তিনি শেষাশেষি সভ্যজাতি ও সভ্যতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ অসভ্য জাতিদিগের সরলতা ও অকপটতার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কর্ম্মটাড়ে বাস করিয়া তিনি সাঁওতাল জাতির বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, এবং সর্বদাই তাহাদের সরলতার প্রশংসা করিতেন।

এই বিবরণের পক্ষে ও বিপক্ষের সামান্য যে তর্ক বিদ্যাসাগর গবেষণায় দেখতে পাই তা যথেষ্ট নয়। তাঁর এই পর্বের কাজ-কর্ম-কথা-আচরণ মন দিয়ে পাঠ করলে দেখা যাবে, যে-শিক্ষাব্যবস্থা, নতুন মানুষের চাষ করবার কাজে তিনি লাগিয়েছিলেন তার একদিকে যেমন ছিল এই খেদোক্তি ঃ

> ছেলেপুলেকে আর যা করি আর না করি, ইংরাজি ত কখনও শেখাবো না; অসার ও ডেঁপো হবার এমন পথ আর নাই।

অন্যদিকে সংস্কৃত কলেজে ইংরাজি পঠন চালু করার পক্ষে জোরালো সওয়াল, শেষদিন পর্যন্ত মেট্রোপলিটন কলেজ-কে দাঁড় করানোর প্রয়াস। একে ঠিক আধুনিকতার দ্বিধা দ্বন্দ্বের তত্ত্বকাঠোমায় পড়া যাবে না। যেমন পড়তে চেয়েছেন অশোক সেন অথবা সুমিত সরকার। *নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস* তিনি লিখেছিলেন ঠিকই, কিন্তু নতুন ভারতীয় সমাজ-সভ্যতা গঠনের ভাবনা থেকে কোনোদিন তিনি কখনো সরে দাঁড়াননি। এই খানে আমাদের মনে পড়ে যাবে কার্মাটাঁড়ে পৌঁছনোর আগেই ১৮৬৩র এক কাহিনীতে তিনি লিখেছেন ঃ

> তখন সেই অসভ্যজাতীয় ব্যক্তি গর্ব্বিত বাক্যে বলিল, মহাশয়, আমরা বহুকালের অসভ্য জাতি; আপনারা সভ্য জাতি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। কিন্তু দেখুন, সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার বিষয়ে অসভ্য জাতি, সভ্য জাতি অপেক্ষা কত অংশে উৎকৃষ্ট।

'সভ্য' ও 'অসভ্য' কথাটার এই বিপর্যাস বিদ্যাসাগরের শেষ পর্বের রচনায় বার বার দেখা দেবে। 'ভদ্র' কথাটির প্রয়োগেও তাঁর তিক্ত উপহাসে বোঝা যাবে সামাজিক ব্যবহারের স্তরে তিনি শব্দগুলি গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হয়ে উঠছেন। 'সভ্যতা' 'সদাচারের' সন্ধানে থাকবন্দী সমাজের ভাষান্তর ভেদ করে অন্য কোনো সম্ভাবনার দিকে যেতে চেয়েছেন তিনি। যার পরিচয় বোঝার জন্য তাঁর শেষ পঁচিশ বছরের মানসিক ইতিহাসে মন দেওয়া চাই। আর সেই ইতিহাসে কার্মাটাঁড় ও সাঁওতাল কৌম সমাজের মস্ত ভূমিকা আছে। অনেক কাহিনীর মধ্যে একটির উল্লেখ করা যেতে পারে। কার্মাটাঁড়ে যখনই যেতেন বিদ্যাসাগর দুহাত ভরে তাঁর সাঁওতাল 'সুহৃৎ' দের জন্য নিয়ে যেতেন খাদ্য-বস্ত্র-মণিহারী। আর সাঁওতাল-রাত্ত যে যা পারতো নিয়ে হাজির হত তাঁর বাগানে। একদিন এক বৃদ্ধ সাঁওতাল হাতে ছোট্ট এক মুরগির ছানা নিয়ে হাজির। নিজের কুল-শীলের চিহ্ন ওই পৈতে সুতো তুলে ধরে বিদ্যাসাগর বললেন, এ আমি নিতে পারবো না। — অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলো সেই বুড়ো। বিদ্যাসাগর পৈতে ভুলে মুরগি নিলেন হাত পেতে। মনে রাখা দরকার তাঁর শেষজীবনের সবচেয়ে দীর্ঘ সময় নিয়ে রচিত গ্রন্থ 'আখ্যান মঞ্জরী'র (যে চেহারায় রচনাবলীতে এযাবৎকাল গৃহীত) প্রথম কাহিনীটির নাম ছিল 'প্রত্যুপকার'। সমসমাজ সম্বন্ধে তাঁর নির্মম পরিহাসটি ও আমাদের জানা ঃ ও আমার নামে নিন্দে করে কেন ? আমি তো তার কোনও উপকার করিনি।

'নোবেল স্যাভেজ' নামক যে রোমান্টিক ধারণা আধুনিক ইউরোপের চৈতন্যে

উঁকি দিয়েছিলো ঔপনিবেশিক সমাজে তা সম্ভব নয়। বস্তুত তাঁর মনে কখনোই নয়, যিনি ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বাংলা ভাষায় প্রথম 'ঔপনিবেশিক' শব্দটি প্রয়োগ করেন। এ নিয়ে সবিস্তার আলোচনা বারান্তরে করা যাবে। তাই বিদ্যাসাগরের সেই প্রত্যয় ঃ 'তোমাদের মতো ভদ্রবেশধারী আর্যসন্তান অপেক্ষা আমার অসভ্য সাঁওতাল ভালো লোক' — আমাদের ভালোমন্দ ভদ্র সভ্য ধারণা গুলির গোড়া ধরে নাড়া দিয়ে যায়।

বিদ্যাসাগর বলেছিলেন সাত হাত মাটি খুঁড়ে ফেলে তবেই নতুন মানুষের চাষ করা দরকার। ওই মাটি খুঁড়ে তোলার কাজই বোধহয় মন দিয়ে করেছিলেন বিদ্যাসাগর। ভারতীয় সমাজের সন্ধানে ওই প্রাচীন কৌম অব্দি পৌঁছেছিলেন। ইতিহাসের পরত পেরিয়ে নৃতত্ত্বের এলাকায় ঢুকে এক নৃতত্ত্ববিদ নিজেকে বলেছিলেন — ঐতিহাসিকদের মাঝখানে তিনি এক নৃতাত্ত্বিক। বিদ্যাসাগরের অভিযাত্রা খানিকটা সেইরকম। আমাদের দু পলেস্তারা অসাড় সমাজের মাটি তুলে ভারতীয়ত্বের সন্ধানে এক আদিম কৌম সমাজের পাশে হাজির হয়েছিলেন তিনি। সেখানেই তাঁর সুখের স্বর্গ। যেখানে হায়ারার্কি নেই। আর ভব্য সভ্য নব্য ভূত যারা তাদের ও ঠাঁই নেই কোনো। একটি আশ্চর্য সমাপতনের কথা বলে বিষয়টিতে যবনিকা টানি। বিদ্যাসাগরের এই কাহিনী পড়তে গিয়ে আমাদের অনেকেরই চকিতে মনে পড়ে যাবে 'অতিথি' গল্পের মনোমোহনকে। নিজেরই লেখা যে গল্প নিয়ে 'আগন্তুক' চলচিত্রটি বানিয়েছিলেন সত্যজিৎ। গল্পের চেয়ে ঢের গম্ভীর শেষ ছায়াছবিটিতে সভ্যতার ঔপনিবেশিক পশ্চিমী চেহারার সরাসরি সমালোচনা করেন চিত্র নির্মাতা। মনোমোহন নৃতত্ত্ববিদ। মনোমোহন আদিবাসী কৌম সমাজের সমর্থনে তর্ক পরায়ণ। আধুনিক বিজ্ঞানবাদী সভ্যতার আগ্রাসী সমালোচক। তাঁর নিজের পরিবারে পরিচিতি প্রমাণ দাখিল করতে গিয়ে বিরক্ত, বিতশ্রদ্ধ মানুষটি চলে আসেন সাঁওতাল পল্লীতে। এবং শেষ পর্যন্ত উইল করে তাঁর সম্পত্তি দিয়ে যান তাঁর ভাগ্নীকে। আবার উধাও হয়ে যান নিজস্ব আদলে। ভূগোল খগোল চষে ফেলবার বর্ণনা সংগ্রহ করতে। বিদ্যাসাগর আমাদের সমাজে খানিকটা আগন্তুক। আর সত্যজিৎ এই ছবিটি তৈরী করেছিলেন ১৯৯১ খৃষ্টাব্দে। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের মৃত্যুর শতবর্ষ ছিল সে বছর।

ইতিহাস একটা কোনো সূত্রে তার নায়ক-দের প্রবেশ ও প্রস্থানের কাহিনী বলেই চলে। আগে কবিরা সে কাহিনী বলেছেন। বর্তমানে বা ভবিষ্যতেও বলে যাবেন। আমাদের কাজ শুধু শুনতে পারা। আর কিছু নয়।

লেখক পরিচিতি ঃ

মূল আলোচনা সভার আলোচক

১) **ড. স্বপন চক্রবর্তী (জন্ম - ১৯৫৪)** ঃ অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ, ২০১৯-এ প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। এর আগে পড়িয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগে। জাতীয় গ্রন্থাগারের মহা অধিকর্তা এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সংগ্রহাধ্যক্ষ ও সচিব পদে একই সঙ্গে কাজ করেছেন। বাংলা ইংরাজি দুই ভাষাতেই গবেষণামূলক নানা গ্রন্থের রচয়িতা। শেক্সপিয়র, রেনেসেন্স, ছাপাখানা, বই-এর ইতিহাস এবং নানা দেশের কবিতা ছাড়াও বাংলার সংস্কৃতি তাঁর দীর্ঘ দিনের চর্চার বিষয়।

২) **ড. মৌ দাশগুপ্ত (জন্ম - ১৯৬৮)** ঃ অধ্যাপক, কবি, অনুবাদক ও প্রাবন্ধিক। বেদ বৈদগ্ধের জন্য দেশবিদেশে খ্যাতনামা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনা করেন। সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে নানা সুপরিচিত প্রবন্ধ লিখেছেন। নানা পুরস্কার ও সম্মান লাভ করেছেন। কবিতায় গীতার কাব্যানুবাদ ছাড়াও হিন্দি থেকে অনুবাদ করেছেন হাজারিপ্রসাদ দ্বিবেদী-র উপন্যাস। কবিতা, বাংলা বানান সংস্কার ও নানা বিষয়ে তাঁর চর্চার পরিচয় পাঠক মহলে সুপরিজ্ঞাত।

৩) **ড. গোপা দত্তভৌমিক (জন্ম - ১৯৫৬)** ঃ অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ, ২০১৮-এ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। এর আগে পড়িয়েছেন লেডি ব্রেবর্ন কলেজে। অধ্যক্ষা হিসেবে ব্রেবর্ন কলেজের প্রশাসনিক পদ থেকে পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাধিপতি ও গৌড় বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়-এর উপাচার্যের ভূমিকায় তিনি শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আগ্রহের বিস্তৃত বিষয়ে ইতিহাস, সংগীত, শিল্প ও সমাজতত্ত্ব প্রধান স্থান নিয়েছে।

৪) **ড. সৌমেন মুখোপাধ্যায় (জন্ম - ১৯৮০)** ঃ ইতিহাসের অধ্যাপক। কলকাতার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৩ থেকে পড়াচ্ছেন। দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস নিয়ে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করেছেন। উনিশ শতকের বাংলায় সামাজিক ইতিহাস ছাড়াও ধর্মীয় ও বৌদ্ধিক চর্চার ইতিহাস তাঁর নিরন্তর গবেষণার বিষয়। বেশ

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থপ্রকাশ ছাড়াও সম্পাদনা করেছেন আন্তর্জাতিক জার্নাল। বিজ্ঞান, মননের নানামুখী বিষয়ে আগ্রহী এই তরুণ ইতোমধ্যেই দেশে ও বিদেশে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন।

আমন্ত্রিত লেখক

৫) অনিতা অগ্নিহোত্রী (জন্ম - ১৯৫৬) ঃ পাঠক মহলে অত্যন্ত সমাদৃত কবি, ঔপন্যাসিক এবং প্রাবন্ধিক। নানাবিধ বিষয়ে আগ্রহী এই খ্যাতনামা লেখিকার পঠন পাঠনের বিষয় অর্থনীতি। ১৯৮০ ব্যাচের আই.এ.এস নির্বাচিত হয়ে দীর্ঘ ৩৭ বছর ভারত সরকারের নানা দপ্তরে প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলেছেন। খুব কম বয়স থেকেই তাঁর লেখা সাহিত্যিক মহলে প্রশংসিত হয়ে এসেছে। বহু গ্রন্থের রচয়িতা এই লেখিকার কাজ অনূদিত হয়েছে ভারতীয় ও বেশ কিছু বহির্ভারতীয় ভাষায়। অসংখ্য পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

৬) ড. মমতা চৌধুরী রায় (জন্ম - ১৯৫৭) ঃ শিক্ষাপ্রশাসক, শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'স্টেট কাউন্সিল অফ হায়ার এডুকেশন'-এ ভাইস চেয়ারম্যান (আকাডেমিক)। লেডি ব্রেবর্ন কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করে তিনি কলকাতার বিখ্যাত কয়েকটি কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের প্রশাসনিক বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। অর্থনীতি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার বিষয় হলেও উনিশ শতকের সংস্কৃতি তার একান্ত আগ্রহের ও চর্চার ক্ষেত্র।

৭) ড. মীনাক্ষী সিংহ (জন্ম - ১৯৪১) ঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনার সঙ্গে ১৯৬৩ সাল থেকে যুক্ত। গভীর আগ্রহের বিষয় বাংলায় উনিশ শতক ও রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক ১০টি গ্রন্থ সহ তার মুদ্রিত গ্রন্থ বহু। বেথুন কলেজের প্রাক্তনী এই লেখিকার অন্যতম বিচরণ ক্ষেত্র নাট্যাভিনয়। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বেথুন কলেজ সহ নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়িয়েছেন।

৮) ড. কৃষ্ণা রায় (জন্ম - ১৯৫৭) ঃ কথা সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক ও শিক্ষা প্রশাসক। বর্তমানে বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা। কর্মজীবন শুরু করেছেন শারীরবিদ্যার অধ্যাপনা দিয়ে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষা দফতরে পূর্বতন এ.ডি.পি.আই হিসেবে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সাহিত্যকাজে নিরন্তর প্রয়াসী। লিখেছেন বহু ছোট গল্প ও কয়েকটি উপন্যাস। বিদ্যাসাগর বিষয়ক একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ সদ্য প্রকাশিত। শিক্ষা, বিজ্ঞান ছাড়াও ভালোবাসার বিষয়, কবিতা ও উচ্চাঙ্গ সংগীত।

৯) ড. ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় (জন্ম - ১৯৬৫) ঃ সাহিত্যের নানা দিকে বিচরণ করতে স্বচ্ছন্দ এই লেখিকা বেথুন কলেজের প্রাক্তনী। রসায়ন তাঁর অধীত বিষয় হলেও

কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধ সাহিত্যেও সমান সাবলীল। বেশ কিছু প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে তাঁর উপন্যাস পাঠকদের সমাদর লাভ করেছে। পুরাণ, রন্ধন শিল্প, ভ্রমণ ও রম্য রচনা তাঁর আগ্রহের ক্ষেত্র।

১০) তৃষ্ণা বসাক (জন্ম - ১৯৭০) ঃ কবি, প্রাবন্ধিক ও কথাসাহিত্যিক। কারিগরি বিজ্ঞানে পড়াশোনা ও কর্মজীবনের সূত্রপাত হলেও পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ ভাবেই সাহিত্য চর্চায় নিবেদিত। সাহিত্য অকাদেমির বিভিন্ন প্রকল্পে যুক্ত এই লেখিকার আগ্রহের জায়গা বিস্তৃত। বহু গ্রন্থের রচয়িতা এবং নানা পুরস্কারে সম্মানিত, পাঠকের সমাদর লাভ করেছেন।

১১) ড. কুমকুম চট্টোপাধ্যায় (জন্ম - ১৯৫৪) ঃ অধ্যাপক ও সাহিত্যিক। বেথুন কলেজের প্রাক্তনী। উন্নয়ন আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর অবদান বিষয়ে গবেষণা করেছেন। নানাবিধ সামাজিক নিবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। ভালোবাসার ক্ষেত্র কবিতা লেখা এবং গান।

১২) ছন্দম চক্রবর্তী (জন্ম - ১৯৭৬) ঃ অধ্যাপক, প্রাবন্ধিক। ২০১৬ সালে বেথুন কলেজের বাংলা বিভাগে যোগ দেওয়ার আগে পড়িয়েছেন বিভিন্ন সরকারী কলেজে। ভাষাতত্ত্ব ও শিশুসাহিত্য তাঁর গবেষণাক্ষেত্র হলেও সমাজ ও রাজনীতি চিন্তার নানান এলাকায় সাবলীল বিচরণ। পছন্দের তালিকায় আছে চিত্রকলা ও সংগীত। প্রকাশিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থের সংখ্যা একাধিক।

১৩) সুমন্ত মুখোপাধ্যায় (জন্ম - ১৯৭৪) ঃ কবি, অধ্যাপক। বেথুন কলেজের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। এর আগে বিভিন্ন সরকারী কলেজে পড়িয়েছেন। নন্দনতত্ত্ব, রাজনীতি, কবিতা ও সমাজ আগ্রহের বিষয়। সম্পাদনা করেছেন বেশ কিছু গ্রন্থ। দীর্ঘদিন কবিতা অনুবাদের সঙ্গে যুক্ত।

লাগসই

যেহেতু ঈশ্বরচন্দ্র বাস্তবিক ছিলেন না ঈশ্বর
তাঁকে ধরা যেত
মানুষের দুঃখ দেখলে হতেন কাতর
অতএব লোকে করত তাঁকেই পাকড়াও
এবং কিছু না কিছু প্রত্যেকেই পেত
যে যেমন জানাত প্রার্থনা

তাও
পেলে পরে ভুলে যাবে মানুষ সে পাত্র না
প্রতিদানে ঢিল
ছুঁড়েছে সে সজোরে পাঁজরে

মুখটা ব্যথায় নীল
অতএব লেগেছিল ঠিক

যেহেতু ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন না ঈশ্বর বাস্তবিক।।

- সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ISBN : 978-81-948279-1-7